হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার: একটি পর্যালোচনা

(পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোঃ মশিউর রহমান

রেজিঃ নং -০৮/২০১০-২০১১

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কো-তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
মার্চ-২০১৫

প্রত্যায়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, মোঃ মশিউর রহমান-এর **“হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা”** শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষণাকর্মটি আমরা আদ্যান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, বিশুদ্ধকরণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছি। এটি গবেষকের মৌলিক রচনা বলে আমাদের নিকট মনে হয়েছে। পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কো-তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মোঃ ইউসুফ)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে,**"হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

(মোঃ মশিউর রহমান)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং -০৮/২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহাম্‌দু লিল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন করছি যার একান্ত মেহেরবানীতে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। বিশ্বমানবতার মহান বন্ধু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম যার আনিত আদর্শ, প্রদত্ত ভাষণ ও তাঁর সম্পাদিত চুক্তিসমূহ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একমাত্র অনুসৃত মাইল ফলক। বক্ষ্যমান গবেষণা কর্মের ক্ষেত্র হচ্ছে মানবাধিকার সংক্রান্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও সন্ধি-চুক্তিসমূহ। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক চুক্তিসমূহের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, প্রদত্ত ভাষণ ও সন্ধি-চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনার তুলনামূলক ধারণা বাংলা ভাষা ভাষী পাঠকদের জ্ঞাত করার। এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে **"হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা "** এ শিরোনামে গবেষণার কাজ আরম্ভ করি।

গবেষণার অভিসন্দর্ভ রচনায় তত্ত্বাবধায়কদ্বয় অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যার এবং ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তারা নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং গবেষণার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতকরণে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি, বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেক হুজুরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি আমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমার স্ত্রী মাহমুদা বেগম পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে আমাকে গবেষণা কর্মে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাই তার প্রতি রইল হৃদ্যিক শুভেচ্ছা। আমার গবেষণা কর্মে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গবেষণা কর্মে আমাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে যারা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে আমার সকল সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে গবেষণা কর্মটি গ্রহণ করার প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ		غ	=	গ		أُ	=	উ
ب	=	ব		ف	=	ফ		إُو	=	ঊ
ت	=	ত		ق	=	ক		وَ	=	ওয়া
ث	=	ছ		ك	=	ক		يى	=	য়ী
ج	=	জ		ل	=	ল		وُ	=	উ
ح	=	হ		م	=	ম		وُو	=	ঊ
خ	=	খ		ن	=	ন		ي	=	ইয়া
د	=	দ		و	=	ওয়া		ا	=	আ
ذ	=	জ		ه	=	হ		عو	=	‘ঊ
ر	=	র		ء	=	’		و	=	ূ
ز	=	ঝ		ي	=	য়		وِى	=	বী/ভী
س	=	স		عُ	=	‘উ		يو	=	ইয়ু
ش	=	শ		عَ	=	‘আ		◌ُ	=	ু
ص	=	স		عِـ	=	‘ই		◌ِ	=	ি
ض	=	দ/য		يا	=	ইয়া		◌َ	=	া
ط	=	ত		يِي	=	য়ি			=	
ظ	=	য		إِي	=	ী			=	
ع	=	‘		أى	=	ঈ			=	

বি. দ্র.

- উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উলিণ্ঢখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ
আ.	‘আলাইহিস-সালাম
ই.ফা.বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	ইংরেজি
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ড.	ডক্টর
তা.বি	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পৃ.	পৃষ্ঠা
রহ.	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু/‘আনহা/‘আনহুমা/‘আনহুম/‘আনহুন্না
মাও.	মাওলানা
মু.	মুহাম্মদ
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
সংস্ক.	সংস্করণ
হি.	হিজরী
Adi.	Addition
Art.	Article
Ed.	Edited by
p.	Page
pp.	Pages
Trs.	Translation
Vol.	Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
		প্রত্যয়নপত্র	I
		ঘোষণাপত্র	II
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III
		প্রতিবর্ণায়ন	IV
		শব্দসংকেত বিবরণী	V
		সূচিপত্র	VI -X
		ভূমিকা	১-৮
প্রথম অধ্যায়		**মানবাধিকারের ধারণা**	১০-৫৯
প্রথম পরিচ্ছেদ		**মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ**	১২-১৬
		অধিকার	
		মৌলিক অধিকার	
		মানবাধিকার	
		মানবাধিকারর স্বরূপ	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		মানবাধিকারের উৎসসমূহ ও বৈশিষ্ট্য	১৭-২৫
		মানবাধিকারের উৎস	
		মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য	
		মানবাধিকারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য	
		মানবাধিকারের প্রকারভেদ	
		মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ	**২৬-৩৫**
		ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা, উৎস ও ক্রমবিকাশ	
		ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় মানবাধিকারের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	
		১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা	
		১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস	
		১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটস	
		১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা	
		আমেরিকার বিল অব রাইটস	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলিলসমূহের বিবরণ	৩৬ - ৫৯
		জাতিসংঘের সনদে মানবাধিকার	
		মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ	
		নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ	
		অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ	
		অন্যান্য চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের ধারণা	
দ্বিতীয় অধ্যায়		**হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে**	৬০-১০৯

Dhaka University Institutional Repository

		মানবাধিকারের চেতনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ		হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীসমুহে মানবাধিকারের চেতনা	৬১-৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণসমূহে মানবাধিকারের চেতনা	৬৮-৮০
		জিহাদ সম্পকির্ত ভাষণে মানবাধিকার চেতনা	
		মুতা যুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণে মানবাধিকার চেতনা	
		তাবুকের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকার	
		মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা	
		বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকার	
		বিদায় হজ্জে আরাফার ভাষণ	
		বিদায় হজ্জে মিনার ভাষণ	
		বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ বিশেষ গাদীরে খুম	
		রাসূল (সা.) এর সর্বশেষ ভাষণ	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রণীত চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা	৮১-১১০
		• হিলফুল ফুযুল চুক্তি : মানবাধিকার	
		• মদিনার সনদ: মানবাধিকার	
		• হুদায়বিয়ার সন্ধি: মানবাধিকার	
		• অন্যান্য চুক্তিসমূহ : মানবাধকার ১. আযরুহ ও জারবা এর অধিবাসিদের সাথে চুক্তিপত্রে মানবাধিকার ২. আইলা এর ইউহান্না ইব্ন রুবা এর সাথে চুক্তিপত্র ৩. তাইমার বানূ আদিয়ার ইয়াহুদিদের জন্য মহানবী (সা.) এর নিরাপত্তাপত্র ৪. মাক্বনাবাসিদের সাথে চুক্তিপত্র ৫. উকাইদি ও দুওমাতুল জানদালের অধিবাসিদের সাথে চুক্তি ৬. নাজরান খ্রিষ্টানদের সাথে চুক্তিপত্র ৭. উমান ও বাহরাইনের সাথে চুক্তিপত্র ৮. মুকাওকিনের সাথে চুক্তিপত্র ৯. আমর ইবনে মার্রা জুহানীর সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিপত্র ১০. বানু যামরার চুক্তিপত্র। ১১. তায়েফের ছকীফ গোত্রীয়দের সাথে চুক্তিপত্র ১২. বাহরাইনের প্রতিনিধিদের সাথে চুক্তিপত্র ১৩. খালিদ ইবনে যিয়াদের আল আবুদীর নামে ফরমান পত্রে	

		মানবাধিকার ১৪.ইয়ামেনের গভর্নর আমর বিন হাযম আনসারীর সাথে চুক্তিপত্র ১৫.বানু দারমার সাথে চুক্তিপত্র ১৬.তাইমার বানু আদিয়া এর জনগণের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা দলিল ১৭. বনূ আদিয়ার ইয়াহুদীদের নামে রাসূল (সা.) এর চুক্তি	
তৃতীয় অধ্যায়		**হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী , ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার চেতনার আন্তর্জাতিক রূপায়ণ**	১১১-১২৬
প্রথম পরিচ্ছেদ		ইসলামী মানবাধিকার	১১২-১১৫
		ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার	
		ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণা	
		ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফিকাহ একাডেমীর ঘোষিত মানবাধিকার দলিল	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		ইসলামী মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক রূপায়ণ	১১৬-১২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমুহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ	১২৫-১২৬
চতূর্থ অধ্যায়		**হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ**	১২৭-২১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ		জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	১২৮-১৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		মর্যাদা রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ	১৩৪-১৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধিতে মানবাধিকার প্রসঙ্গ	১৩৭-১৪৬
চতূর্থ পরিচ্ছেদ		সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	১৪৬-১৫২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	১৫২-১৫৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ		অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	১৫৪-১৬৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ		ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	১৬৫-১৭৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ		বাসস্থানের অধিকার প্রসঙ্গ	১৭৮-১৭৯
নবম পরিচ্ছেদ		ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গ	১৭৯-১৮৯
দশম পরিচ্ছেদ		জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গ	১৯০-১৯৬
একাদশ পরিচ্ছেদ		ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষমের পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার	১৯৬-২০৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ		জলাধার, সমুদ্র ও মহীসোপান আইনে মানবাধিকার প্রসঙ্গ	২০৮-২০৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ		আন্তঃযোগাযোগ ও স্থানান্তর গমনের অধিকার প্রসঙ্গ	২১০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ		বিশ্বপরিবেশ রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ	২১১-২১২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ		আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	২১২-২১৩
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ		শ্রমিকের অধিকার প্রসঙ্গ।	২১৪-২১৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ		ন্যায় বিচার লাভের অধিকার প্রসঙ্গ	২১৫-২১৭
পঞ্চম অধ্যায়		**হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী, শিশু,বৃদ্ধ, দাস-দাসী , বন্দী ও আদিবাসী অধিকার প্রসঙ্গ**	২১৮-২৭১
প্রথম পরিচ্ছেদ		নারী অধিকার প্রসঙ্গ	২১৯-২৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		সমঅধিকার প্রসঙ্গ	২৪৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		দাস-দাসীর অধিকার প্রসঙ্গ	২৪৮-২৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		বন্দীদের অধিকার প্রসঙ্গ	২৬৬-২৬৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গ	২৬৮-২৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়		**হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী , ভাষণ ও চুক্তিসমূমহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি বলবৎকরণ**	২৭১-২৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ		মানবাধিকার বাস্তবায়নে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নেয়া বাস্তব পদক্ষেপসমূহ	২৭৩-২৭৭
		• ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা	
		• বায়‘আতুল আকাবার শপথ	
		• মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা	
		• মদীনা সনদের প্রবর্তন	
		• ইসলামিক অর্থ ব্যাবস্থা প্রবর্তন	
		• প্রতিকারমূলক যুদ্ধ নীতি	
		• যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধি চুক্তিসমূহ	
		• মক্কা বিজয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	
		• বিদায় হজ্জের যুগান্তকারী ভাষণ	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়নের চিত্র	২৭৮-২৮৬
		• রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের বিভিন্নকর্ম কাণ্ডে মানবাধিকার বাস্তবায়ন	
		(ক) ব্যক্তিগত দিক	
		(খ.) রাজনৈতিক দিক	
		(গ.) অর্থনৈতিক দিক	

Dhaka University Institutional Repository

		● যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়ন	
		● ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার চেতনার বাস্তবায়ন	
		● নারী অধিকার বাস্তবায়ন	
		● শিশু অধিকার বাস্তবায়ন	
		● ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকার চেতনার বাস্তবায়ন	
		● আইনের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সাম্যের অধিকার বাস্তবায়ন	
		● মানবাধিকার বাস্তবায়নে জিম্মীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদশর্ন	
		● সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বাস্তবায়ন	
		● অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন	
		● অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন	
		● ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার বাস্তবায়ন	
		● রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল, অভিবাসন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তণে অধিকার বাস্তবায়ন	
		● মানবাধিকার বাস্তায়নে খেলাফাতে রাশেদা	
		● মানবাধিকার বাস্তবায়নে খেলাফাতে রাশেদার পরবর্তী শাসকগণ	
সপ্তম অধ্যায়		**বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি, ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেসমূহ**	২৮৭-৩২২
প্রথম পরিচ্ছেদ		**বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি** মিয়ানমার, আফগানিস্তান,ভারত, তুরস্ক, ইরান, ইসরাঈল ও ফিলিস্তিন, রাশিয়া, মিসর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র্য, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায়, উত্তর কোরিয়া, গুয়েত মালা, বাহরাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনে লিবিয়ায় মানবাধিকার পরিস্থিতি	২৮৮-৩০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের নৈতিক, আইনানুগ প্রয়োগ ও সংরক্ষণ	৩০৮-৩১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা	৩১২-৩২২
উপসংহার			**৩২৩-৩২৮**
গ্রন্থপঞ্জি			**৩২৯-৩৩৬**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রস্তাবনা (Introduction)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি। মানবাধিকার সংক্রান্ত আলোচনা যেমন প্রাচীন তেমন আধুনিক। সমস্যাটি প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই উদ্ভূত এবং আমাদের যুগেও অব্যাহত। মানবাধিকারের বিষয়টিতে ইসলামের ভূমিকা ও অবস্থান চৌদ্দশত বছর ব্যাপী সুপরিচিত। বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদশর্ন ও তার মর্যাদা রক্ষার জন্য। কেননা মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো দেশে দেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বাভাবিক সোপান। মানুষের অধিকারের উৎস হলো তার অস্তিত্ব। মানবাধিকারের সমস্যা এমন একটি সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর সমস্যা, যা নিজেকে বিশ্ববিবেকের একটা ভারী বোঝা হিসেবে চাপিয়ে রেখেছে। আর সে কারণে তা সকল সরকারী, বেসরকারী, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা, বইপুস্তক ও সভাসমিতির আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বহু সংখ্যক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন একমাত্র মানবাধিকার সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে। এইসব সংগঠন ও সংস্থা মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি ও মৌলিক আইন রচনায় প্রচুর চেষ্টা সাধনা সময় ব্যয় করেছে। তাই বিশ্ব সমাজ ও তৎপরতা মানবাধিকারের সার্বিক ও সর্বব্যাপী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারসম্পন্ন বিষয়ে পরিণত করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এসমস্ত অধিকারের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছে।

মানবাধিকারের ভিত্তিসমূহ ও মৌলিক আইনসমূহ প্রণয়নের কাজ সর্বাগ্রে সমাধান করেছে ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে। ইসলাম এসব আইন অত্যন্ত সূক্ষ ও সুষ্ঠভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও বিশদভাবে রচনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সম্মানিত ও সকল সৃষ্টির সেরা প্রাণী। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তার বিবেক ও বুদ্ধি, চিন্তা, ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা, নির্বাচিত ক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা ও দায়িত্বজ্ঞান এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় পৃথিবীকে বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা। মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও তার মানবত্বের স্বীকৃতি সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত কুরআনে নাযিল হয়েছে। অধিকার সংরক্ষণের জন্য আদেশ ও নিষেধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় দায়িত্বশীলতা। ইসলাম মানুষকে সকল সৃষ্টির শ্রেঠত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্চে সেই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, এরূপ ন্যায়সংগত সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সে সুখী, সমৃদ্ধ, ভারসম্যপূর্ণ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী ও সমুজ্জল পথে চলমান জীবন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। মানবাধিকারের সমস্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। বহু সংখ্যক গবেষক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ ইসলাম এই পর্যালোচনার কাজ চৌদ্দশত বছর আগেই সম্পন্ন করেছে। কেননা কুরআন ও সুন্নার মাধ্যমে সে মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনকার ঘোষণা দিয়েছে, তাকে দায়িত্বশীলতা, আমানতদারী ও জবাবদিহিতা দ্বারা সম্মানিত করেছে এবং তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সেরা বলে অভিহিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **“হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা”**। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বাণী, ভাষণ ও ঐতিহাসিক চুক্তিসমূহে মানবজাতির সামগ্রিক মুক্তি, কল্যাণ ও মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো আজকের মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দলিলে দেখা যায়। যা বিশ্বমানবের মৌলিক অধিকার ও সমস্যাগ্রস্থ মানবতার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে এক জ্যোতির্ময় আলোক বর্তিকা। মহানবী (সা.)- এর অসাধারণ নেতৃত্ব ও প্রজ্ঞার সম্মিলনে ইতিহাসের যুগান্তকারী অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে মহানবী (সা.)- এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রেও এসকল চুক্তি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। বস্তুত বিশ্ব-শান্তি ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর সন্ধি বা চুক্তিসমূহ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরবের বিভিন্ন প্রভাবশালী গোত্রের সাথে যেসব চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে অন্তত ত্রিশটি চুক্তির মূল পাঠ অবিকলভাবে হাদীস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি জীবনে অক্ষরে অক্ষরে চুক্তির শর্ত মেনে চলেছেন। কোন দিন নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেননি। মানবাধিকার অর্থ মানবের অধিকার। মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানব সন্তানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অধিকারসমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। অর্থাৎ যে সমস্ত অধিকার একজন মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব বলে ভোগ করতে পারে অথবা মানব সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত অধিকার অপরিহার্য সেগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার বিষয়টি বিশ্ব জুড়ে বর্তমান সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত একটি বিষয়। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হওয়ার পাশাপাশি বর্তমানে এটি একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের রূপ লাভ করেছে। আর মানবাধিকাররের সম্যসাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ, ঝুকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিয়য়। বহু সংখ্যক গবেষক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ ইসলাম এই পর্যালোচনার কাজ চৌদ্দশত বছর আগেই সম্পন্ন করেছে। কেননা কুর’আন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে তাকে দায়িত্বশীলতা, আমানতদারী ও জবাবদিহিতা দ্বারা সম্মানিত করেছে এবং তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সেরা বলে অবিহিত করেছে।

আজকের দিনে মানবাধিকার বিষয়টি যত ব্যাপকভাবে আলোচনার আসর দখল করে আছে সম্ভবত বহুক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়াবহরূপে নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে লংঘিত হচ্ছে মানবাধিকার, দলিত মথিত হচ্ছে মানবতা। একদিকে মানবাধিকারের সংখ্যা সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষমতাধর শাসকরা দেশে দেশে অবলীলায় হরণ করে চলছেন জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলো। দুর্বল মানুষ সবলের হাতে, দুর্বলগোষ্ঠী প্রবল গোষ্ঠীর হাতে, দুর্বল জাতি শক্তিধর জাতি দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। তাই দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র যুগ যুগ ধরে শিশু, নারী, দরিদ্র, মেহনতি মানুষ, ক্রীতদাস, কৃষ্ণগোত্র ও নিম্নবর্ণীয় লোকেরা সর্বদা অধিকার বঞ্চিত।
মানবিক মৌলিক সুযোগ সুবিধা, মর্যাদা এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। হিরোশিমা, নাগাশি, কোরিয়ার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান, মিয়ানমার, ফিলিস্তিন এবং ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত করার হৃদয় বিদারক ঘটনাবলি বারবার প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে মানবাধিকারের প্রকৃত প্রবক্তা ইসলামকে মানবাধিকার বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকারের ধারণাটি আজকের নয়। দেড় হাজার বছরেরও বেশীসময় আগে কুর'আন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী আইনে এটি বিধিবদ্ধ করা হয়। ইসলামের পর ইউরোপীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ বিকশিত হয়ে উঠে। ইসলাম মানবাধিকার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেছে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। একদিকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নির্দেশ করেছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে, অন্যদিকে তার নিখুঁত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে এক অনন্য উদাহরণ। আল-কুর'আনে ইসলামকে বলা হয়েছে 'পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হতে হলে মানবাধিকার বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বাস্তবে হয়েছেও তাই। ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক অনেক বস্তুগত প্রামাণ্য ও সর্বযুগের উপযোগী বিধান রয়েছে ।

ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সারাজীবনে ইসলামী আদর্শকে প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবাধিকারের বিষয়টি তাঁর কথায়, কাজে ও চুক্তিসমূহে অনুমোদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবুওয়াত লাভের পূর্ব জীবনে এবং পরে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে তিনি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন।

আল-কুর'আন হলো ইসলামী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান নির্দেশক যা কার্যকর রূপ লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান জীবনের পরতে পরতে এই বিষয়ে তাঁর মুখনিসৃত বাণী, ভাষণ, চুক্তি এবং বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য ও উজ্জ্বল্যমন্ডিত হয়ে আছে। শুধু তাই নয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ পৃথিবীর প্রথম মানবাধিকার ঘোষণার অন্যতম দলীল।

মহানবী (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ, ও চুক্তিসমূহে জীবন ও সম্পদের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জেন্ডার সমতা, নারী অধিকার, বর্ণবাদ ও শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণ, সন্ত্রাস ও হত্যা বিষয়ক দন্ডবিধি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার অধিকার, ক্রীতদাসের অধিকারসহ আরো অনেক মানবাধিকারের চেতনা ও নীতিসমূহের উপর আলোকপাত করে গেছেন, যেগুলো আধুনিক কালের "মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights UDHR-1948); অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Convention on Economic Social and Cultural Rights-ICESCR: 1966); পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Convention on Civil and Political Rights ICCPR-1966); সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International Convention on the Elimination of All Forins of Racial discrimnation-1965); গণহত্যা জনিত অপরাধ নিরোধ ও উহার শাস্তি সম্পর্কিত কনভেনশন (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide-1946) ইত্যাদির মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, মহাদেশীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় দলিল ও আইনে যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বমানবের মুক্তির দূত মহানবী (সা.) বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার সংরক্ষণে ও সুনিশ্চিত করণে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে যে কালজয়ী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার কোন তুলনা নেই, যা চিরকাল বিশ্বমানবের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য।

আজকের বাস্তবতায় পরিতাপের বিষয় হল রাসূল (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও ঐতিহাসিক চুক্তিসমূহের উত্তরাধিকারী মুসলিম মিল্লাত আজ চরম অপমান, নিপীড়ন, বিপর্যস্থ মানবাধিকার, নির্যাতন, অশান্তি, অনৈক্য আর বিভ্রান্তির শিকার। আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। রক্তের একটি দাগ মুছে যেতে না যেতেই সৃষ্টি হচ্ছে আরো অনেকগুলো দাগের। মানবাধিকারের চেতনায় উৎসারিত রাসূল (সা.)-এর বানী, ভাষণ ও চুক্তিসমহ এবং বিশ্বের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ তথা আল-কুর'আন ও সুন্নাহ মুসলিম মিল্লাতের কাছে থাকলেও মুসলিমগণ সর্বত্র অধঃপতিত, নির্যাতিত।

আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত পথ ও পন্থাই আজকের নির্যাতিত মুসলিম মিল্লাতের মুক্তির একমাত্র পথ। মুসলিম মিল্লাতের চরম দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিষ্ঠা সহকরে কুর'আন ও হাদীস কে আকড়ে ধরে বিশ্বের সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মুসলিম অমুসলিম নির্বিমেষে নির্যাতিত মানব জাতির মুক্তির জন্য সমন্বিত কার্যকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহ আপামর সকল মুসলিমকে মানবাধিকার সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ প্রচার করে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিয়ান হতে হবে যা সময়ের দাবী। তাই বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে 'মানবাধিকার' প্রশ্নে ইসলামের ধারণা তুলে ধরার ক্ষেত্রে **"হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সার্বিক বিচারে গুরুত্ব ও যৌক্তিকতার দাবী রাখে বলে মনে করি।

আধুনিক বিশ্ব মানবাধিকার প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত বিব্রত হচ্ছে তাঁর প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে উদ্ভাসিত হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ হচ্ছে– জীবন ধারণের অধিকার, সম্পদের অধিকার, হত্যা রক্তপাত ও সন্ত্রাস থেকে জীবন রক্ষার অধিকার,হত্যা বিষয়ক দন্ডবিধি কার্যকরকরণে মানবাধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বর্ণবাদের ভিত্তিতে অবৈষম্য বিধানের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মর্যাদার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, বিশেষতঃ নারীর অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের অধিকার, উত্তরাধিকার লাভের অধিকার, স্বাস্থ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার, বিশ্বপরিবেশ, আন্তর্জাতিক জলাধিকার, শিশু অধিকার ও দাসদাসীর অধিকারসহ মানবাধিকার প্রশ্নে অন্যান্য চেতনাসমূহ।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রাসূল (সা.)- এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ শুধু কালজয়ী না বরং আজকের ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের এক অনুপম ও অনবদ্য দলিল। উন্নত বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মানবাধিকার রক্ষার ব্যর্থতার এ যুগ সন্ধিক্ষণে মুসলিমদের যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবমূখী পদক্ষেপ নিতে হবে। আজ মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের ঐতিহ্য এবং অধিকার রক্ষার জন্য সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Objectives of the Study)

মানবাধিকারের স্বরূপ, মানবাধিকারের প্রকৃত প্রবক্তা নিরূপণ এবং মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের ধারণা (Concept) সম্পর্কে জানা। এছাড়াও আলোচ্য গবেষণার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ সম্পর্কে জানা এবং এতে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করা।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকার চেতনাসমূহের আন্তর্জাতিক রূপায়ন ও তুলনামূলক মূল্যায়ন করা।
৪. ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি ও বলবৎকরণের ধারণা উপস্থাপন করা।
৫. মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতির বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ণ করা।

গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of the Study)

এ গবেষণা একটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research Pradigma) অবলম্বন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Analytical) ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসৃত হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব উপাত্ত ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি ও আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা ও উদ্ধৃতি সংযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রচলিত মানবাধিকারের বিভিন্ন দলিল এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, সফল বাস্তবায়ন তত্ত্ব-উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি (Scope of Research)

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনার সূচনা ‘হিলফুল ফুযুল’ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে। প্রচলিত মানবাধিকারের ধারণা সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দিতে। এই অভিসন্দর্ভে প্রচলিত মানবাধিকার চেতনা এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকার চেতনা সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা, মানবাধিকার আন্দোলনে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা ও প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বাষায় প্রচলিত মানবাধিকারের ধারণা সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাদি, গবেষণা প্রবন্ধ, ও ফিচার ইত্যাদি এ গবেষণা কর্মের আলোচনার পরিভূক্ত। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার লংঘণের কিছু তথ্যও গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার উৎসসমূহ (Source)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত। প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক আইনের মূলদলিলসমূহ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকার ঘোষণার ঐতিহাসিক বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ, মানবাধিকারের প্রচলিত ধারণা (Concept) এবং মানবাধিকারের ইসলামী ধারণা (Concept) বিষয়ে প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক আইন গ্রন্থ ও ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদীস, ইসলামী সাহিত্য ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে মাঠ জরিপ, নিবিড় সাক্ষাৎকার, মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, বার্ষিক প্রতিবেদন/বিবরণী, প্রকাশনা ও পত্র-পত্রিকায় মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকেও এ গবেষণা কর্মে সহায়তা নেয়া হয়।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Proposed Structure)

গবেষণাকর্মের বিষয়টির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গবেষণা কর্মের সুবিধার্থে এ অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা, সাতটি অধ্যায় ও উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমিকা : মানবাধিকারের বিষয়টি আজকের দিনে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ায় মানবাধিকার চেতনায় অনুপ্রনিত রাসূল (সা.)- এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ বিশ্বমানবের অধিকার সংক্রান্ত একটি মাইলফলক হিসেবে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গৌরবদীপ্ত জীবনে পেশকৃত বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ মানবাধিকারের চেতনা ও নীতিসমূহের সাথে আধুনিক কালের মানবাধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক আইন, মহাদেশীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনের বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার বিপর্যয়ে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি এবং গবেষণার উৎস সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে : প্রথম অধ্যায়ে অধিকার ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে মানবাধিকারকে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠার প্রধান উপায় হিসেবে। এ অধ্যায়ে অধিকার, মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ,মানবাধিকারের উৎসসমূহ, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য, মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য মানবাধিকারের প্রকারভেদ, মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ, বিশেষ করে কুর'আন হাদীসের আলোকে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে মানবাধিকারের আধুনিক ধারণা তথা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় মানবাধিকার চেতনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানবাধিকারের অন্যান্য দলিলসমূহ,সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানবাধিকারের অন্যান্য দলিলসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে : এ অধ্যায়ের শিরোনাম হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা। এ অধ্যায়ে মহানবী (সা.)- এর বাণীসমূহে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ, মানবাধিকারের চেতনা, মানবাধিকারের চেতনায় উজ্জিবিত ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ, তাবুক যুদ্ধের ভাষণ, মূতার যুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণ, মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণসহ অন্যান্য ভাষণসমূহ পর্যালোচিত হয়েছে। মানবাধিকারের চেতনায় উজ্জিবিত হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রণীত চুক্তিসমূহ। যেমন- হিলফুল ফুযুল চুক্তি, মদিনার সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, আযরুর ও যারবা বাসীদের

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি, আইলা বাসীদের চুক্তি, মাকানা বাসীদের সাথে চুক্তি, বানু যামরার মৈত্রীচুক্তিসহ আরো বিশেষ বিশেষ চুক্তিসমূহ আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে : ইসলামী মানবাধিকরের ধারণা, ইসলামী মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক রূপায়ন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমুহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ আলোচিত হয়েছে

চতুর্থ অধ্যায়ে : জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ মর্যাদা রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধিতে মানবাধিকার, সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার,সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ভাষণ ও চুক্তিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্যের পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার, জলাধার, সমুদ্র ও মহীসোপান আইনে মানবাধিকার লাভ, আন্তঃযোগাযোগ ও স্থানান্তর গমনের অধিকার, বিশ্বপরিবেশ রক্ষা অধিকার, আর্থ- সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার প্রসংঙ্গ ন্যায় বিচার লাভের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী অধিকার, সমঅধিকার, দাস- দাসীর অধিকার ও বন্দিদের অধিকার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার চেতনার আন্তর্জাতিক রূপায়ণ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা.) তদানিন্তন পৃথিবী বাসীর উদ্দেশ্যে এবং অনাগত পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের চেতনা সম্বলিত যে বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ প্রদান ও প্রনয়ণ করেছিলেন তা এ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি ৩ পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে : এ অধ্যায়ের শিরোনাম : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমুহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি বলবৎকরণ। এ অধ্যায়ে মানবাধিকার বলবৎ করণ তথা বাস্তবায়নে রাসূল (সা.) কর্তৃক কিছু বাস্তব পদক্ষেপ, উপস্থাপিত দৃষ্টান্তসমূহ, মানবাধিকার বাস্তবায়নে খেলাফতে রাশেদা, মানবাধিকার বাস্তবায়নে ইসলামী রাষ্ট্রে মানবাধিকারের পরিমন্ডল ও যথার্থতার মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি, ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ। আধুনা বিশ্বের কয়েকটি দেশে সমসাময়িক মানবাধিকার পরিস্থিতি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তি তথা কুর'আন সুন্নায় প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনার আলোকে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক তদারকী, আন্তর্জাতিক ইসলামী মানবাধিকার আদালত গঠনসহ আরো কতিপয় পদক্ষেপ ও প্রস্তাবনার সুপারিশ এ অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পরিশেষে আমরা একটি উপসংহারের মধ্য দিয়ে এ গবেষণাকর্মের সারবস্তু তুলে ধরার চেষ্ঠা করেছি। এভাবে গবেষণাকর্মটিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার ও পর্যালোচনা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং সর্বশেষে অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি বিবরণ বর্ণ মালার ধারাবাহিকতায় প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় গবেষণা কর্মটি মানবাধিকার সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ, ধারণা প্রদান, মানবাধিকার রক্ষা ও মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলনে কার্যকর প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার ও প্রচলিত মানবাধিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে সহায়ক হবে এবং মানবাধিকার সংস্থা, মানবাধিকার কর্মী, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্ভার হিসেবে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, বিশ্বসম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে ‘মহা নবী (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে ও মানবাধিকার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। (আমিন)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
মানবাধিকারের ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের উৎসসমূহ ও বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলিলসমূহের বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের ধারণা

মানবাধিকার বিষয়টি সারা বিশ্বজুড়ে বর্তমান সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত একটি বিষয়। মানবাধিকারের ইংরেজি পরিভাষা হল Human Rights. "Human Righs" এর পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'One of the basic rights that everyone has to be treated fairly and not in crual way, especially by their government.[১] মানবাধিকার শব্দটি মূলত ফরাসী শব্দ। অর্থ হচ্ছে মানুষের অধিকার। অধিকার হল মূলত কিছু স্বার্থ, যেগুলো অধিকারের আইনগত নিয়ম নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। একজন মানুষ জন্মগতভাবেই তার অধিকার লাভ করে। Thomas Paine প্রথম ব্যক্তি যিনি ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১৭৮৯ সালে গৃহীত 'পুরুষের অধিকার' সম্পর্কিত ফরাসী ঘোষণার ইংরেজী অনুবাদে 'মানবাধিকার' পদটি ব্যবহার করেন। পুরুষের অধিকার বললে তাতে নারীর অধিকার অর্ন্তভুক্ত হয় না বলেই পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে মিসেস এলিয়েন রুজভেল্টের (Mrs. Eleanor Roosevelt) নারী ও পুরুষের অধিকার হিসেবে ইংজেী অনুবাদে 'মানবাধিকার ' পদটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন[২] এবং এই প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত সার্বজনীন ঘোষণায় 'মানবাধিকার' পদটি ব্যবহৃত হয় এবং এ পদটি বিশ্ববাসীর জন্য মূর্ত হয়ে ওঠে।

মানুষ জন্মসূত্রেই চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। অতএব, রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি যদি মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে সে তার মানুষ্যত্বই কেড়ে নিল, হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির সেরা মানুষ আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসেনা, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

মানবাধিকার এমন কিছু সহজাত অধিকার যেগুলো ছাড়া মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে না। এ অধিকারগুলো কেবলমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে তার জন্মগত অধিকার। তাই মানবাধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানবাধিকার ব্যক্তি মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জড়িত একটি বিষয় যা মনুষ্য সমাজের নৈতিক মাণদণ্ডকে প্রকাশ করে। এটি কেবল একজন ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয় বরং গোটা বিশ্বসমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটেছে সেচ্ছাচারী শাসকের সৈরতন্ত্রের ফল হিসেবে। কেননা মানুষ হিসেবে মানুষ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করার দাবিদার। কিন্তু কোন শাসক যখন মানুষকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তখনই তারা সোচ্চার এবং প্রতিবাদী হয়েছে। বিপ্লবের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আদায় করে নিয়েছে তাদের

১. A.S Hornby , *OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY* (London : Oxfort University Press, Sixty rd, 2002), p.635

২. Rosenbaum, "The Editors Prespective on The Philoslphy of Human Rights" in Alan S. Rosenbaum (ed.), *The Philosophy of Rights' International Prespective*(U.H.D , Oxford University Press, 1960), p.6

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার। এ অধিকার শাসকেরা অনায়াসে মানুষকে দেয়নি। দিয়েছে একবারেই নিরুপায় হয়ে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন সনদ ও চুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

মানবাধিকার মানুষের সেই সব স্বার্থকে বুঝায় যা অধিকাররের নৈতিক বা আইনগত নিয়ম নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মানবাধিকারের ধারণার আগে আমাদের অধিকার ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত জরুরী। তাই পর্যায়ক্রমে অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের উপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হল।

অধিকার

'অধিকার ' শব্দটির ইংরেজী প্রতি শব্দ হল 'Right' যার শাব্দিক অর্থ হল ন্যায়গত বা সঠিক। সুতরাং 'অধিকার' বলতে ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার স্বাধীনতাকেই বুঝতে হবে। অন্য ভাবে বলা যায় অধিকার বলতে আইন দ্বারা সীমিত একজন ব্যক্তির কোন কিছু করার স্বাধীনতা, কোন কিছু নিজের অধীনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করাকে বুঝায়। আইনের ভাষায় অধিকার হল একটি স্বার্থ যা সংবিধান বা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট ও বলবৎযোগ্য হয়। অধিকার সম্পর্কে পি.জে ফিটজেরাল্ড বলেন, "অধিকার হল মূলত কিছু স্বার্থ (Interest) যে গুলো অধিকারের নৈতিক বা আইনগত নিয়ম নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্বার্থ হল মানুষের কিছু সুবিধাজনক অবস্থা যার প্রেক্ষিতে অন্যদের কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু যখন এই সুবিধাজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যদের কর্তব্য থাকে তখন তাকে অধিকার বলা হয়।"[৩]

অধিকারের সাথে কর্তব্য সম্পৃক্ত। অন্যরা কর্তব্য পালন না করলে আমাদের পক্ষে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধাকে বোঝায় যার হয় নৈতিক, না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে।

যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলে। "নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি মর্যাদপূর্ণ স্থান থাকা উচিত। সে মানুষ হিসাবে সম্মানের পাত্র এবং সমাজের অন্যান্য লোকের মত তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের জন্যও অপরিহার্য। যে ব্যক্তিই কোন কর্তৃত্ব বলে তার সাথে ব্যবহার করে তার একথা ভুললে চলবে না যে, সে একজন মানুষ এবং মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে সে কেবলমাত্র কোন ক্ষমতা বলে অথবা পদাধিকার বলে অন্যদের তুলনায় বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়।"[৪]

৩. P. J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*(London: Twelfth Edition, 1996), p.217

৪ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, অনু. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম ও মুহাম্মাদ আবু নুসরত হেলালী, *ইসলামে মানবাধিকার* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খৃ.), পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত, যা আইনগতভাবে দাবী করা যায় এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকার সম্পর্কে ড.এ.বি.এম.মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন "আইনগত অধিকার বলতে সে সুবিধা লাভ বা স্বার্থকে বুঝায় যা আইনের নীতি সমূহ দ্বারা মানুষের জন্য নিশ্চিত করা হয়। যেমন, আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনে আমাদের কথা বলার, চলা-ফেরা করার, চুক্তি করার এবং এ রকম বহু অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত আছে। আইনগত এসব অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেয়া উচিৎ, এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।"[৫]

'অধিকার' সমাজে জন্ম লাভ করার পর প্রথমে নৈতিক অধিকার হিসেবে উহা বিরাজ করে। পরবর্তীতে উহার দাবীর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে আইন উহাকে স্বীকৃতি দেয় এবং বলবৎকরনের ব্যবস্থা করে, ফলে উহা আইনগত অধিকারে পরিণত হয়।"[৬] সুতারাং আমরা বলতে পারি সকল আইনগত অধিকার নৈতিক অধিকারও বটে ।

মৌলিক অধিকার

মানবাধিকার সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার জন্য জানা দরকার মৌলিক অধিকার কি। কেননা মানবাধিকার কথাটির সাথে মৌলিক অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারকে নিয়েই আবর্তিত হয় মানবাধিকার। মানবাধিকার যেমন কিছুটা হলেও অস্পষ্ট ও বিমূর্ত ধারণা, মৌলিক অধিকার তেমন নয়। যে কোন দেশের সংবিধানে স্বীকৃত এবং আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য ও কার্যকরযোগ্য অধিকার সমূহকে 'মৌলিক অধিকার' বলে। প্রকৃত অর্থে সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার (Human Rights)। অতএব, মানবাধিকারের অর্থে যে সকল অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional Guarantees) দ্বারা সংরক্ষণ হয়,সে সকল অধিকারই মৌলিক অধিকার।

মৌলিক অধিকারের প্রামান্য সংজ্ঞা

১. গায়েজ ইযিজিওফোর মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–"মানবীয় অধিকার অথবা মৌলিক অধিকার হল সেই সব অধিকারের আধুনিক নাম যাকে ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার বলা হয় এবং তার সংজ্ঞা এই হতে পারে যে, সেই সব নৈতিক অধিকার যা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিটি স্থানে এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ কারণে পেয়ে থাকে যে, সে অন্যান্য সকল সৃষ্টির তুলনায় বোধশক্তি সম্পন্ন ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়ায় উত্তম ও উন্নত। ন্যায় বিচারকে পদদলিত করা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"[৭]

---

৫ ড.এ.বি.এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি*(ঢাকা : হিউম্যানিস্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ১

৬ অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *সাংবিধানিক আইন*(ঢাকা : জলিল 'ল' বুক সেন্টার, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৬৬

৭ Gaiues Ezejiofor, *Protection of Human Right's Under the **Law***(London : Butterworths,1964), p.3

Dhaka University Institutional Repository

২. মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে ড.এ.বি.এম মফিজুল ইসলাম পাটওয়ারী বলেন, "মৌলিক অধিকার হল সেই সকল প্রাকৃতিক অধিকার এবং মানবাধিকার, যে গুলি কোন ব্যক্তি তার দেশের নাগরিক হিসেবে ভোগ করে থাকে এবং যেগুলি নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলের জন্য উম্মুক্ত থাকে। এই মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী কোন আইন পরিষদে প্রণয়ন করলে সেইগুলি বাতিল বলে গণ্য হবে।"[৮]

৩. ডক্টর আব্দুল করিম জায়দান বলেন, "মৌলিক অধিকার বলতে বুঝায় এমন সব অধিকার যা সমাজের লোক হিসেবে জীবন যাপনের জন্যে একজন মানুষের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। এ অধিকারগুলো নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। ব্যক্তির নিজের প্রাণ সংরক্ষণ, তার আজাদী এবং তার ব্যক্তিগত সম্পদ সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো যথাযথরূপে সংরক্ষিত না হলে মানুষের মানবিক মর্যাদা অরক্ষিত ও বিপন্ন হতে বাধ্য।"[৯]

মৌলিক অধিকারের বিশেষত্ব হল এই যে,মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় এবং এগুলোকে সংবিধানে স্থান দেয়ার উদ্দেশ্য হল শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ যাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা।

মৌলিক অধিকারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বিচারপতি জ্যাকসন বলেন, "কোন ব্যক্তির জীবন, মালিকানার স্বাধীনতা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির স্বাধীনতা, ইবাদত-বন্দেগী ও সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অন্যান্য অধিকার জনমত যাচাইয়ের জন্য দেয়া যায় না। তার নির্ভরযোগ্যতা নির্বাচনসমূহের ফলাফলের উপর কখনও ভিত্তিশীল নয়।"[১০] মৌলিক মানবাধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই গুলি প্রকাশ্য বা অনুক্তভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষ, আইন সভা, নির্বাহী পরিষদ, বিচারালয়, এর ক্ষমতার উপর সীমারেখা টেনে দেয় যাতে তারা ঐগুলির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

মৌলিক অধিকার দাবির আসল অভিপ্রায় হলো মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যকে একনায়কতন্ত্র, নির্মম স্বৈরতন্ত্র ও নির্দয় সাম্যবাদের প্রভাব থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা করা। সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপনের গ্যারান্টি দেয়া, মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্মেষ ঘটানো, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া এবং চিন্তাকর্মের স্বাধীনতার এমন এক পরিমন্ডলের ব্যবস্থা করা যা রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মানবাধিকার

মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানব সন্তানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অধিকারসমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ এর অর্ন্তভুক্ত।

---

৮ ড.এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০১

৯ ড. আবদুল করিম জায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম(মালয়েশিয়া : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অরগানাইজেশন, পলিও-গ্রাফিক প্রেস, এস.ডি.এন, বি.এইচ.ডি, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৭১

১০ A.K. Brohoi, *Quotation in United Nations and Human Rights*(Karachi : University Prees, 1968), p. 313

Dhaka University Institutional Repository

আরো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে 'মানবাধিকার' পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকেই বোঝায়। মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে মোঃ মহবুব-উল হক জোয়ার্দ্দার বলেন, "মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের আচার-ব্যবহার, নীতি, আচরণ, ব্যবস্থা-রীতি, আইন-বিধি, কার্যক্রম ও কার্যব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রয়োজন ও চাহিদা, প্রয়োগ ও প্রযুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জড়জীবন, কার্যজীবন, চিন্তাজীবন, জড়জগৎ, চিন্তাজগৎ, প্রাণীজগৎ, তথা বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছু মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।"[১১]

মানবাধিকারের সংজ্ঞা

মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বুঝানো হয় না– আইন ও নৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে সেইগুলিই মানবাধিকার যাহা শুধু মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষ ভোগ ও ব্যবহার করার দাবী করতে পারে। এই সকল অধিকার সমূহ কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয় বরং ইহা সহজাত, সার্বজনীন, চিরন্তন ও শ্বাশ্বত।

সাংবিধানিক আইন গ্রন্থে বলা হয়েছে, "মানবাধিকার এমনি একটি অধিকার যাহা ক্রয়যোগ্য, বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সর্বোপরি কোন বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে এই সকল অধিকারসমূহ সৃষ্টি হতে পারে না। ইহাকে বরং প্রাকৃতিক অধিকার বলা যাইতে পারে।"[১২]

মানবাধিকারের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

মানবাধিকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন আইনবিদ ও মনিষীদের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। যেমন,

১। মানবাধিকারের সংজ্ঞায় গাজী শামছুর রহমান বলেন, "মানবাধিকার বলতে সেই অধিকারকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না।"[১৩]

২। মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, "এ দুনিয়ায় মানুষ কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। দেশ-কাল, বর্ণ-ভাষা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেলায়ই সে অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কালের ভাষায় সে অধিকারগুলোকেই একত্রে বলা হয় মৌল মানবাধিকার, সংক্ষেপে মানবাধিকার। এই মানবাধিকার এমনই একটি অলংঘনীয় বিষয় যে, একে হরণ কিংবা দলন করার অধিকার নেই দুনিয়ার কোন শক্তির।"[১৪]

'মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলংঘনীয় অধিকারই হল মানবাধিকার'।[১৫] মানবাধিকার হল এমন কিছু সহজাত অধিকার যে গুলো ছাড়া মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে না । এগুলো কেবল মাত্র মানুষ হবার কারণে তার

---

১১ মোঃ মহবুব-উল হক জোয়ার্দ্দার, *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ১

১২ অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৩ গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ১১

১৪ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./ ২০০২ খৃ.), পৃ. ১

১৫. রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, *মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও*(চট্টগ্রাম : প্রকাশক, মোঃ শাহজাহান রশীদ, ইসলামিয়া হাট, হাটহাজারী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগত অধিকার। তাই মানবাধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের মাধ্যমেই তার মনুষত্ব বিকশিত হয়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অধিকার সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। আর এ সকল অধিকারের সমষ্টিকেই বলা হয় মানবাধিকার।

মানবাধিকারের স্বরূপ

যে সমস্ত অধিকার একজন মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব বলে ভোগ করতে পারে অথবা মানব সত্ত্বার যে সব মৌলিক অধিকার ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে মানবিক মর্যাদাসহ বাঁচতে পারে না এবং মানবিক স্বাভাবিক গুণাবলী ও বৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না, সাধারণভাবে সে সবই মানবাধিকার হিসেবে পরিগণিত। আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা প্রেক্ষিতে এর বিবেচনা করতে পারি। যেমন:

অর্থনৈতিক হিসেবে

ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীবিকার্জন, সম্পত্তির অধিকার। অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের অবাধ অধিকার তাই এক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে গণ্য।

সামাজিকভাবে

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র-লিঙ্গ, নির্বিশেষে সব মানবাধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধিনতা, রাজনৈতিক তথা নাগরিক আবিষ্কার, সভা-সমিতি-সংগঠন ও জনমত গঠনের অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করার অধিকার, আইনের শাসন, ও বিচার লাভের অধিকার, বিবাহ তালাক, ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত।

নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত

অন্যের অধিকারে হস্তপেক্ষপ না করে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, শালীনতার প্রসার ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ, সৎকর্মের আহ্বান, অসৎ কর্মের প্রতিরোধ, পিতা-মাতা ও বড়দের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি আদর, স্নেহ- যত্ন প্রদর্শন ও তাদের প্রতিপালন, যথাযথ লালন-পালনের ব্যবস্থাকরণ, সমাজের দরিদ্র, অসহায়, বিধবা, ইয়াতীমদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, মেহমান-মুসাফিরদের আপ্যায়ন করা, সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করা ইত্যাদি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সর্ব কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের ন্যূনতম যে অধিকারগুলো সর্বজন স্বীকৃত, তারই নাম মানবাধিকার।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের যুগে মানবাধিকার একটি জনপ্রিয় ধারণায় পরিণত হয়েছে। ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বজনীন মানবাধিকারের একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র (Universal Declaration) প্রণয়ন করে। উক্ত ঘোষণাপত্রে ২৫টি মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সকল অধিকারসমূহই "মানবাধিকার" নামে আখ্যায়িত হয়। এই ২৫টি অধিকারের মধ্যে ১৯টি হল পৌর (Civil) ও রাজনৈতিক(Political) অধিকার সম্পর্কিত, আর বাকী ৬টি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের উৎসসমূহ ও বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকারের উৎসসমূহ : (Source of Human Rights)

মানবাধিকার একদিনে সৃষ্টি হয় নি, মানবাধিকার সৃষ্টির পিছনে বেশ কিছু বাস্তব উৎস কাজ করেছে। এ গুলোর মধ্যে প্রাচীন উৎস হল ধর্মীয় উৎস : ধর্ম মানবাধিকারের একটা মৌলিক উৎস হিসেবে গন্য। কোন ধর্মই , চাই তা আসমানী ধর্ম হোক বা মানব রচিত, মানবাধিকারের আলোচনা থেকে মুক্ত নয়। 'প্রাচীন ধর্মগুলিতে মানবাধিকার শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। তার পরেও ধর্মতত্ত্ব মানবাধিকার মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই ধর্মতত্ত্ব এমন এক ধরনের আইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যা রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা আল্লাহ কর্তৃক নিঃসরিত হয়েছে। মানুষ স্রষ্টার ভাবমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু মানুষ এমন এক মূল্য ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে যা থেকে মানবাধিকারের উপাদানগুলি উদ্ভূত হয়েছে'।[১৬] তবে সর্বাদিক শতসিদ্ধ যে মানবাধিকারের প্রাচীন উৎস হল ইসলাম ধর্ম। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মই ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে খলীফা অভিধায় অভিহিত করে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন অতঃপর তিনি কুর'আনের নির্দেশনা এবং স্বীয় বাণী, ভাষণ, কর্ম ও সন্ধি-চুক্তির অনুমোদনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে অনন্য দৃষ্টান্তস্থাপন করেন বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। ইসলাম ধর্মই ধর্মের মাধ্যমে কতগুলো অধিকার প্রদান করেছে। যা যে কোন রাষ্ট্রের চুক্তি ছাড়াই ইসলাম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তা পালন করে থাকে। এই অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য কোন প্রকার রাষ্টীয় চুক্তির প্রয়োজন হয় না। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি ব্যক্তি তার ধর্ম পালনের মাধ্যমে তা করে থাকে। এর অনেক পরে ক্লাসিক্যাল যুগ পার হয়ে মধ্য যুগে আধুনিক মানবাধিকার এর জন্মেও সূত্রপাত ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। যা বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হল । ইসলাম ধর্মে বর্ণিত অধিকারগুলোই পরবর্তীতে আধুনিক মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। মানবাধিকারের অন্যন্য উৎসগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:

১. আর্ন্তজাতিক প্রথা : আর্ন্তজাতিক প্রথা আর্ন্তজাতিক প্রথাকে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্ন্তজাতিক প্রথা রাষ্ট্রসমুহের কার্যাবলীর মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সংসদে বা প্রদত্ত সরকারী মুখপাত্রের বিবৃতি, আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্স বা সেমিনারের বিবৃতি, রাষ্ট্রীয় আইন ও রাষ্ট্রীয় বিচার ভিভাগের সিদ্ধান্ত থেকে অনেক সময় আন্তর্জাতিক প্রথার উৎপত্তি ঘটে। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অতি সম্প্রতি সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার দ্বারা একটি মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রথার উদ্ভব ঘটেছে।

২. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ : আন্তর্জাতিক সনদ আবার দু'ধরনের। সরকারী আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সনদসমূহ এবং বেসরকারী আন্তর্জাতিক সনদ বা ঘোষণাপত্র।

---

১৬ অধ্যাপক ড.এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাঠোয়ারী, *আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক মানবাধিকার আইন*(ঢাকা: হিউম্যানিষ্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত : আর্ন্তজাতিক চুক্তি আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের শ্রেষ্ঠতম উৎস। যেমন- মানবাধিকার বিল ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ঐচ্ছিক প্রটোকল এর ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতি সংঘ সনদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত : বেসরকারী সনদগুলো দ্বারা আমরা সেইসব আন্তর্জাতিক সনদকে বুঝবো , যা প্রণয়ন করেছে জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত অংগ সংস্থাসমূহ। অতঃপর তাতে স্বাক্ষর দান ও অনুমোদনের জন্য এবং সেগুলিকে মানবাধিকারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক আইনী উৎস রুপে গণ্য করার জন্য সদস্য দেশগুলোর সামনে পেশ করা হয়। অনুমোদন হল আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের সর্বশেষ পর্যায়।

বেসরকারী আন্তর্জাতিক চুক্তির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের নিরাপত্তার জন্য মানবাধিকার চুক্তি

১	মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ চুক্তি :১৯৪৯
২	নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫২
৩	নাগরিকত্বহীণ লোকদের অবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫৪
৪	বিবাহীত নারীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫৭
৫	নাগরিকত্ববিহীন অবস্থা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৬১
৬	নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান চুক্তি : ১৯৬৭
৭	শরণার্থী সংক্রান্ত বিশেষ চুক্তিত : ১৯৫১ এবং প্রটোকল : ১৯৬৭
৮	বিবাহে সম্মতি, বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন চুক্তি : ১৯৮২
৯	শিশু অধিকার চুক্তি: ১৯৮৯

(খ) নির্দিষ্ট অধিকারসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট চুক্তি

১	দাসত্ব বিলোপ চুক্তি ১৯৬২, প্রটোকল ১৯৫৩, পরিপূরক চুক্তি ১৯৫৬
২	ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তি ১৯৪৮
৩	ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সংরক্ষণ চুক্তি ১৯৪৯
৪	গণহত্যারোধ ও গণহত্যার শাস্তি সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪৮
৫	বেকার শ্রম নিষিদ্ধ চুক্তি ১৯৫৭
৬	চাকুরী ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ চুক্তি : ১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৭	সর্বপ্রকারের বর্ণবৈষম্য বিলোপ ও তার শাস্তি সম্বলিত আন্তর্জাতিক চুক্তি : ১৯৬৫
৮	কর্মচারীদের রাজনৈতিক সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৬৪
৯	শ্রম সম্পর্ক চুক্তি : ১৯৬৪
১০	নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ, পাশবিক, অবমাননাকর ও অমানুষিক শাস্তিরোধ চুক্তি: ১৯৪৮

(গ) সশস্ত্র সংঘর্ষকালীন বাস্তবায়নযোগ্য চুক্তিসমূহ

১	প্রথম জেনেভা চুক্তিতে রণাঙ্গনে আহত ও রোগগ্রস্ত সেনাসদস্যদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাহায্য সংক্রান্ত প্রটোকল : ১৯৪৯
২	দ্বিতীয় জেনেভা চুক্তিতে রণাঙ্গনে আহত ও রোগগ্রস্ত সেনাসদস্যদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাহায্য সংক্রান্ত প্রটোকল : ১৯৪৯
৩	তৃতীয় জেনেভা চুক্তিতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে প্রটোকল : ১৯১৯৪৯
৪	চতুর্থ জেনেভা চুক্তিতে যুদ্ধকালে বেসামরিক লোকদের সুরক্ষা সম্পর্কে প্রটোকল : ১৯৪৯
৫	জেনেভা চুক্তির সাথে সংযুক্ত ও আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সংক্রান্ত প্রটোকল : ১৯৭৭
৬	জেনেভা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ও আঞ্চলিক সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রটোকল : ১৯৭৭

মানবাধিকারের আঞ্চলিক আইনী উৎসসমূহ

১.	ইউরোপীয় সামাজিক চুক্তি : ১৯৬১
২.	নির্যাতন, অমানুষিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি নিষিদ্ধকরণে উইরোপীয় চুক্তি : ১৯৮৭
৩.	আমেরিকার বেগোটা চুক্তি : ১৯৪৮
৪.	মার্কিন মানবাধিকার চুক্তি ১৯৬৯
৫.	আফ্রিকান মানবাধিকার চুক্তি : ১৯৮১
৬.	আরব সাংস্কৃতিক চুক্তি : ১৯৪৫
৭.	আরব সাংস্কৃতিক ঐক্য চুক্তি: ১৯৬৪
৮.	শ্রম সংক্রান্ত আরব চুক্তি : ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৯.	আরব অর্থনৈতিক ঐক্য চুক্তি : ১৯৫৭
১০	আরব সাধারণ বাজার চুক্তি : ১৯৬৪
১১	আরব শ্রমচুক্তি ও তার কৌশল : ১৯৮০
১২	আরব শিশু অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৮২

৩. আর্ন্তজাতিক আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত : আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম উৎস হল আর্ন্তজাতিক আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার দলিলে International Court of Justice এর ইখতিয়ার নাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে , তবুও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে Intrenational Court of Justice রায় প্রদান করেছে যা মানবাধিকারের অন্যতম স্বীকৃত উৎস। যেমন- বাস স্থানের অধিকার, বিদেশীদের অধিকার, শিশু অধিকার, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষেত্রে জনগনের চলমান ইচ্ছার অস্তিত্ব ইত্যাদি মানবাধিকারের উৎসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল। কতিপয় মামলায় এই প্রসঙ্গে আদালত যে রায় প্রদান করেছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানবাধিকারের উৎসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল। যেমন- Lawiess Case; Knechti Case; Crolder ; United Kingdom, Tyrer V. United Kingdom; The Sunday Time Case ; The Dudgeon Case; The Case of Young Jamies and Webster. প্রভৃতি মামলায় যে রুলিং প্রদান করা হয়েছে তা আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্ত সম্প্রসারিত করেছে।

৪. আইনজ্ঞদের মতামত : মানবাধিকারের অন্যতম উৎস হল আইনবিজ্ঞানীদের বিজ্ঞ মতামত। তাদের এ মতামত আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তা মানবাধিকার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিটি আন্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষ ও ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনবিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। যেমন- বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি, নির্যাতনের বিরূদ্ধে কমিটি, শিশু অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, কাউন্সিল অব ইউরোপ, ইউরোপিয়ান কমিশন অব হিউম্যান রাইটস, আফ্রিকান কমিশন অব হিউম্যান এ্যান্ড পিপলস রাইটস প্রভৃতি সংস্থা মানবাধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের কার্যাবলীর নিদর্শন মানবাধিকারের উৎস হিসেবে পরিচিত হচ্ছে।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকারের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।[১৭] যেমন-

১. সার্বজনীন সহজাততা (Universal Inherence) : সার্বজনীন সহজাত বলতে বুঝায় যে কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করা মাত্র এ অধিকারগুলো দাবী করতে পারে।

১৭ Karel Vasak, *The international Dimension of Human Rights*, Vol,-1, p.43

Dhaka University Institutional Repository

২. অহস্তান্তরযোগ্য (Inalinability) : অহস্তান্তরযোগ্য বলতে বুঝায়, যে অধিকার হস্তান্তর যোগ্য নয়।

Paul Sieghart মনে করেন "এই বৈশিষ্ট্য দু'টির কারণেই 'মানবাধিকার' অন্যান্য অধিকার থেকে আলাদা এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।"[১৮]

মানবাধিকারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

ক. মানবাধিকার : মানুষের অধিকার

যে অধিকার একান্ত ভাবেই মানুষের, প্রথমত: তাকেই মানবাধিকার বলে। পশু-পাখির প্রাণ আছে তাই তারা প্রাণী, মানুষের প্রাণ আছে তাই মানুষ ও প্রাণী। প্রাণীর এ দুই শ্রেণীর মধ্যে নিশ্চয় তফাৎ আছে। পশু-পাখি যা পারে না মানুষ তা পারে। মানুষের এই বিশেষ ক্ষমতাই তার বিশেষ অধিকার। মানুষ চিন্তা করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে। চিন্তা ও উদ্ভাবনের এই ক্ষমতা মানুষকে পশু-পাখি থেকে পৃথক করেছে, এই শক্তি বা ক্ষমতা নিয়েই মানুষ জন্মেছে। এই শক্তির ব্যবহারের অধিকারই মানবাধিকার।

মানুষ কথা বলতে পারে কিন্তু পশু-পাখি কথা বলতে পারে না। অর্থাৎ তাদের নিজেদের ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ অনর্গল কথা বলতে পারে, নতুন ধ্বনি দিয়ে নতুন কথা সৃষ্টি করতে পারে। আবার সুর, তাল, লয় দিয়ে কথাকে সঙ্গীতের রূপ দিতে পারে। এই যে ক্ষমতা এটি মানবিক ক্ষমতা এবং এর ব্যবহারের অধিকার মানবাধিকার। কেউ যদি মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায় বা কেড়ে নেয় তাহলে সে মানুষের মানবাধিকার হরণ করে।

মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ বলেন "মানুষের এসব অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে বাধাহীন হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। চিন্তাভাব প্রকাশ, চলাফেরা কথা বলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকাই মানবাধিকার। অকারণে এসব ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা মানবাধিকার পরিপন্থী।"[১৯]

খ. মানবাধিকার : সকলের অধিকার

মানবাধিকার হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার, এ অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা দেশের অধিকার নয়। সকল মানুষ অভিন্ন নয় বরং প্রতেক মানুষই স্বতন্ত্র, কিন্তু জীবনের বৃহৎ এলাকায় সকল মানুষ অভিন্ন ও এক। এই অভিন্ন এলাকায় যে কোন ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থী। সুতরাং ইউরোপীয়দের অধিকার এক আর এশিয়ানদের অধিকার অন্য। এরূপ অধিকার মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে না।

"যে সব বৈষম্য মানুষের সৃষ্টি যেমন বর্ণ, গোষ্ঠী, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ সেগুলোর কারণে মানুষের অধিকারের কোন পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্মণ, ক্ষুদ্র, জমিদার, প্রজা, শিল্পপতি, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র এসব বিভাজনের কারণে মানুষের অধিকারের তারতম্য করা বা হেরফের করা

১৮ Paul Sieghsrt, *The International Law of Human Rights,* 1983, p. 1
১৯ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের পরিপন্থী। মানবধিকারে বর্ণিত অধিকার প্রতিটি মানুষের। কোন কারণে কোন অজুহাতে এই অধিকার থেকে কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম বা বর্ণের লোককে বঞ্চিত করা যাবে না।"[২০]

গ. মানবাধিকার : সকলের সমান প্রাপ্য

মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে আছে সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্যতা। মানবাধিকার যেমন সকল মানুষের অধিকার তেমনি এই অধিকার সকলের সমানভাবে প্রাপ্য। রাজা-বাদশাহ, গুরু-পুরোহিত, ইমাম, শিল্পপতি প্রমুখের অধিকার যতটুকু সাধারণ চাষী, মজুর,দরিদ্র বেকারেরও ততটুকুই অধিকার।

ঘ. মানবাধিকারঃ আদায়যোগ্য

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারসমূহ হচ্ছে এমন যেগুলো আদায়যোগ্য। মানবাধিকার হবে তেমন অধিকার যেগুলো বিমূর্ত এবং অবাস্তব কিছু নয়। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে এসব অধিকার আদায় করতেই হবে এবং এগুলে আদায়ের অযোগ্য বা অসম্ভব কিছু নয়।

মানবাধিকার : বিশেষ মর্যাদা নির্ভর নয়

বিশেষ মর্যাদার কারণে মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের মধ্যে ইতর বিশেষ করে না। জীবন ধারনের অধিকার, জীবন ভোগের অধিকার, আহারের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিচারের অধিকার, ভাবপ্রকাশের অধিকার মানুষ মাত্রই প্রাপ্য। বিশেষ মর্যাদার কারণে এসব অধিকার উদ্ভব হয় না।

মানবাধিকারের প্রকারভেদ

মানবাধিকার প্রথমত: ৩ (তিন) প্রকার । যেমন–

১। স্বীকৃতি বা গ্রহনের ভিত্তিতে (On Basis of Recognition)।

২। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে গ্রহণের ভিত্তিতে (On Basis of Adoption in the Conostitution of the States) ।

৩। আইনগত বলবৎযোগ্যতার ভিত্তিতে (On Basis of Legal Enforcibility)।

স্বীকৃতি বা গ্রহণের ভিত্তিতে মানবাধিকার

আন্তর্জাতিক আইনের কোন কোন দলিলে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ভিত্তিতে মানবাধিকার সমূহ নিম্নলিখিত দু'ভাবে বিভক্ত হয় :

(ক) আইনগত বা স্বীকৃত মানবাধিকার (Legal or Recognised Human Rights) : "১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে যে 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' গ্রহণ করে তাতে উল্লেখিত ২৫ টি অধিকারকে বর্তমানে সভ্য পৃথিবীতে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ফলে এই ঘোষণা বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছে।"[২১] ১৯৬০ সালের কলোনী স্বাধীনতা ঘোষণার [২২] (Declaration on the Granting

---

২০ প্রাগুক্ত।

২১ M.Ershadul Bari, *International Concern for the Promotion of Human Rights* (Dhaka : The Dhaka University Studies, 1991), Part-F, Vol.(1), p.35

Dhaka University Institutional Repository

of independenec to colonial Countries and peoples) মাধ্যমে 'জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার' নামক আরেকটি মানবাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের Declaration on the Right to Development[২৩] এর মাধ্যমে 'উন্নয়নের অধিকার' নামের আরেকটি অধিকার এ তালিকায় যুক্ত হয়েছে। সুতরাং মানবাধিকারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। তবে সার্বজনীন ঘোষণায় প্রদত্ত অধিকারগুলো সকল জনগোষ্ঠী ও সকল জাতির জন্য 'অর্জনের সাধারণ মানে' -এ পরিণত হয়েছে। সার্বজনীন ঘোষণা থেকে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজস্ব সংবিধানে বিভিন্ন সংখ্যক অধিকার গ্রহণ করেছে। "যেহেতু সার্বজনীন ঘোষণা আন্তর্জাতিকর আইনে স্বীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং যেহেতু এতে এমন একটিও অধিকার নেই যেটি কোন না কোন রাষ্ট্রে গৃহিত হয়নি সেহেতু, মূলত এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারগুলোকে আইনগত বা স্বীকৃত মানবাধিকার বলা হয়ে থাকে।"[২৪]

(খ) নৈতিক বা স্বীকৃতিহীন মানবাধিকার (Moral or Unrecognised Human Rights)ঃ "মানবধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অথবা অন্য কোন আন্তর্জাতিকর দলিলে যেসব অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্থান পায় না অথচ মানবাধিকার হওয়ার যোগ্য সেগুলোকে নৈতিক বা স্বীকৃতিহীন মানবাধিকার বলা যায়।" যেমন, ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বরের পূর্বে 'জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'। উল্লেখ্য যে, বর্তমানের অনেক অধিকারই ভবিষ্যতে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সংবিধানে গ্রহণের ভিত্তিতে মানবাধিকার

উপরে উল্লেখিত আইনগত মানবাধিকারগুলো রাষ্ট্রীয় সংবিধানে গ্রহণের ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে যথা: [২৫]

(ক) প্রত্যক্ষ আইনগত মানবাধিকার (Derect Legal Human Rights) : "কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে যে কয়টি মানবাধিকারকে সার্বজনীন ঘোষণা বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক দলিল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোকে বলা যায় প্রত্যক্ষ আইনগত মানবাধিকার।"

(খ) পরোক্ষ আইনগত মানবাধিকার (Indirect Legal Human Rights) : "সার্বজনীন ঘোষণা বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক দলিলের যে কয়টি অধিকার কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে স্থান পায় না সেগুলোকে বলা যায় পরোক্ষ আইনগত মানবাধিকার।" যেমন সার্বজনীন ঘোষণার ১৪ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত 'রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার' বাংলাদেশের সংবিধানে অর্ন্তভূক্ত হয় নি। এটি পরোক্ষ আইনগত অধিকার।[২৬]

---

২২ GA Resolution 1514 (xv) of 14 December 1960. উদ্ধৃতঃ রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, পৃ. ১৩৯

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৫ প্রাগুক্ত।

২৬ অনুচ্ছেদ ১৪, UDHR : (ক) নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত বলবৎযোগ্যতার ভিত্তিতে মানবাধিকার

রাষ্ট্রের সংবিধানে স্থান পেলে কোন মানবাধিকার আইনগত অধিকারের মর্যাদা পেতে পারে, কারণ সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কিন্তু সকল আইনগত মানবাধিকার আইনগত ভাবে বলবৎযোগ্য নয়। এরূপ আইনগত বলবৎযোগ্যতার ভিত্তিতে আধিকারগুলোকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) যথাযথ মানবাধিকার (Perfect Human Rights) : যে সমস্ত মানবাধিকার সংবিধানে স্থান পায় এবং সাংবিধানিকভাবে বলবৎযোগ্য, যেগুলো খর্ব করা হলে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেগুলোকে বলা যায় যথাযথ মানবাধিকার। "বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকারগুলোকে সাংবিধানিকভাবে বলবৎ করা যায় এবং এগুলো খর্ব করা হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে।"[২৭]

(খ) অযথাযথ মানবাধিকার (Imperfect Human Rights) : যে সমস্ত মানবাধিকার সংবিধানে স্থান পায় এবং সাংবিধানিকভাবে বলবৎযোগ্য নয় সেগুলোকে বলা যায় অযথাযথ মানবাধিকার। বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে যেসব মানবাধিকার গৃহিত হয়েছে সেগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

১. **সংজ্ঞাগত পার্থক্য :** যে সকল অধিকার ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং নাগরিক জীবনের যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব হয় না তাহাকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) বলা হয়। এক কথায় নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য সুযোগ সুবিধাগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে, কোন একটি বিশেষ দেশ, জাতি, বা রাষ্ট্রের নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য সুযোগ সুবিধাগুলিকে মানবাধিকার (Human Rights) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২. **সন্নিবেশিত হওয়ার প্রশ্নে :** মৌলিক অধিকার যে কোন দেশের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। পক্ষান্তরে মানবাধিকার জাতিসংঘের (U N. Charter) মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. **সীমাবদ্ধতার প্রশ্নে :** মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা আছে; পক্ষান্তরে মানবাধিকারের সেরূপ কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

৪. **নিরাপত্তা ও সমতার নিশ্চয়তা প্রদানের প্রশ্নে :** মৌলিক অধিকার নাগরিকদের সর্ব প্রকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। পক্ষান্তরে মানবাধিকার সেরূপ পারে না।

৫. **কার্যকর করার প্রশ্নে :** মৌলিক অধিকার কার্যকর করা যায় সরকারের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। পক্ষান্তরে মানবাধিকার সরকার ও ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর করা যায়।

৬. **বাতিলের ঘোষণা প্রশ্নে :** মৌলিক অধিকারের সহিত অসামাঞ্জস্য আইনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। পক্ষান্তরে মানবাধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইনকে তেমনভাবে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা যায় না।

---

২৭ রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১

Dhaka University Institutional Repository

৭. **ব্যাপকতার প্রশ্নে :** মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক। অর্থাৎ ইহা একটি ব্যাপক ধারণা, পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের একটি অংশ বিশেষ।

৮. **উৎসাহিত পার্থক্য :** মানবাধিকারের উৎস হল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন ঘোষণা। Universal Declaration of Human Rights) ও আন্তর্জাতিক আইন। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকারের উৎস হল কোন দেশের সংবিধান (Constitution).

৯. **অধিকারের প্রকৃতির প্রশ্নে :** মানবাধিকার মানুষের সার্বজনীন সহজাত, শাশ্বত ও চিরন্তন অধিকার পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার হল সাংবিধানিক স্বীকৃত অধিকার।

১০. **অন্তর্ভূক্তির প্রশ্নে :** সকল মৌলিক অধিকার মানবাধিকার, কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। (All Fundament Rights are Human Rights But all Human Rights are not Fundamental Rights).

১১. **সীমাবদ্ধতার প্রশ্নে :** মানবাধিকার কোন ভৌগলিক সীমা রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১২. **বলবৎ করার প্রশ্নে :** মানবাধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না, পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য। মানবাধিকার যেহেতু আর্ন্তজাতিক বিষয় সেহেতু একে কার্যকর ও বলবৎ করার দায়িত্ব আর্ন্তজাতিক সংগঠন জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থার উপর বর্তায়। কিন্তু মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব বর্তায় দেশীয় আদালতের (Local Judiciary) উপর। মানবাধিকার সম্বলিত সার্বজনীন ঘোষণা সম্পর্কে -Dennig বলেছেন, "The Universal Declaration of 1948 was absoulutely usless for one decisive reson. There was no means of enforcing it. There was no Court to give orders. There were no police to arrest offenders"।[২৮] উপযুক্ত বাস্তবায়ন ছাড়া মানবাধিকার হল "বস্তু ছাড়া ছায়ার মত।"[২৯] পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার একটি দেশের সংবিধানে প্রদত্ত সবচেয়ে অলংঘনীয় অধিকার এবং কি ভাবে তা' কার্যকর করা হবে তা বলা থাকে দেশের সংবিধানে।

১৪. **সংরক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে :** সর্বোপরি মানবাধিকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষিত নয়। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকারসমূহ দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, মানবাধিকার, তার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Protection and Promotion) আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় কিন্তু মৌলিক অধিকার এবং তার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন একটি রাষ্ট্রের এবং তার সাংবিধানিক আইনের বিষয় বস্তু।

---

২৮ Denning, What Next in the Law(1982), pp.277-78। উদ্ধৃতি, রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৯ Pro.Humphary Richard B.Lillch, *Civil Rights in Theodore Meron Led Human Rights in International Law*, Vol.1, p.134

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

ইসলামে মানবাধিকার : ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন, মৌলিক মানবাধিকারের ধারণাও তত প্রাচীন। এই পৃথিবীতে পদার্পণকারী প্রথম মানব তাঁর জীবনের সূচনা অজ্ঞতার অন্ধকারে নয়, জ্ঞানের আলোতেই শুরু করেছিলেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا "আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন।"[৩০] এখানে " كُلَّهَا " এই আরবী শব্দ থেকে জানা যায় এই জ্ঞান আংশিক ছিল না বরং ছিল পূর্ণাঙ্গ। জীবনের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষ তার মৌলিক জ্ঞান ও গবেষণা অনুসন্ধানের গঠন প্রকৃতির সাহায্যে জিনিস সমূহের জ্ঞানের পরিসর ব্যাপক ও প্রশস্ত করতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। মরহুম মাওলানা মওদূদী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "কোন বস্তুর নামের সাহায্যে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে; এটাই মানুষের জ্ঞান লাভের পদ্ধতি। তাই আদম (আ.)-কে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ ছিল তাঁকে সমস্ত জিনিসের জ্ঞান দান করা হয়েছিল।"[৩১]

বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য কি তার পূর্ণ চেতনা ও অপরিহার্যরূপে উক্ত জ্ঞানের মধ্যে শামিল ছিল। অতএব হযরত আদম (আ.) এর জীবনেই অধিকারের প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হল আর তখন সাথে সাথেই এই সত্যও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ কেবল নিজের ধারণা অনুমান অথবা সংজ্ঞার ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহ নির্ধারিত বিধানের কারণে এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনা সম্পন্ন ছিল।

প্রমাণ স্বরূপ আমরা হাবিল ও কাবিলের ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। যেমন– কাবীল যখন আল্লাহর দরবারে নিজের কোরবানী কবুল না হওয়ার পর হাবীলকে হত্যার হুমকি দিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ "আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না; আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাই এবং ইহা যালিমদের কর্মফল।[৩২]

---

৩০ আল-কুরআন, ২ : ৩১ [বি.দ্র. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়াতের অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ, *আল্-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৫ তম সংস্করণ, ১৪২৮হি./২০০৭ খৃ.), থেকে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও দু'একটি অনুবাদের সহায়তা নেয়া হয়েছে। স্থানবিশেষে গবেষক কর্তৃক অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে তবে তা উল্লেখ করা হয়নি।]

৩১ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.), অনু.মাও. আবদুল মান্নান তালিব, *তাফহীমূল কুরআন*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সংস্ক.,১৪২৫হি./ ২০০৪ খৃ.), খ. ১ম, পৃ. ৬৪-৬৫

৩২ আল-কুরআন, ৫ : ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, মানব জীবনের সম্মান ও নিরাপত্তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে হেদায়াত দান করেছিলেন, হাবীলের সে সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। সে কেবল খোদাভীতির কারণে নিজের জীবন দিয়ে দিল, কিন্তু ভাইয়ের প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে হাত উঠানো ঠিক মনে করেনি। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ, আল্লাহর বান্দাহ এবং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত যে বিধান দেওয়া হয়েছিল তা মানব জীবনের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আইন কানুনসহ হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে মানবাধিকার এর রূপ পেতে থাকে।

মানুষের পরিসর যত বিস্তৃত হতে থাকে তাকে সুশৃঙ্খল করার বিধানও নাযিল হতে থাকে। অবশেষে মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে মানব জাতির শিক্ষা প্রশিক্ষণের এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আর তাইতো বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন – الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৩৩]

এই যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তার ইতিহাস স্বয়ং কুরআন থেকে আমরা পাই। إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৩৪]

হযরত আদম (আ.) থেকে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের যে ধারা চালু হয়েছিল কোন রূপ বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে একের পর এক নবীগণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকে। "কুর'আন মজীদ আমাদের বলে দিয়েছে যে, সকল নবী রাসূল কোনরূপ পার্থক্য ব্যতীত মানব জাতিকে একই দীন (জীবন ব্যবস্থা) কবুলের আহ্বান জানান। তাদের মিশন ছিল একই, তারা একই জীবন ব্যবস্থার পতাকাবাহী ছিলেন এবং এই জীবন ব্যবস্থা তাদের প্রণীত ছিল না বরং তাদের রিসালতের পদে সমাসীনকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত।"[৩৫]

মহান আল্লাহ তা'আলা দীনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন মানবাধিকারের চেতনা সমূহকে। যেমন, কুর'আনে বলা হয়েছে– شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি তোমার নিকট এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না।"[৩৬]

---

৩৩ আল-কুরআন, ৫ : ৩

৩৪ আল-কুরআন, ৩ : ৩৩-৩৪

৩৫ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১০৯

৩৬ আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

এই দীন শুধুমাত্র আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন পর্যন্তই সীমিত ছিল না বরং আকীদা বিশ্বাস থেকে নিয়ে জীবনের সার্বিক বিষয়ের সংশোধন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাতে জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে ব্যাপক পথ নির্দেশনা বর্তমান ছিল। যেমন আল-কুর'আনে বলা হয়েছে- وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا "আমি মূসার জন্য জীবনের সব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ফলকে লিখে দিয়েছি; সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহার যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও।"[৩৭]

খাঁটি অধিকার ও কর্তব্যের ভাষায় আমাদের জানা দরকার যে, এই দীন এবং তার বিস্তারিত হেদায়াত কি ছিল? এ ব্যাপারে কুর'আন ফয়সালা দিয়েছে– وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

"স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, কিন্তু সল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ- ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যখন তোমাদের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপজনদের স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না।"[৩৮]

কুর'আন পাকের পেশকৃত মানবাধিকারের এই ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মৌলিক অধিকারের ধারণা সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টির দিন থেকেই বিদ্যমান। তা থেকে আরও জানা যায় যে, এসব অধিকারের উৎস কি? তা মানুষ ও তার স্বকল্পিত শাসক গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং তাদের মাঝে কৃত চুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বশীল নয়, নয় কোন দার্শনিক রাজনীতিবিদ অথবা আইনজ্ঞের গভীর চিন্তা প্রসূত এবং স্বীয় সৃষ্টিকুলের জন্য তাদের স্রষ্টার বরং স্বীয় প্রজাদের জন্য তাদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। তা মানুষের সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য, যা মানব সৃষ্টির সাথে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এসব অধিকারের সর্বশেষ এবং বিস্তারিত বিবরণ মহানবী (সা.) এর আনীত শরী'আতে প্রদত্ত হয়েছে। এসব অধিকার স্থান কালের সীমার উর্ধ্বে। এসব অধিকার পরিবর্তন অযোগ্য এবং একান্তই অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্রের কাজ অধিকার নির্ধারণ নয় বরং নির্ধারিত অধিকারের বাস্তবায়ন।

লুইস হেনকিন তাঁর সম্পাদিত The International Billd Rights পুস্তকের 'Introduction' এ উল্লেখ করেছেন Human Rights the idea of our time "মানবাধিকার সম্বন্ধে পশ্চিমা বিশ্বের সকল আইনবিদদের ধারণা একই রকম, কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সঠিক নয়।"[৩৯]

---

৩৭ আল-কুরআন, ৭ : ১৪৫

৩৮ আল-কুরআন,২: ৮৩-৮৪

৩৯ ড.এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যবাসীগণের দাবী এই যে, মৌলিক ও মানবাধিকারের ইতিহাস মাত্র তিন চারশো বছরের পুরাতন। তারা এই সময়কালে নিজেদের এখানে প্রকারান্তরে সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনায় যা কিছু অর্জন করেছে তার দ্বারা আজও গোটা দুনিয়া উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু কুর'আন মাজীদ আমাদের সামনে যে ইতিহাস পেশ করেছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম মানব যে দিন এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন সেদিন থেকে মৌলিক অধিকার তাঁর চেতনা ও অনুভূতির অংশ হয়ে আছে। এসব অধিকার নির্ধারণ ও অর্জন তাঁর নিজের অবদান নয় বরং স্বয়ং একচ্ছত্র অধিপতি পর্যায়ক্রমে তাকে দান করেছেন। আজ পৃথিবীর যেখানেই এসব অধিকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেখানে ঐশী শিক্ষার আলোকরশ্মির দ্বারাই মৌলিক অধিকারের চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

নরম্যান কাজিনস -এর We Trust in God গ্রন্থে আমেরিকান সংবিধানের রচয়িতাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে বেনজামিন, ফ্রাংকলিন, জর্জওয়াশিংটন, জন এডামস, টমাস জেদেরশন, জেমস মেডিশন, আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, স্যামুয়েল এডাম, জন জে ও টমাস পেইন সকলেই খৃষ্টবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের চিন্তাধারার উপর তাদের বিশ্বাসের গভীর প্রভাব ছিল। তাইতো জেমস- মেডিশন অধিকার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "এখানে এক ব্যক্তির যে অধিকারই রয়েছে তা মূলত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের উপর খোদার পক্ষ থেকে আরোপিত হওয়ার মত কর্তব্য।"[৪০]

অনুরূপভাবে বৃটেন, ফ্রান্সের সংবিধানও যদি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করা হয় তবে সেখানেও মৌলিক অধিকারের আসল উৎস ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিশেষত ইউরোপের উপর ইসলামের গভীর প্রভাবের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, মানবাধিকার সম্বন্ধে পশ্চিমা বিশ্বাস সকল আইন বিদদের ধারণা একই রকম হলেও তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। শুধু তাই নয় প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকারের ধারণাটি বর্তমান যুগের নয়। প্রায় চৌদ্দশত বৎসরেরও আগে পবিত্র কুর'আন এবং হাদীসের মাধ্যমে ইসলামী আইনে মানবাধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়। ইসলামী আইনে সংযোজিত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহ বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামী আইনে বর্ণিত মানবাধিকার সমূহ যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত সেহেতু কোন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এইগুলি স্থগিত রাখা যাবে এমন কোন বিধান নেই। এতে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা যায় না এবং এই অধিকারগুলি পৃথিবীর সকল মানব সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুর'আন ও হাদীসে সমস্ত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality of all Persons)

২. জীবন ধারণ, সম্পদ ও মর্যাদার অধিকার। (Rights to Life, Wealth and Prestige)

৩. ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (Right to Personal Freedom)

৪. গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা (Democratic Freedome)

---

৪০ Norman Kagins, *We Trust in God* (New york: 1958), p. 17

Dhaka University Institutional Repository

৫. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার (Rights of the Religions Minority)

৬. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার (Right to Economic Security)

৭. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

৮. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

৯. বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

১০. সমান অধিকার

১১. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

১২. পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার

১৩. রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের অধিকার

১৪. স্থানান্তরগমণ ও বসবাসের স্বাধীনতার অধিকার

১৫. পরিতোষক ও বিনিময় লাভের অধিকার

১৬. শিশু অধিকার

১৭. বৃদ্ধদের অধিকার

১৭. নারীর অধিকার ইত্যাদি

১৯. দাসদের অধিকার

২০. সকলের জন্য শিক্ষা

২১. সংখ্যালঘুদে অধিকার

২২. যুদ্ধ বন্দিদের অধিকার

২৩. প্রত্যেকের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা

২২. বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

২৩. প্রত্যেক প্রাপ্ত নর নারীর সমান দায়িত্বের অধিকার

অতএব, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ধর্ম প্রথম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকারে কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে এবং সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের উন্নয়নে ইসলামের অবদান অনঃস্বীকার্য।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় মানবাধিকার : ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের পর ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলি জাতীয়ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকার দরুন সেই সময়ে সেখানে মূলতঃ মানুষের মৌলিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। কেননা পূর্বে মনে করা হতো যে, মানুষকে অধিকার দেয়া বা না দেয়া রাজার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কিন্তু কালক্রমে রাজার এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা জনগণের প্রবল আন্দোলনের কারণে অস্তমিত হয় এবং সেখানে জনগণের সরকার কায়েম হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ বিভিন্ন দাবীর মাধ্যমে রাজার নিকট থেকে তাদের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকারগুলো আদায় করতে থাকে। ফলশ্রুতিতেতে বিভিন্ন সময়ে জন্ম নেয় অধিকার সংক্রান্ত বিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা

২. ১৬২৭ সালের পিটিশন অব রাইটস

৩. ১২৮৮ সালের বিল অব রাইটস

৪. ১৭০১ সালের এ্যাক্ট অব সেটেলম্যান্ট। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta. 1215)

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলনের আমল সূচনা হয় ১১শ শতকে ইংল্যান্ডে যেখানে ১০৩৭ সালে রাজা হয় (কনরাড) একটি ফরমান জারি করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেন। এই ফরমানের পরে পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধি করার চেষ্টা শুরু করে। ১১৮৮ সালে রাজা ৯ম আলফন সোর দ্বারা অন্যায়ভাবে আটকের নীতিমালা পাস করিয়ে নেয়া হয়। ১২১৫ সালের ১৫ই জুন ম্যাগনাকার্টা জারি হয়। ইংল্যান্ডে মানবাধিকারের বিকাশ তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পিছনে ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টাকে সর্বপ্রথম দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই ম্যাগনাকার্টার ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

১। কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে জেলে বা বন্দী করে রাখা যাবে না।

২। অথবা, তার উপর কর আরোপ করা যাবে না।

৩। চার্চকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

৪। জনগণের আদালতের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও দ্রুত বিচার নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫। রাজকীয় অফিসারের দ্বারা স্বেচ্ছাচারীভাবে আরোপ এবং সম্পত্তি আটক বা দখলের বিধান রহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সনদে বিধান রাখা হয় যে, আইনের যথাযথ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার জীবন, স্বাধীনতা, ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ম্যাগনাকার্টার মাধ্যমেই জারীর সাহায্যে বিচার ব্যবস্থা এবং হেরিয়াস কার্পস রীট সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টার ইংলিশ আইনের সর্বপ্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতা বা Personal Liberty প্রবর্তন করেছে এবং তাই এই সম্পর্কে 'Keystone of English. Liberty' বলে অভিহিত হয়।[৪১]

১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস (Petition of Rights. 1628)

ম্যাগনাকার্টার পর বৃটিশ জনগণের মানবাধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে দলিলটির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস এবং ইহাই হচ্ছে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সর্বপ্রথম

---

৪১ ড.এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক দলিল। এই বিলটি এতই সংক্ষিপ্ত যে, উহাতে কেবলমাত্র ৪টি ধারা সন্নিবেশ করা হয়।[৪২]

এই পিটিশনে বলা হয় যে,

ক. পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তির উপর কর আরোপ করা যাবে না।

খ. কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে জেলে আটক রাখা যাবে না।

গ. সেনাবাহিনীর কোন দল গৃহকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কারও গৃহে অবস্থান করতে পারবে না।

ঘ. এবং রাজা বা রাণী কর্তৃক সামরিক আইনে প্রসিডিং এর জন্য কমিশন জারী করা যাবে না।

১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটস (Bill of Rights, 1688)

পিটিশন অব রাইটস এর পরে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে ১৬৮৮ সালে বিল অব রাইটস।[৪৩] এই বিল এর ধারাগুলি ছিল ।

১. রাজা কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজকীয় কমিশন বা আদালত গঠন সংক্রান্ত রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

২. পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত স্থায়ীভাবে শান্তির সময়ে সেনাবাহিনী গঠনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

৩. রাজার নিকট প্রজাদের আবেদন করার অধিকার সৃষ্টি হয়।

৪. পার্লামেন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টে কথা বলার এবং বিতর্কে অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

উল্লেখ্য যে, এই দলিলের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলী সংযোজিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে "Wade এ and Phillips মন্তব্য করেন, The Princepal provesions of the Bill of Rights. 1688 which laid the foundations of the modern constitution by disposing of most of the more extravagant claims of the Stuarts to rule by prerogative rights..."[৪৪]

১৭০১ সালের অ্যাকট অব সেটেলমেন্ট (Act of Settlemant, 1701)

বৃটেনের জনগণের মানবাধিকারের উত্তরণের পরবর্তী দলিল হচ্ছে- ১৭০১ সালে অ্যাকট অব সেটেলমেন্ট। "এই অ্যাকট দ্বারা সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্ধারণের পাশাপাশি ১৬৮৮ সালে বিল অব রাইটস এ বর্ণিত কতিপয় অধিকারের পরিপুরক কিছু বিধান রাখা হয়। বিল অব রাইটস এবং অ্যাকট অব সেটেলমেন্ট একত্রে "Victory of Parlameant" হিসেবে চিহ্নিত হয়।"[৪৫]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপণীত হতে পারি যে, যদিও ইংল্যান্ডে কোন লিখিত সংবিধান তথা কোন সুনির্দিষ্ট বিল অব রাইটস নেই তথাপি সেখানে বিদ্যমান ম্যাগনাকার্টা, পিটিশন অব রাইটস, বিল অবরাইটস এবং এ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট বিদ্যমান থাকায় তারা বৃটেনের জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আর এই সনদগুলি শুধু ইংল্যান্ডে নয়, বরং সারা বিশ্বের মানবাধিকার বিকাশের মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

আমেরিকায় মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ

আমেরিকার মানবাধিকারের ক্রমবিকাশের দু'টি পর্যায় রয়েছে, যেমন–

ক) **১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা :** ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা মানবজাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। ১৭৭৬ সালের ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ভার্জিনিয়া থেকে জর্জ ম্যাকান রচিত অধিকার সনদপত্র ঘোষিত হয়, যার মধ্যে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। ১৭৭৬ সালে ১২ জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের খসড়া তৈরী করেন টমাস জেফারসন। এতে সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমানাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বর্ণিত নীতিসমূহ মূলতঃ ইংল্যান্ডে মহাসনদ থেকেই অনুসৃত হয়েছে।

বেনথান, এই স্বাধীনতার ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, "সকল মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার পেয়ে থাকে যার মধ্যে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার এবং সুখ সন্ধানের অধিকার। এই অধিকার গুলো মূলত একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"[৪৬]

খ) **আমেরিকার বিল অব রাইটস :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানে প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ বিল অব রাইটস ছিল না। সংবিধান প্রণেতাগণ কেবলমাত্র সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা আহরণেই ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তাতে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি। কিন্তু মানুষের ক্রমঃদাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে কংগ্রেস জনগণের দাবীকৃত বিল অব রাইটস তার পক্ষে সমর্থন দেন । ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য তাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযোজন করে। "অঙ্গরাজ্য সমূহের সংবিধানের যখন ক্রমান্বয়ে মৌলিক অধিকার সংযোজিত হতে থাকে তখন অনুরূপ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ সালে আমেরিকান কংগ্রেসের আইন কার্যকর করার তিন বছর পর তাতে এমন ১০টি সংশোধনী মঞ্জুর করে যা অধিকার 'অধিকার আইন' নামে প্রসিদ্ধ। ১৭৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

দশটি সংশোধনী গৃহীত হয় যাহা পরবর্তীকালে 'আমেরিকান বিল অব রাইটস' নামে পরিচিত হয়।"[৪৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনী বা আমেরিকান বিল অব রাইটস এ যে সমস্ত অধিকার সংযোজন করা হয় সেগুলি হচ্ছে,[৪৮]

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা,
২. বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,
৩. শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাবেশের অধিকার,
৪. অভিযোগ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করার অধিকার,
৫. অস্ত্র রাখা ও বহণ করার অধিকার,
৬. অযৌক্তিকভাবে গ্রেফতার ও তল্লাশীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা,
৭. আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার,
৮. নিরপেক্ষ জুরীর মাধ্যমে অনতিবিলম্বে ও প্রকাশ্যে বিচার লাভের অধিকার,
৯. নিষ্ঠুর ও অসাধারণ শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বাধীনতা,
১০. হেবিয়াস কর্পাস রীট এর মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার,
১১. আইনের পূর্ব প্রয়োগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার,
১২. আইন উপদেষ্টা নিয়োগের অধিকার,
১৩. নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান না করার অধিকার,
১৪. সম্পত্তির অধিকার,
১৫. দ্বিতীয়বার শাস্তি নিবৃত্তির অধিকার,
১৬. আইন দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার,
১৭. দাস প্রথার বিলুপ্তি এবং
১৮. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার।

১৭৯২ সালে টমাস পেইন তার বিখ্যাত পুস্তিকা The Rights of Man প্রকাশ করেন, যা পাশ্চাত্যবাসীর চিন্তার উপর গভীরভাবে বিস্তার করে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনকে আরও সামনে এগিয়ে দেয়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুমোদন করা হয় যাতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার কোন অংগ রাজ্যই আইনগত নীতিমালার অনুসরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও মালিকানা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং তাকে আইনের পক্ষপাতহীন নিরাপত্তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না।[৪৯] অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মালিকানাকে আইন আদালতের এখতিয়ার ভূক্ত করার জন্য সকল অঙ্গরাজ্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

---

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪৮ প্রাগুক্ত।

৪৯ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

১ম বিশ্ব যুদ্ধের পর জার্মানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৪০ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর New World order (নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা) গ্রন্থে মানবাধিকারের একটি সনদপত্র ঘোষণার পরমার্শ পেশ করেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট চারটি স্বাধীনতা সমর্থন করার জন্য আবেদন করেন। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে আটলান্টিক ঘোষণায় দস্তখত করা হয়– যার উদ্দেশ্য ছিল চার্চিলের ভাষায় "মানবাধিকারের ঘোষণার সাথে সাথে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।"[৫০]

২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংযোজন আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন বলেন– "ফ্রান্স তার ১৯৪৬ সালের সংবিধানের ১৭৮৯ সালের মানবাধিকার ঘোষণাপত্র শামিল করে। একই বছর জাপান মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের অংশে পরিণত করে। ১৯৪৭ সালে ইটালি তার সংবিধানে মানবাধিকার গ্যারান্টি দাবি করে।"[৫১]

এভাবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মানবাধিকার নানাভাবে বিভিন্ন আকারে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে– ও সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সনদ' ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করে। "সাধারণ পরিষদে ৪৮টি দেশ এই ঘোষণার পক্ষে ভোট দেয় এবং রাশিয়াসহ আটটি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে। এই ঘোষণাপত্র কতটা কার্যকর হচ্ছে তার মূল্যায়নের জন্য এবং তার সংরক্ষণ অথবা নতুন অধিকারসমূহ চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তাব পেশের উদ্দেশ্যে মানবাধিকার কশিমন নামে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা হয়।"[৫২]

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সহজাতনীতি, ধ্বংসহীনতার নীতি এবং আইনের অনুশাসন ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় রূপ নিতে থাকে। তাই দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যাহত পরে গৃহীত লীগ অব নেশনস এর সনদে এই বিষয়গুলি অনুক্তভাবে উল্লেখিত হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গৃহীত জাতিসংঘ সনদে এইগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয় এবং মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক রূপ প্রদান করা হয়। এভাবেই জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভুত মানবাধিকার আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি লাভ করে।

---

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৫২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলিলসমূহের বিবরণ

জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার (Human Rights in the UN Charter)

১. প্রস্তবনা : "জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা লিখেছিলেন ফিল্ড মার্শাল 'Smuts'। এতে বলা হয়, আমরা সম্মিলিত জাতিসংঘের জনগণ মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তির (Human Person) মর্যাদা ও মূল্য, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং ছোট বা বড় সব জাতির প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে পুনঃনিশ্চিত করছি।"[৫৩]

২. অনুচ্ছেদ ১ (৩) : জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে এই অনুচ্ছেদে। বলা হয়েছে, জাতি, নারী-পুরুষ বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা হবে জাতিসংঘের (অন্যতম) উদ্দেশ্য।

৩. অনুচ্ছেদ ৮ : এতে বলা হয়েছে, "জাতিসংঘের কোন প্রধান বা শাখা সংগঠনে যোগ্যতা বা শর্তের মাধ্যমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের অংশগ্রহণে জাতিসংঘ কোন বাধা আরোপ করবে না। অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েই ঐ সংগঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে– যোগ্যতা থাকলেই হলো। এখানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আইনের দৃষ্টিতে সমতা পাবার সুযোগের সমতা পাবার অধিকারটি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে।"[৫৪]

৪. অনুচ্ছেদ ১৩ (১)(খ) : এতে সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি কর্তব্য পালন করবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে। বলা হয়েছে, সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদ পাঠক্রম ও সুপারিশ পদ্ধতি চালু করবে।

৫. অনুচ্ছেদ ৫৫(গ) এবং ৫৬ : অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ এই দু'টি। অনুচ্ছেদে ৫৫ বলা হয়েছে, "জনগোষ্ঠীগুলোর সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুসুলভ সম্বন্ধ থাকা দরকার তার জন্য স্থিতিশীলতা ও শুভ অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সকল মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও তার কার্যকারিতার ব্যবস্থা করবে। ৫৬ অনুচ্ছেদ সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে। প্রতিশ্রুতি

---

৫৩ রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

৫৪ Lauterpacht, Human Rights and the Charter of United Nations Report, Human Rights Committee, (Passim : International Law Association, 1948), উদ্ধৃত, রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী তারা জাতিসংঘের সহায়তার একক বা যৌথভাবে অনুচ্ছেদ ৫৫ কে বাস্তবায়ন করবে।"[৫৫]

৬. অনুচ্ছেদ ৬২ (২) : ECOSOC বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৭. অনুচ্ছেদ ৬৮ : ECOSOC মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করতে পারবে।

৮. অনুচ্ছেদ ৭৬ (গ) : "জাতিসংঘের অছি পদ্ধতির একটি মূল উদ্দেশ্য হবে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।"[৫৬]

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) :

জাতিসংঘ সনদের ৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।[৫৭] সে অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ECOSOC "মানবাধিকার কমিশন" গঠন করে। এই কমিশনকে একটি "International Bill of Rights"[৫৮] এর খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ দায়িত্ব দেয়া হয় ১৯৪৬ সালে লন্ডনে, সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে (by G.A. Resolution 5 (1) 1946)। কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জানুয়ারী ১৯৪৭। কিন্তু এই "আর্ন্তজাতিক অধিকার বিল" প্রণয়ন করার জন্য "মানবাধিকার কমিশন" যে একটি ড্রাফটিং -কমিটি তৈরী করে সেই কমিটি ১৯৪৭ এর জানুয়ারী থেকে মার্চের আলোচনায় একমত হতে পারছিল না - ঐ বিলে কি কি অন্তর্ভূক্ত থাকবে সে বিষয়ে। শেষত ঃ অনেক কিছু বিবেচনার পর ড্রাফটিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেন যে মানবাধিকার কমিশনে দু'টি জিনিস জমা দেয়া হবে- একটি "মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার ড্রাফট আর্টিকেল" এবং একটি "মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি'র ড্রাফট আর্টিকেল।"[৫৯]

তারপর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে জেনেভাতে সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশন (Commission on Human Rights) সিদ্ধান্ত নেন যে "International Bill of Rights)" এ থাকবে তিনটি অংশ । যেমন-

১. একটি মানবাধিকারের ঘোষণা,

২. একটি মানবাধিকার চুক্তি এবং একটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি।

উক্ত মানবাধিকার কমিশন মিসেস এলিয়েনর রুজভেল্টের (Mrs. Eleanor Roosevelt) নেতৃত্বে 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা'র খসড়া (ড্রাফট) তৈরী করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে জমা দেয়। ঐ খসড়ার সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রস্তাব বিষয়ক খসড়াও ছিল। উল্লেখ্য, এটি জমা দেয়া হয় প্যারিসে, সাধারণ পরিষদের তৃতীয়

---

৫৫ রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৫৬ প্রাগুক্ত।

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৫৮ Dr. M.Ershadul Bari, *International Concern for the Promotion and Protection of Human Rights*(Dhaka : Dhaka University Studies, 1991), p. 3

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে। "স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, "International Bill of Rights)" এর তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমটি ছিল মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা। তাই এটিকে 'তিন সোপান বিশিষ্ট রকেটের প্রথম সোপান' বলা হয় (The First stage of the three staged rocket)।"[৬০]

তখন সাধারণ পরিষদের তথা জাতিসংঘের সদস্য ছিল ৫৮টি রাষ্ট্র। উপস্থিত ছিল ৫৬টি। সার্বজনীন ঘোষণার পক্ষে ভোট দিয়েছিল ৪৮টি। বিপক্ষে কেউ ভোট দেয়নি। তবে ৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল– পুরো সোভিয়েত ব্লকের ৬টি বেলারুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, ইউক্রেইন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন– এবং সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এভাবে, বলা যায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে "মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা" (The Universal Declaration of Human Rights)।[৬১] মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাটি "সকল জাতির এবং মানুষের অর্জনের সাধারণ মান" হিসেবে গৃহিত হয়। যে দর্শনের উপর ভিত্তি করে এটি গৃহিত হয় তা হলো "সকল মানুষই স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সমমর্যাদা ও সমঅধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বিচারবুদ্ধি(reason) ও বিবেকের অধিকারী এবং তাহাদের উচিৎ ভ্রাতৃত্বের মনোভাব লইয়া পরস্পরের সহিত আচরণ করা"।[৬২]

মানবিক অধিকারের এই সার্বজনীন ঘোষণাটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক 'ইশ্‌তেহার' (manifesto) বা কতিপয় মূল্যবান আদর্শের বর্ণনা (statement of ideals) বলা যেত পারে।[৬৩] যে আদর্শগুলি রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত ও পালিত হওয়া উচিত অন্য কথায় ইহা মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের একটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য তালিকা। সনদে শুধু "মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা" সম্পর্কে উল্লেখ আছে, অপরদিকে এই সার্বজনীন ঘোষণায় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ইহা শুধু সনদের অন্তর্ভুক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যাই প্রদান করে না বরং সনদের তুলনায় মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইহা একটি সুস্পষ্ট অগ্রধাপ। একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল "International Bill of Rights)" গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহা প্রথম পদক্ষেপ।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার পূর্ণবিবরণ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার পূর্ণবিবরণ[৬৪] নিম্নে প্রদান করা হল :

প্রস্তাবনা

যেহেতু, মানব-পরিবারের (Human family) সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ব-শান্তির ভিত্তি;

---

৬০ Thomas W. Wilson Jr. 'A Bedrock consensus of Human Rights', in Alice. H. Henkin (ed.) Human Dignity: The Internationlisationo of Human Rights (1979). p. 48

৬১ Bronlie, Basic Documents in International Law, 1972, p.144. উদ্ধৃতিঃ আবুল ফজল হক, *আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৩২০

৬২ আবুল ফজল হক, *আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

৬৩ প্রাগুক্ত।

৬৪ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার পূর্ণবিবরণ, এটি আবুল ফজল হক, *আর্ন্তজাতিক আইনের মূল দলিল*, পৃ. (৩২১-৩৩১) থেকে হুবহু উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু মানবিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননার ফলে এমন সব বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে, যেগুলি মানুষ্য জাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করেছে, এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসাবে এমন এক জগতের আগমন-বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে যেখানে সকল মানুষ বাক স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব হতে মুক্তি ভোগ করবে।

যেহেতু, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে যাহাতে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয় সেইজন্য আইনের অনুশাসন দ্বারা মানবিক অধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য।

যেহেতু, জাতিসংঘের জনগোষ্ঠীসমূহ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকার, মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বিশ্বাসের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে, এবং বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশে সামাজিক অগ্রগতি এবং জীবনের মানের উন্নতি সাধন করতে সংকল্প বদ্ধ হয়েছে,

যেহেতু, সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সার্বজীন শ্রদ্ধা ও উহাদের প্রতিপালন (observance) -এর উন্নতি বর্ধন (promote) করতে নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যেহেতু, এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ঐসব অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা সাধারণ সমঝোতা (Understanding)- এর অতীব প্রয়োজন, অতএব এ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সাধারণ পরিষদ

মানবিক অধিকারের এই সার্বজনীন ঘোষণাকে সকল জনগোষ্ঠীর এবং সকল জাতির জন্য অভীষ্ট সাধারণ মান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করছে, যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণাকে সর্বদা মনে রেখে অধ্যাপনা (teaching) ও শিক্ষার মাধ্যমে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্ম-ব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলির জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূ-খন্ডের জনগণের মধ্যে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন ও কার্যকরী স্বীকৃতি ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়।

অনুচ্ছেদ : ১

সকল মানুষ স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সম-মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তাহারা বিচারবুদ্ধি (reason) ও বিবেকের অধিকারী এবং তাহাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব লইয়া পরস্পররের সহিত আচরণ করা।

অনুচ্ছেদ : ২

জাত (race), বর্ণ, লিঙ্গ (sex), ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি (origin), সম্পত্তি অথবা অন্য কোন মর্যাদার (status) ভিত্তিতে কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। তাহা ছাড়া কোন ব্যক্তির দেশ বা ভূখন্ডের রাজনৈতিক, এখতিয়ারমূলক (Jurisdictional) অথবা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা চলবে না, সেই দেশ বা ভূখন্ড স্বাধীন হোক,

Dhaka University Institutional Repository

অছিভুক্ত হোক, অস্বায়ত্বশাসিত হোক, অথবা অন্য কোন প্রকারের সীমিত সার্বভৌমত্বের অধীনই হোক।

অনুচ্ছেদ : ৩

প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসত্বে (slavery) অথবা গোলামিতে (servitude) আবদ্ধ রাখা যাবে না; এবং সকল প্রকার ক্রীতদাস-প্রথা এবং দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ : ৫

কোন ব্যক্তিকে পীড়ন, অথবা নিষ্ঠুর বা অমানুষিক বা অপমানজনক (degrading) আচরণ অথবা শাস্তির শিকার করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ৬

প্রত্যেকের সকল স্থানে আইনের সম্মুখে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৭

আইনের সম্মুখে সকলেই সমান, এবং কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, সকলেই সমভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই ঘোষণার পরিপন্থী কোনরূপ ভেদাভেদের বিরুদ্ধে এবং অনুরূপ ভেদাভেদের জন্য উত্তেজিত করণের (incitement) বিরুদ্ধে সকলেই সমান সংরক্ষণ লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ : ৮

সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করা হলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিচারালয়ের মাধ্যমে ফলপ্রসূ প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে (arbitrarily) গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১০

প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত কোন অপরাধমূলক অভিযোগ (criminal charge) -এর ক্ষেত্রে, পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য (fair) ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ : ১১

(১) কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় অপরাধের (penal offence) জন্য অভিযুক্ত করা হলে, আইন অনুসারে প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলিয়া গণ্য হওয়ার অধিকার তাঁহার থাকবে, এবং অনুরূপ বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নিশ্চয়তা (guarantee) তাঁকে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করা বা না করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ, সংঘটনকালে, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল না। অপরাধ সংঘটন কালে আইন অনুসারে অনুরূপ অপরাধের জন্য যে দণ্ড প্রযোজ্য ছিল তাহাকে উহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১২

কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা (privacy), পরিবার, গৃহ অথবা চিঠিপত্র আদান-প্রদানের (correspondence) ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এবং তাহার সম্মান ও সুনামের উপর আঘাত (attcak) করা যাবে না। অনুরূপ হস্তক্ষেপ অথবা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

(১) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাফেরা ও বসবাস করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ত্যাগ করার এবং তাহার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্যাতন-নিপীড়নের (persecution) কারণে অপর দেশের আশ্রয় (asylum) প্রার্থনা ও আশ্রয় ভোগ করার অধিকার আছে।

(২) প্রকৃত অ-রাজনৈতিক অপরাধ (non-ploitical crime) অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যাবলী ও নীতিসমূহের পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হলে, এই অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ (inboke) করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৫

(১) প্রত্যেকের জাতীয়তা লাভের অধিকার (Right to a nationality) রয়েছে।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার জাতীয়তা হতে স্বেচ্ছাচারমূলক ভাবে বঞ্চিত করা যাবে না কিংবা তাহার জাতীয়তা পরিবর্তন করার অধিকারকেও অস্বীকার করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৬

(১) জাতি, জাতীয়তা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, পূর্ণবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের যোগ্য।

(২) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌল গোষ্ঠী-একক (gorup unit), এবং উহা সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ লাভের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ : ১৭

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে এবং অন্যান্যের সহিত যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারী।

(২) কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৮

প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে; এই অধিকারের মধ্যে তাহার ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতার এবং একা বা অন্যান্যের সহিত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে শিক্ষা দান (teaching) অনুশীলন (practice), ধর্ম অনুষ্ঠান (worship) এবং পালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম এবং বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ১৯

প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকার আছে; এই অধিকারের মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণের অধিকার এবং যে কোন বাহনের মাধ্যমে ও সীমান্ত (frontiers) নির্বিশেষে, তথ্য ও ভাবধারণা (ideas) অন্বেষণ করা, গ্রহণ করা ও প্রদান করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ২০

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংজ্ঞ গঠনের স্বাধীনতার অধিকার আছে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ২১

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দেশের সরকারী কর্মে (public survice) প্রবেশের সমান অধিকার রয়েছে।

(৩) জনগণের ইচ্ছাই হল সরকারের কর্তৃত্বের (authority) ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত ব্যবধানে অনুষ্ঠিত নির্ভেজাল (genuine) নির্বাচনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হবে, এবং সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ও গোপন ভোট অথবা সমতুল্য অবাধ ভোট-পদ্ধতির মাধ্যমে অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ : ২২

প্রত্যেকে ব্যক্তি, সমাজের সদস্য হিসেবে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে, এবং তিনি জাতীয় প্রচেষ্টা অথবা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংগঠন (organisation) ও সংস্থান অনুসারে, তাঁহার মর্যাদা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অবাধ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নের অধিকারী (entitled)।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ : ২৩

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করার অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষ জনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষণ লাভের অধিকার আছে।

(২) কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

(৩) যে সব ব্যক্তি কাজ করে তাহাদের প্রত্যেকের ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে, যাতে তিনি এবং তাহার পরিবার মানবিক মর্যাদার সহিত জীবন যাপন করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে উহার পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও উহাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্রাম ও অবকাশ লাভের অধিকার রয়েছে; এর মধ্যে দৈনিক কর্ম-ঘণ্টার (working hours) যুক্তিসংগত সীমিতকরণ এবং সময়ে সময়ে সবেতন ছুটির অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ২৫

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তাঁহার পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা (social services) সহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে, এবং বেকারত্ব ,রোগ, অসামর্থ্য, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা তাহার আয়ত্তাতীত অন্য কোন কারণে জীবিকার অভাব ঘটিলে তাঁহার নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে।

(২) মাতৃত্ব (Motherhood) ও শিশুরা বিশেষ যত্ন ও সাহায্য লাভের অধিকারী। বিবাহ-বন্ধনের অধীনে অথবা বাহিরে যেভাবেই জন্মলাভ করুক না কেন, সকল শিশু সমান সামাজিক আশ্রয় ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ : ২৬

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত:পক্ষে প্রাথমিক এবং মৌলিক স্তরে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারিগরি এবং পেশাদারী (Professional) শিক্ষা সাধারণতভাবে লভ্য হবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(২) মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জোরদার করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষা সকল জাতি ও বংশভিত্তিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও মৈত্রীর উন্নতি বর্ধন করবে এবং শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের কর্মতৎপরতার অগ্রায়ন সাধন করবে ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) সন্তানদিগকে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তাহা নির্বাচন করার অগ্রাধিকার (Prior right) পিতা-মাতার থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহার সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশ গ্রহণ করার, শিল্পকলা (arts) উপভোগ করার এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও উহার সুফলের ভাগীদার হওয়ার অধিকার আছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য (Iiterary) অথবা শিল্প (artistic) কর্মের ফলে উৎপন্ন নৈতিক অথবা বস্তুগত স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৮

এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (order) লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৯

(১) কেবল সমাজের (community) মধ্যেই মানব ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ (development) সম্ভব এবং সেই সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে।

(২) কেবল অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথাযথ স্বীকৃতি এবং সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, জনশৃংখলা এবং সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনে আইনের দ্বারা যেরূপ বাধানিষেধ আরোপিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে কেবল সেরূপ বাধা-নিষেধের অধীন হবেন।

(৩) এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ কোন ক্রমেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের পরিপন্থী হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৩০

এই ঘোষণার কোন কিছুরই এমন ব্যখ্যা প্রদান করা যাবেনা যার অর্থ দাড়ায় যে, এতে বর্ণিত কোন অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার বা কোন কাজ সম্পাদন করার অধিকার রয়েছে।

সার্বজনীন ঘোষণায় ৩০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে ১৯টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে; "যেগুলো জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ভোগ করার অধিকারী।"[৬৫]

৬৫ রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি

এ চুক্তিটি ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়েছে। এ চুক্তি অনুসারে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয়তা বা সামাজিক জন্ম পরিচয়, সম্পদ, জন্ম অথবা অন্য অবস্থান-সকল পার্থক্য নির্বিশেষে মানুষের সকল অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ হচ্ছে

(১) ব্যক্তির জীবন যাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩)

(২) দাসত্ব থেকে মুক্তি (অনুচ্ছেদ ৪)

(৩) নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরন বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি (অনুচ্ছেদ ৫)

(৪) আইনগত দিক থেকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৬)

(৫) আইনগত সম নিরাপত্তা (অনুচ্ছেদ ৭)

(৬) মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর আইনগত প্রতিকার (অনুচ্ছেদ ৮)

(৭) জবরদস্তিমূলক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন থেকে মুক্তি (অনুচ্ছেদ ৯)

(৮) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায়বিচার ও প্রকাশ্য শুনানী (অনুচ্ছেদ ১০)

(৯) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসগৃহ বা চিঠিপত্র আদান প্রদান করার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে অব্যহতি (অনুচ্ছেদ ১২)

(১০) চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৩)

(১১) রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪)

(১২) জাতিসত্ত্বা/ জাতীয়তা লাভের অধিকার(অনুচ্ছেদ ১৫)

(১৩) বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৬)

(১৪) সম্পত্তির মালিকানা (অনুচ্ছেদ ১৭)

(১৫) চিন্তা, বিবেক ও ধর্মচারনের স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৮)

(১৬) মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৯)

(১৭) শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২০)

(১৮) সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ [অনুচ্ছেদ ২১ (ক)]

(১৯) সরকারী চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার [অনুচ্ছেদ ২১ (খ)]

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি

১৯৬৬ সালে গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ৬-১৫ অনুচ্চেদে ১৯৪৮ সালেন সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২২-২৭ অনুচ্চেদে বর্ণিত অধিকারহগুলিকে আইনগত রূপদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ

(১) সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২২)

(২) কাজকর্ম করার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৩)

(৩) বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার (অনচ্ছেদ ২৪)

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত ও কল্যাণকর জীবনযাপনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৫)

(৫) শিক্ষালাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬)

(৬) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৭)

প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা এ অধিকারগুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। বলা হয়, "সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক আইন পর্যায়ে মানবাধিকারের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়েছে।"[৬৬] এই ঘোষণাটি সম্ভবত জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সাফল্য, বলেছেন মণীষী গুডরিচ।[৬৭] কারণ UDHR গ্রহণ করার পর মাত্র দুই বছরের মধ্যে জাতিসংঘ এই ঘোষণার ব্যপ্তি সম্পর্কে Capitalist ও Socialist ব্লকের মধ্যে বিরাজমান মতভেদের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হয়।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এমন একটি আন্তর্জাতিক দলিল যা প্রথম বারের মত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা বলেছে। ঘোষণার অধিকারসমূহ পাঠে এই প্রত্যয় জন্মে যে, UDHR প্রণীত ও গৃহিত হয়েছিল সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের দেয়া এই বক্তব্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য "We have good reason to expect the framing of an international bill of rights, acceptable to all the nations involved ...... The Charter is dedicated to the achievement and observance of human rights and fundamental freedoms. Unless we can attain those obectives for all men and women everywere- without regard to race, Lnaguage or religion-we cannot have permanent peace and security.[৬৮]

জাতিসংঘ সনদে বিভিন্ন দফায় স্বর্ণালী আঁশের মত[৬৯] 'মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা' বিষয়ক যে বিধানগুলো জড়িয়ে আছে সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যই মূলত UDHR প্রণীত হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটিকে বলা যায় জাতিসংঘ সনদের ঐসব অধিকার ও স্বাধীনতার "Patonic Exression"। কারণ জাতিসংঘ সনদে শুধুমাত্র অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্য থাকবে এবং এগুলোকে বাস্তবায়িত করা হবে। কিন্তু

---

৬৬ Dr.M.Ershadul Bari, *International Concern for the Promotion and Protection of Human Rights*(Dhaka : Dhaka University Studies, 1991), p.4

৬৭ Goodrich.L.M, *The United Nations*(New york : 1959), p.324

৬৮ Quoted by A. H. Robertson, *Human Rights in the world*(1st Edition, 1972), p.25. উদ্ধৃত : রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৬৯ Lauterpacht, *Human Rights and the Charter of United Nations Report,* উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাতে মানবাধিকারের কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি কিংবা কোনগুলি মানবাধিকার তাও চিহ্নিত করা হয়নি। এই চিহ্নিত করণের কাজটি সম্পাদন করেছে UDHR । মূলতঃ এই ঘোষণা জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে এবং জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে সনদের ১ (৩) অনুচ্ছেদে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য, সর্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিটি দফা প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত UDHR এর আইনগত যথার্থতা নির্ভর করছে UN Chatrer এর উপর। UDHR যেসব অধিকার ধারণ করছে সেগুলো দেশীয় আইনে বা Positive Law-এর অধীনে ব্যক্তিগত কোন অধিকার নয়। বরং সদস্য-রাষ্ট্রগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কি কর্মসূচী গ্রহণ করবে তার একটি আলোকবর্তিকা।

"সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা প্রণয়নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ফ্রান্সের Rene Cassin-এর মতে ঘোষণাটি হচ্ছে জাতিসংঘ 'সনদের নির্ভরযোগ্য ও কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা' (an authoritative interpretation of the Charter)। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন মিসেস এলিয়েনর রুজভেল্ট UDHR কে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের Magna Carta বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[৭০] UDHR সম্পর্কে জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ কার্যালয়ের মহাপরিচালক Jan Martenosn এর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হলো ঃ "The declaration is nothing less than a monument to humankind, a veritable Magna Carta enumerating specific standards of achivement in the civil, political, economic, social and cultural fields that had never been attempted before and which are valid for all members of the human family." [৭১]

বস্তুত মানবাধিকারের ঘোষণাটি একটি 'মহৎ কর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে পৃথিবীময়। এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ সনদ ছাড়া UDHR এর মত আর কোন আন্তর্জাতিক দলিল এত বেশী স্বীকৃতি পায়নি।

মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব (Influence of the UDHR) :

বিশ্বের অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলিলের তুলনায় মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব গভীর এবং স্থায়ী। ১৯৪৮ সালে গৃহিত হওয়ার পর থেকে ঘোষণাটি সর্বকালের সার্বিক পরিচিত এবং প্রভাবশালী দলিলসমূহের একটিতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ক) UDHR এর আন্তর্জাতিক প্রভাব (International Influence) : ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার ঘোষণা গৃহিত হবার পর জাতিসংঘ পরবর্তীতে যেসব ঘোষণা ও সুপারিশ গ্রহণ করেছে সেগুলোতে জাতিসংঘ সনদের মতই গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখিত হয়েছে মানবাধিকার ঘোষণাটি।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব নিম্নে প্রদান করা হল :

---

৭০ G.A.Official Records, 3rd Session pt. 1 (1948), p. 961. উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

৭১ Jan Martenson, *Intorduction, Bulletin of Human Rights,* Special Issue (New York : 1988), p. 1

Dhaka University Institutional Repository

১. ‘কলোনী দেশসমূহ ও তাদের জনগণকে স্বাধীনতা প্রদান ঘোষণা’ ১৯৬০ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক হয়।[৭২] এর সপ্তম ও সর্বশেষ প্যারায় বলা হয় “all states shall observe faithfully and strictly, the provisions of .... the Universa; Decaratopm of Human Rights." [৭৩]

২. সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ ঘোষণা (The Declaration on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয় ২০ শে নভেম্বর ১৯৬৩। এর ১১ অনুচ্ছেদে রয়েছে "every state shall promote respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter of the United nations and shall fully and faithfully observe the provisions of.......... Universal Declaration of Human Rights. [৭৪]

৩. নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৩ সালের ৪ ডিসেম্বর একটি রেজুলেশন গ্রহণ করে যাতে বলা হয়, ‘জাতিবিদ্বেষ’ (apartheid) হলো দক্ষিণ আফ্রিকার “জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে দায়িত্বের” এবং UDHR এর লংঘন।

৪. বর্তমান নামিবিয়া (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) শাসন করার যে অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার ছিল সেই ম্যান্ডেটকে সাধারণ পরিষদ ১৯৬৬ সালের ২৭শে অক্টোবর নষ্ট করে দেয়; কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকান্ড ছিল উক্ত ম্যান্ডেট, জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকার ঘোষণার পরিপন্থী।

৫. সাধারণ পরিষদ ১৯৬৮’র ১৯শে ডিসেম্বর যে “তেহরান ঘোষণা” কে সমর্থন দেয় তার অনুচ্ছেদ ২ মতে UDHR আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে।

৬. হেলসিংকি সম্মেলন (Helsinki conference on Security and Co-operation in Europe of 1975) এর ৭ নং বলা হয়েছে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো UN Charter ও UDHR এর উদ্দেশ্য ও নীতি অনুযায়ী কাজ করবে।

উল্লেখ্য, “UDHR গৃহিত হবার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্য (২৫ এপ্রিল, ১৯৪৯) জাতিসংঘ একটি চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় যাতে বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে নীতিগুলো বিবাহিত স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর দেশে যেতে বাধা দেয় সেগুলো UN Charter এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং ঐ সিদ্ধান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আহ্বান

---

৭২ এই ঘোষণাটি গৃহিত হয় G.A. Resolution 1514 (xv) of 14 December 1960 দ্বারা। উপস্থিত সকল (৮৯টি) রাষ্ট্র এর পক্ষে ভোট দেয় ৯টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা এতে ভোট দেয়নি A.B. Kalaiyah, op cit. P. 63. উদ্ধৃত : রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৭৩ Brownlie, *Basic Documents on Human Rights,* 1^{st} ed. (1981), p. 30

৭৪ GA Resolution 1904 (xv111) of 20th Nov. 1963. উদ্ধৃত : পাগুক্ত, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

জানানো হয় এসব নীতি প্রত্যাহার করতে। বলা বাহুল্য, এখানে UN Charter এর মাধ্যমে মূলতঃ UDHR এর অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৬ কে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ ১৩ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশ ছেড়ে যাবার অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ১৬ বিবাহ করার ও পরিবার গঠনের অধিকার নিশ্চিত করেছে।"[৭৫]

তাছাড়া ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যে দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ঐচ্ছিক সহদলিল (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি এবং তার ঐচ্ছিক সহদলিল) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় সেগুলো প্রধানতঃ UDHR এর অধিকারগুলোকে ধারণ করে।

এ প্রসঙ্গে এম. এরশাদুল বারী বলেন,"বেশ কয়েকবার (উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৯, ১৯৫২, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে) নেয়া সিদ্ধান্তে সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাকে "অর্জনের সাধারণ মান" হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পালন এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান সম্বলিত সিদ্ধান্তে উক্ত ঘোষণাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।"[৭৬]

খ) UDHR এর আঞ্চলিক প্রভাব (Regional Influence) : ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন আঞ্চলিক দলিলে মানবাধিকার ঘোষণা মর্যাদাপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন,"ইউরোপীয় কাউন্সিলে ১৯৫০ সালের ৪ নভেম্বর যে ইউরোপীয় কনভেনশন (মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত) রোমে গৃহিত হয় তার অধিকাংশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক বিধান UDHR থেকে নেয়া। এর প্রস্তাবনা ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে UDHR এর কথা বলা হয়েছে।"[৭৭]

মানবাধিকার সংক্রান্ত আমেরিকার কনভেনশন (২২ শে নভেম্বর ১৯৭৮)- এর মুখবন্ধে UDHR উল্লেখিত হয়েছে। এতে দেয়া নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো UDHR থেকে নেয়া। আবার মানবাধিকার চুক্তিসমূহের মধ্যে সর্বশেষ "মানুষ এবং জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আফ্রিকীয় সনদে", যা আফ্রিকান ঐক্য সংগঠন কর্তৃক ১৯৮১ সালের ২৬ জুন গৃহীত হয়, বর্ণিত নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের তালিকাও মূলত UDHR থেকে নেয়া হয়েছে।[৭৮] ১৯৫৪ সালের আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের 'কারাকাস সম্মেলন এবং ১৯৫৫ সারের এশিয়া আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের বান্দুক সম্মেলনে[৭৯] মানবাধিকার ঘোষণার আশ্রয় নেয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, Special Statute for the free City of trieste

---

৭৫ Dr. B.G. Ramcharan (ed) Human Rights : Thirty Years After the Universal Declaration, op. cit. p. 34.

৭৬ এম এরশাদুল বারী, *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা*(ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, জুন ১৯৯২), পৃ. ৫

৭৭ প্রাগুক্ত।

৭৮ প্রাগুক্ত।

৭৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(1954)[৮০] এবং Franco- Tunisian Convention (1955) তাদের স্যাবস্ট্যান্টিভ ল'এর অংশ হিসেবে পুরো UDHR কে বিধিবদ্ধ করেছে।[৮১]

গ) রাষ্ট্রীয় সংবিধান UDHR এর প্রভাব (National Influence) : সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হবার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানে UDHR এ বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছে। যেমন–ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জ্যামাইকা, উগান্ডা, কেনিয়া, সাইপ্রাস, মাল্টা, গিনি প্রজাতন্ত্র, আইভরিকোস্ট, ডাহোমী, গ্যাবন, মাদাগাস্কার, সেনেগাল, মালি এবং সোমালিয়া। "কোন কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে বিশেষভাবে উল্লেখিত না হলেও কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে মানবাধিকার ঘোষণার। যেমন– ফ্রান্স, সংযুক্ত জার্মানী প্রজাতন্ত্র, লিবিয়া, ইরিত্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, এল-সালভাদর, কোস্টারিকা, সিরিয়া, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, চাঁদ, সুদান, টোগো এবং আপার ভোল্টা।"[৮২] এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ (১৯৬৮) উপলক্ষে ইরানের রাজধানী তেহরানে ৮৪টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট বলেন যে, "সর্বজনীন ঘোষণা গ্রহণ করেছে এমন সংবিধানের সংখ্যা (তখন পর্যন্ত) তেতাল্লিশের কম নয়" এবং "that examples of legislation expressly quotiong or reproducing provisions of the Declaration can be found in all Continents". [৮৩]

কতগুলো দেশের সংবিধানে UDHR এর নীতিসমূহের প্রতি গভীর অনুরক্তি ও আনুগত্য ঘোষিত হয়েছে,[৮৪] এমনকি কিছু রাষ্ট্রের সংবিধানে উক্ত ঘোষণায় উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার এবং নিশ্চয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন রুয়ান্ডা (১৯৬২) এবং ইকুয়েটারিয়াল আফ্রিকা (১৯৬৮)।[৮৫]

জাতিগত বৈষম্য উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রণীত মিউনিসিপ্যাল ল' এবং ডিক্রীতে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বর্ণিত সাম্য ও অবৈষম্য নীতি উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে বলিভিয়ায় জারীকৃত একটি 'লেজিসলেটিভ' ডিক্রীর প্রস্তাবনায় কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল বলিভিয়ানের জন্য সমান সুযোগ নীতির সমর্থনে পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে, জাতীয় শিক্ষা সর্বজনীন মানবধিকার ঘোষনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। অনুরূপভাবে বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য পানামায় ১৯৫৬ সালে বিধিবদ্ধকৃত একটি আইনে বলা হয়, "জাতি বা বর্ণের কারণে বৈষম্য করা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সুস্পষ্ট লংঘন।"[৮৬]

---

৮০ Egon Schwelb, *The Trieste Settlement and Human rights*, 49 AJIL (1955), p.240

৮১ Year Book on Human Rights 1954, p.340

৮২ Myres S. Mc Dougal and Gerhard Bebr, Human Right in the United Nations, 58 AJIL (1964), p. 639

৮৩ Robertson. A.H. Human Rights in the World, (1972) p. 27

৮৪ যেমন, গিনি (১৯৫৮), মাদাগাস্কার (১৯৫৯), আইভোরি কোস্ট, মালি (১৯৬০), মৌরিতানিয়া (১৯৬১), আলজেরিয়া, কঙ্গোঁ প্রজাতন্ত্র, সেনেগাল ও টোগো, জায়ার (১৯৬৭), আপার ভোল্টা এবং ক্যামেরুন (১৯৭২)

৮৫ এম.এরশাদুল বারী, *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮৬ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান মানবধিকার ঘোষণা দ্বারা এভাবে প্রভাবিত হওয়ায় ডক্টর আমবেদকারের (Dr. Ambedkar) নিম্লোক্ত মন্তব্য যথাযথ প্রমাণিত হয়েছে, "The Declaration of the Rights of Man ..... has become part and parcel of our mental make up .... these priciples have become the silent immaculate premise of our outlook," [৮৭]

এ "ঘোষণার" প্রভাবকে এখন আর এড়িয়ে যাবার কোন পথ নেই। কারণ M.C. Chagla'র ভাষায় এই ঘোষণা হলো "........ like a brave banner flying from the highest tower in the world which no one can ignore." [৮৮]

বস্তুত ঘোষণাটি মানবাধিকারের ব্যাপারে সাধারণ মানদন্ড, স্থায়ী ও সার্বজনীন Point of reference এবং কেন্দ্রীয় দলিলে পরিণত হয়েছে। Gerard J.Mangone এর ভাষায়ঃ The stadrads of the Universal Declaration of Human Rights have become a guiding star to international jurisprudence and the high tone of its exhoutation continues to influence national policies and their legal applications"[৮৯]

তবে মানবাধিকার ঘোষণা সম্পর্কে খুব যথাযথ মন্তব্য করেছেন, L.B. Sohn: "In a relatively short time the Universal Declaration of Human Rights has thus become a part of the constitutional law of the world commnuity; and togeher with the charter of the United Nations, it has achieved the Character of a World law, superior to all other international instruments and domestic laws." [৯০]

অন্যান্য চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের ধারণা

গণহত্যা নিরোধ, গণহত্যার অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত কনভেসশন

১৯৪৯ সালের গণহত্যা নিরোধ, ঘণহত্যার অপরাধে শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশন আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ এই দলিল দ্বারা আন্তর্জাতিক আইনে গণহত্যাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অপরাধগুলো হচ্ছে-

---

৮৭ Nani Palkivala, We the Pepole, (1948), p. 200

৮৮ Chagla, M. C. *The Individual and the State*, p.10

৮৯ এম.এরশাদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯০ Sohn L.B., *TheUniversal Declaration of Human Rights : A Common Standard of Achievement,* Journal of the International commision of Jurists, 8 (1967) Part. 2, p. 17-26

Dhaka University Institutional Repository

১. কোন জাতীয় অথবা কোন গোত্রীয় কোন বর্ণ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন সদস্যকে হত্যা করা।
২. ঐ সকল সম্প্রদায়ের কোন সদস্যকে মারিরক বা মানুষিকভাবে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করা।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ সম্প্রদায়ের উপর এমন ধরনের জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাতে ঐসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে শারীরিক ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে।
৪. এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মের হার নিভৃত করা।
৫. ঐ সম্প্রদায়ের থেকে অন্য সম্প্রদায়ের থেকে অন্য সম্প্রদায়ের জোরপূর্বক সন্তানাদি হস্তান্তর কর।

সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন

১৯৬৫ সালের এই আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা বর্ণ বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বৈষম্যগুলিতে যে কোন ধরনের পার্থক্য, দূরীকরণ, প্রতিবন্ধকতা অথবা অগ্রাধিকারকে বুঝায় যা বর্ণ, গোত্র, জন্ম অথবা জাতীয় ও গোত্রিয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।
কনভেনশনের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর আইনানুগ দায়িত্ব হলো নিজে রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বর্ণ বৈষম্য দূর করা এবং বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা।

জাতি বিদ্বেষমূলক অপরাধ দমন এবং শাস্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন

১৯৭৩ সালের এই আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা জাতি বিদ্বেষমূলক অপরাধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতি বিদ্বেষমূলক অপরাধ বলতে এক বর্ণের সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধন্য বিস্তারকে বুঝায় যার দ্বারা দূর্বল সম্প্রদায়ের কোন সদস্যকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে অস্বীকার করা হয় অথবা ঐ সম্প্রদায়ের উপর এমন জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে তাদের শারীরিক বা দৈহিকভাবে মৃত্যু ঘটে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের ধারণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রণীত চুক্তিসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

Table of Instruments

S.L No	Instruments	Years
1	Chartar of Madina -	622
2	Magna Carta	1215
3	Declaration of Arbroath Scotland	1320
4	Habeas Corpus Act	1640
5	Habeas Corpus Act	1679

Dhaka University Institutional Repository

6	Bill of Rights.	1688
7	United States Declaration of Independence	1776
8	Frence Declaration of the Human rights	1789
9	Congress of Vienna	1815
10	Lieber Code	1863
11	Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the wounder in armiesith Field	1864
12	Treaty of Berlin	1878
13	International Agreement for the Supperssion of the white Salve Trade	1904
14	Covenant for the League of Nations	1919
15	International Labour Organization Convention	1921
16	Declaration on the Rights of the Child	1924
17	Locarno Treaty	1925
18	Slavery Convention	1926
19	Kellog brind Pact (The General Treaty for the Renunciation of war /Modern Law of war)	1928
20	Geneva Conventionretaining to the Treatment of prisoners of war	1929
21	Covention No 29 concerning Forced labour	1930
22	International Convention for the Supperssion of the Traffic in women of full age	1933
23	International Labour Organization convention Hours of works (Industry)	1935
24	International Labour organization Convention No 05 on Indigenous woarker	1936
25	Declaration of Philadelphia	1944
26	Alexandria protocol establishing the League of Arab States	1945

Dhaka University Institutional Repository

27	Charter of rhe United Nations, Nuremberg charter of International Military Tribunal for the Ware criminals	
28	American Declaration on the Rights and Duties of man (a) Convention No 88 Concerning the Organization of the Employment Servises (b) Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide (c) Inter American Convention on the Granting of Civil Rights to women (d) InterAmerican Convention on the Granting of the Political Rights of women (e) Universal Declaration of Human Rights.	1948
29	European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms	1950
30	Geneva Convention relating of the Statuse of Refugess	1951
31	Convention on the International Rights of correction	1952
32	Caracas Convention on Territorial Asylum	1954
33	United Nation Standard Minimum rule for the treatment of prisoners	1995
34	Supplementery Convention on the Abolition of Stavery	1956
35	International Labour Organization convention on 106 regulation working house and priods at sea	1957
36	Convention concerning Discrimination in respect of Enployment and occupation	1958
37	Declaration of the rights of the child. • Europian Agreement on the Abolition of vissa for refugees	1959
38	Conventio against Discrimination in Education	1960
39	Connection on the reduction of statelessness European Social charter Vienna Convention Diplomatic Rights	1961
40	United Nations Convention cinsant to marriage Minimum Age for Marrige and Registration for marrige	1962

Dhaka University Institutional Repository

41	Declaration on the Elimination of all forms of racial discrimination • Viena convention on consutar Relations	1963
42	International Convention on Civil and polical Rights	**1966**
43	International Convention on Economic, Social and Cultural Rights	
44	International Convention of the Elimination of act forms of Racial Discrimination	
45	Declaration on the Elimination of Discrimination Against Womens	1967
46	United Nations Declaration on Territorial Asylum	
47	American Convention on Human Rights	1969
48	Alascan Native Settelment Claim Act	1971
49	International Labour Organization Convention no 138 on minimum Age	1973
51	United Nations Declaation of the protection of all presons from being subject to torture and others cruel inhuman or Degrating Treatment or punishment	1975
52	Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against women 1979 * OAU, Dectaration on the rights and welfare of the African child.	1979
53	Europian Agreement on Transfer of responsibility for refugees *Hugue Convention of the civil aspects of the International child	1980
54	African charter on Human and people's Rights (a) Declaration on the elimination of all forms of Intolarance and of Discrimination based on religion or	1981

Dhaka University Institutional Repository

	belief (b)ILO Convention no 155 on occupation sefty and Health	
55	ILO Convention on 158 on Terminition of Employment at the Initiatives of the employer	1982
56	Cartagene Dectration on refuges *Convention against Torture and Others Cruel Inhuman or Degrading treatment or Punishment	1984
57	Declaration on the Human Rights of Individual who are not Nationals of yhem country in which They live. *Inter-American Convention to prevention to prevent and punish torture	1985
58	UN General Assembly resolution Guidelines for developing Human Rights	1986
57	Europian Convention for the prevention or Tourture and inhuman or Degrading Treatment or Punishment	1987
59	Additional Protocol American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (protocol of SanSalvador)	
60	Diclaration on Layoul of the workplace. (a) Fremwark Derective on the prevention of Occupational risk (b) International Labour Organization Convention No 169 on Indigenous and Tribal people. (c) UN Convention on the rights of the child	1989
61	African Charter on the rights a nd welfare of the child (a) Charter of Paris (b) Dulbin convention	1990

Dhaka University Institutional Repository

	(c) International Covantion on the on the protection of the Rights of all Migrant warkers and members of their Families. (d) Protocal to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penelty	
62	Declaration on the protection of all personse from enfourced Disappearences (a) Declaration on the rights of personse belonging to National or Ethinic , Religion and linguistic Monoroties (b) European Charter for Regional and Minority Languge (c) United Nations framewaek Convention on Climate Change (d) Rio conference of the Envinorment and Development	1992
63	Declaration on the Elimination of Violance Against women Native Title Act	1993
64	Viena Declaration and protection of action	1993
65	Arab Charter on Human Rights (a) Inter – American Convention on the Forced Disappearance of personce (b) Inter-American Convention the Prevention punishment and Eradication of Violance against Women (Convention of Belem topara)	1994
66	Children (Scotland) Act (a) Commonwealth of Independent and Fundamental	1995

Dhaka University Institutional Repository

	Freedoms (b) Farmewarks Convention for national Minorities	
67	EC Directive 96/34 on Prental Leave European Convention on the Exercise of Children's Rights	1996
68	Convention on Human Rights And Biomedicine * EC Directive 98/24 on Chemical agent Human Rights Act Statute of the International Criminal Cort.	1997
69	Inter-American Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against presons with Disabilities * Vienna International Conference on Combating child Pronograophy on the Internet	1999
70	Optional protocol to the Convention the rights of Child on the on the Involvement of Children in armed conflict. * Opttional Protocal to the convention on the rights of the child on the Salte of children child protection and Child pornegraphy	2000
71	Inter-America Democratic Charter	2001
72	Directive 2003/880 Working time * United Nation's International Convention on the rights of all Migrant Workers and Members of their Families * Protocol to the Aftican Charter on Human and Peoples Rights on the Rights of Women in africa	2003
73	General Assembly Resolution 60/166 condemmining Islamophobia , Anti-semities and Christianiophobia	2005
74	International Conventionn for the Protection of all persons from enforced disappearances Act. 2006	2006
75	Charter Of the Association of south east Asia Nation	2007

Dhaka University Institutional Repository

	* Lisbon Treaty on European union (TEU) * Lisbon Treaty on functioning of the European Union (TFEU) Protocal	
76	Convention on enforced disappearances Convention on the Rights of persons with disabilities	2008
77	African Union Convention for the protection and assistance of intervally displaced Persons in Africa	2009

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণীসমূহে মানবাধিকার চেতনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণসমূহে মানবাধিকারের চেতনা

- **তবুকের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকার**
- **বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকার**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রণীত চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা

- **হিলফুল ফুযুল চুক্তি : মানবাধিকার**
- **মদিনার সনদ : মানবাধিকার**
- **হুদায়বিয়ার সন্ধি : মানবাধিকার**
- **অন্যান্য চুক্তিসমূহ : মানবাধিকার**

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণীসমূহে মানবাধিকার চেতনা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব মানবতার কল্যাণে, অধিকার প্রদান ও আদায়ের জন্য অনেক মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন, এর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ কিছু বাণী আমরা আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি যে গুলো সরাসরি মানবধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং মানবাধিকার চেতনায় উদ্ভাসিত।

১. ' عن عبد الله بن عمر وان النبى صلى الله عليه و سلم قا زوال الد نيا اهون على الله من قتل رجل مسلمٍ 'আল্লাহর কাছে একজন মুমিনকে হত্যা করার চাইতে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ।'[১] আলোচ্য বাণীতে মানবজীবনের নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব জীবনের নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

২. عن ابى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال كل المسلم غلى المسلم حرام دمه و ماله و **عرضه** 'আবূ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জান, মাল ও মান সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম।'[২]

৩. ابا سعيد الجدرى و ابا هر يرة يذكران عن رسول الله ص . قال لوأن اهل السماء واهل الارض استر كوا فى دم مومن لا كبهم الله فى النار 'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ও আবূ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[৩]

৪. ان فضالة بن عبيدٍ حدّثه انّ النبي ص. قال المومن من أمنه الناس على اموالهم و انفسهم 'ফুযালাহ ইব্‌নে উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন : মু'মিন সেই ব্যক্তি যার হাতে লোকদের জানমাল নিরাপদে থাকে ।'[৪]

৫. الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار 'যে গলা ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামেও নিজের গলায় ফাঁস লাগাবে। আর যে নিজেকে বর্শার আঘাতে আক্রান্ত করল সেও জাহান্নামে নিজেকে বর্শার আঘাতে আক্রান্ত করবে।'[৫]

৬. 'যে লোক আমাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করবে (বা সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে) সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।'[৬]

---

১ আবূ ঈসা আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী (র), সম্পাদনা পরষদ, *সুনানে তিরমিযী*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২ খ্রি.), বাব মা জাআ ফি তাশদিদ ক্বাতলি মু'মিন, হাদিস নং ১৩৯৯

২ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্‌বীনী (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,৩খ.মার্চ ২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ফিতান, বাব হুরমাতে দামিল মু'মিন ওয়াল মালিহি, হাদিস নং ৩৯৩৩, পৃ. ৪৫৮

৩ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাব : আল হুকমু ফি দ্দাম, হাদিস নং ১৪০২.

৪ ইবনু মাজাহ্, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, বাব : হুরমাতে দামিল মু'মিন ওয়াল মালিহি, হাদিস নং ৩৯৩৪

৫ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী. সম্পাদনা : ড. মুস্তাফা আদীব আল-বাগা, *আস-সহীহ*(বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর আল-ইয়ামামাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ ইং), বাবু মা জা'আ ফী কাতিলিন্নাফসি,হাদীস নং ১২৭৬ ; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.), *ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,মগবাজার, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./ ২০০২ খৃ.), পৃ. ৪২

৬ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৭. 'যে লোক তীর, বর্শা, বল্লম, মারণাস্ত্র নিয়ে আমাদের মসজিদ কিংবা আমাদের হাটে-বাজারে যাতায়াত করবে, সে যেন তার অগ্রভাগ সামলিয়ে রাখে; অথবা বলেছেন, সে যেন তার দস্তানা ধরে থাকে, যেন তা থেকে কোন মুসলিমের গায়ে একবিন্দু আঘাত না লাগে।[৭]

বস্তুত রাসূলের এই সব মহামূল্য বাণী মানুষকে অকারণে হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে।

আলোচ্য [২ নং হতে ৮ নং] বাণীতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৮. 'যে জ্ঞান অর্জনের পথ ধরল, সে জান্নাতেরই পথ ধরল।'[৮]

৯. দোলনা থেকে কবর পযন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর।

১০. 'জ্ঞান অর্জন কর যদি এজন্য সুদূর চীনে পর্যন্ত যেতে হয়।'[৯]

১১. طلب العلم فريضة على كل مسلم " 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।'[১০]

১২. 'তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কুরান শিক্ষা করে এং শিক্ষা দেয়।'[১১]

এখানে [৯ নং হতে ১৩ নং] বাণীতে শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম জ্ঞানার্জনের জন্য নারীকে শুধু অধিকারই দেয়নি রীতিমত তা ফরয করে দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে পুরুষ থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি।

১৩. 'পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে রিযক তালাশ কর। আল্লাহ ভাল কাজকে পছন্দ করেন এবং মন্দ কাজকে অপছন্দ করেন।'[১২] আলোচ্য বাণীতে বেঁচে থাকা এবং জীবিকা অর্জনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১৪. 'শ্রমিককের পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই আদায় করে দাও।'[১৩]

১৫. হালাল উপার্জন ফরযসমূহের মধ্যে একটি ফরয।'[১৪]

এখানে [১৫ নং ও ১৬ নং] বাণীতে ন্যায্য পারিশ্রমিক লাভের অধিকারের ও স্বাধীনতা ও নিরাপত্তর অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১৬. صل من قطعك ، وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك

'যে তোমার সাথে সর্ম্পকচ্ছেদ করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দাও। যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে তুমি দান কর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করে

---

৭ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, বাব ফাদলি তলবিল ইলমি, হাদীম নং ২৫৭০

৮ আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবূ দাউদ*(বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.),বাবুল হাসসি 'আলা তলবিল ইলমি,হাদীস নং ৩১৫৭

৯ আবূ বকর আহমদ ইব্ন আল-হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ১ম সংস্করণ- ১৯৯১ খ্রি.), হাদীস নং ১৬১২

১০ ইবনু মাজাহ্, প্রাগুক্ত, বাবু ফাদলিল 'উলামাই ওয়াল হাসসি 'আলা তলবিল ইলমি, হাদীস নং ২২০

১১ বুখারী, বাবু খাইরুকুম মান তা'আল্লামাল কুর'আনা ওয়া 'আল্লামাহু,হাদীস নং ৪৬৪০

১২ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, বাব উতলুবুল ইলমা মিন খাবায়াল আরদি,হাদীস নং ১২৩০

১৩ ইবনু মাজাহ্, প্রাগুক্ত,বাবু আজরিল উজারাই, হাদীস নং ২৪৩৪

১৪ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, বাব আস-সিত্তুনা মিন শু'আবিল ঈমানি, হাদীস নং ৮৪৮২

Dhaka University Institutional Repository

দাও।'[১৫]

১৭. 'তুমি যদি আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান প্রত্যাশা কর তাহলে তোমর পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সাথে ভালো ব্যবহার কর।'[১৬]

১৮. 'যে ছোটদের প্রতি দয়া করেনা এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না সে আমাদের মধ্যে নয়।'[১৭]

এখানে [১৭ নং হতে ১৯নং] বাণীতে সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১৯.'দাসকে মুক্ত কর, ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শোন, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং রোগীর সেবা কর।'[১৮]

২০.'যে মানুষের উপকার করে, সেই শ্রেষ্ঠতম।'[১৯]

এখানে [১৭ নং হতে ২১ নং] বাণীতে দাসত্বে থেকে মুক্তি লাভের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২১.'ন্যায় বিচারকের একদিন ষাট বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।'[২০] এখানে ন্যায় বিচার লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২২. 'সে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'[২১] এখানেও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২৩. ' কিয়ামতের দিন বলা হবে, আজ তোমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হবে যেমনটি তুমি অন্যকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে।'[২২] এখানে মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২৪. مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।[২৩] এখানে সম্পত্তির মালিকানা লাভের কথা বলা হয়েছে।

২৫. 'যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেনা।'[২৪]

২৬. 'আল্লাহ তা'আলা তার দয়াশীল বান্দাদের প্রতিই কৃপা করেন। যারা পৃথিবীতে আছে, তোমরা তাদের প্রতি কৃপা করো যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন।[২৫]" এখানে [২৬ নং হতে ২৭ নং] বাণীতে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের

---

১৫ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, ফসলুন ফিততাজাউযি ওয়াল 'অফভি ওয়া তারকিল মুকাফাতি, হাদীস নং৭৮৫৩

১৬ মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*(বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, স. বি. তা. বি.), বাবু বিররিল ওয়ালিদাইনি ওয়া আয়্যুহুমা আহাক্কু বিহি, হাদীস নং ৪৬২৪

১৭ আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবুন ফিররাহমাতি, হাদীস নং ৪২৯২

১৮ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু উজুবি 'ইয়াদাতিল মারীযি, হাদীস নং ৫২১৭

১৯ আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনী, *আল মুসান্নাফ*(বৈরুত : আল মাকতাব আল মাকতাব আল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), হাদীস নং ২০০২৫

২০ আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী, *আল মু'জামুল আওসাত*(কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.),বাবু মান ইসমুহু আবদুররহমান, হাদীস নং ৪৯২১

২১ মুসলিম ,প্রাগুক্ত, বাবু বয়ানি তাহরীমি ইযাই জারিন, হাদীস নং ৬৬

২২ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, ফসলুন ফীমা ওয়ারাদা মিনাল ইখবারি ফিততাশদীদি মান ইয়াসখার ন্নাসা,হাদীস নং ৬৪৮২

২৩ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাব মান কুতিলা দুনা মালিহি, হাদীস নং ২৩০০

২৪ তিরমিযী, বাবু মা জা'আ ফী রাহমাতিন্নাসি, হাদীস নং ১৮৪৫

২৫ আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু ফিররাহমাতি,হাদীস নং ৪২৯০

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন অবস্থায় অন্যের উপর কৃপা করা ওয়াজিব, যেমন ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো, দুর্বলকে সাহায্য করা, ধ্বংসের মধ্যে নিপতিতকে উদ্ধার করা, বিপন্নদের ফরিয়াদ শোনা, কষ্টে নিপতিতদের কষ্ট দূর করা, ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো ও আল্লাহর শোকাতুরকে সান্তনা দান। এই সব অবস্থায় যে আল্লাহর হক আদায় করে না আল্লাহ তার সাথে কঠোর ব্যবহার করেন এবং তাকে আপন রহমত থেকে বঞ্চিত করেন।

২৭. রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কেউ কারো উপর জুলুম করবে না, অপমান করবে না হেয় পতিপন্ন করবে না। তাকওয়া হল এই খানে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন বার তাঁর সীনার দিকে ইঙ্গিত করেন, কোন ব্যাক্তির পক্ষে খুবই মন্দকাজ হল কোন মুসলিমভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত সম্পদও সম্মান হারাম।'[২৬]এখানে মর্যাদা ও জীবনের নিরাপত্তালাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২৮. 'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক) কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুলবশত ক্ষমা করে দেয়া ভুলবশত শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম'।[২৭]

২৯. 'বাঁচানোর কোন পথ পাওয়া গেলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও'।[২৮] এখানে [৩০ হতে ৩১ নং] বাণীতে নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগে বাধ্য না হওয়ার অধিকার লাভের কথা বলা হয়েছে।

৩০. রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে অপরের কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় এবং তার অকল্যন থেকে মানুষ নিরাপদ আর তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে কারো কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় না এবং তার ক্ষতি থেকে মানুষ নিরাপদ নয়।[২৯]

৩১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই কোন মুসলিম অপর মুসলিমের উপর জুলুম করবে না এবং বিপদেও ছেড়ে দিবে না যে ব্যক্তি কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ কওে আল্লাহ তার প্রয়োজন

২৬ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবু তাহরীমি যুলমিল মুসলিমি ওয়া খাযলিহি ওয়া ইহতিকারিহি ওয়া দামিহি,হাদীস নং ৪৬৫০

২৭ আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.), অনু.ও সম্পা. মুহাম্মদ মূসা, *জামেআত-তিরমিযী*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.), পৃ.৬৮

২৮ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

২৯ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা'আ ফিন্নাহয়ি আনিররিয়াহি, হাদীস নং ২১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পূরণ করে দিবেন, কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিপদ দূও কওে দিবেন।’[৩০]

[৩১-৩২ নং বাণী] এখানে জন্মগতভাবে সমমর্যাদা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। রাসূলে করিম (সা.) শুধু মুসলমানদেরই নয়, দুনিয়ার সকল মানুষকে পরস্পরের ভাই বলে স্বীকার করেছেন।

৩২.‘তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এইজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তরা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যার মুঠোয় আমার জীবন! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত তবে আমি তাঁরও হাত কাটতাম।’[৩১] এখানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতে বিচার প্রাপ্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর এই বাণী থেকেই বুঝা যায় যে, বৈষম্য দূরিকরণে ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছে ।

৩৩. عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا – قَالَ يَعْنِى الذُّكُور – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. “ ‘ হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা.) বরেছেন, যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্চনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[৩২]

৩৪. আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

‘ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

‘এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার সেবা পাওয়ার অধিকার সব চেয়ে কার বেশী? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি বলল তারপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি আবার বলল তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার বাবার।’[৩৩] [৩৪-৩৫ নং বাণী এখানে জীবনের অধিকার ও নারী ও শিশুর স্বতন্ত্র অধিকার লাভের কথা বলা হয়েছে।

৩৫. ‘বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যাবে না।”[৩৪] এখানে নারী অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৩৬. “তিন ধরনের লোক আছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শেষ বিচারের দিন অভিযোগ উত্থাপন করব। একজন সে ব্যক্তি, যে মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে, আরেক জন সে ব্যক্তি,

---

৩০ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল মুসলিমা ওয়া লা ইয়াসলিমুহু, হাদীস নং ২২৬২

৩১ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু ওয়া ক্বালা আল-লাইসু--, হাদীস নং ৩৯৬৫

৩২ ইমাম আবু দাঊদ, *সুনানু আবী দাঊদ*(লেবানন : দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যা, বৈরুত,১৩৮৯/১৯৬৯), কিতাবুল আদব,অনুচ্ছেদ. ফী-ফাদলে মান আ'লা ইয়াতামা পৃ. ৩৩০

৩৩ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু মান আহাক্কুন্নাসি বিহুসনিসসুহবাতি, হাদীস নং ৫৫১৪

৩৪ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্ ,হাদীস নং ৬৪৫৩

Dhaka University Institutional Repository

যে তাকে (মুক্ত মানুষকে) বিক্রয় করে এবং অন্যজন সে ব্যক্তি, যে দাস বিক্রির অর্থ খায়।”[৩৫]

৩৭. “হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আযাদ করবে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তি দানকারীর এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমনকি তার গুপ্ত অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তি দাতার গুপ্ত অঙ্গকে মুক্ত করে দেবেন।”[৩৬]

৩৮. “ للمملوك طعامه و كسوته و لا يكلّف من العمل الا ما يطيق عن ابى هريرة قال قال رسول الله ص. (رواه مسلم) ‘হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাসদাসীকে খাবার ও কাপড় দিতে হবে এবং তাদের সাধ্যাতীত কাজের ভার দেয়া যাবে না।”[৩৭]

৩৯. হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে বিনা অপরাধে আপন দাসদাসীকে দণ্ডদান করেছে অথবা তাকে চড় মেরেছে তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।”[৩৮]

৪০. আরবের তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় গরু ছাগলের মত হাটে বাজারে দাসদাসীদের এবং প্রয়োজনবোধে এদের শিশু বাচ্চাদেরকে আলাদাভাবে বিক্রি করে দিত, যেমনি করে আমাদের দেশের মানুষ গরু রেখে গরুর বাচ্চাকে অথবা বাচ্চাকে রেখে গুরুকে বিক্রি করে দেয়। মানব শিশু এবং তাদের এহেন বিক্রি যে কতটা অমানবিক উহার বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যে (ব্যক্তি) সন্তান আর তার মাকে পৃথক করেছে (অর্থাৎ মা ছাড়া সন্তান বেচেছে অথবা সন্তান ছাড়া মাকে বেচেছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এবং তার প্রিয়জনদেরকে পৃথক করবেন।”[৩৯]

[৩৯-৪৩ নং বাণী] এখানে দাস-দাসীর অধিকার এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪১. ‘হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির দুশমন হবো। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। আজাদ মুক্ত মানুষ বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়ে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তাকে মজুরী দেয় নি।’[৪০]

---

৩৫ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু ইসমু মান বা‘আ হুররান হাদীস নং ২০৭৫

৩৬ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*(ঢাকা : মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, জুলাই ২০১১/ ২০৩২ হি. ১ম খ. ২০০৩ খৃ.), কিতাবুল ইত্ক, হাদীস নং ২৭৭৭

৩৭ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খাতিব তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ্*(ঢাকা : মাকতুবাতুল কাসেমিয়া তা.বি),বাবু নাফকাত,পৃ. ২০৯

৩৮ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪

৩৯ তিরমিজী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা’আ ফী কারাহিয়্যাতিল ফারকি বাইনাল আখওয়াইনি ওয়া বাইনাল ওয়ালিদাতি ওয়ালাদাহা ফিল বায়‘ই, হাদীস নং ১২০৪

৪০ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু ইসমু মান বা‘আ হুররান, হাদীস নং ২০৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এখানে সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য পারিশ্রমিক লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪২.'কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার এ দুটি স্বভাবের কোন মুসলিমের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।'[৪১] এখানে অমানুষিক বা অবমাননাকর অত্যাচারের স্বীকার না হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪৩.'আল্লাহ তা'আলা পরিশ্রম করে উপার্জনকারী মুমিনকে ভালবাসেন।'[৪২] এখানে শ্রমের অধিকার ও স্বাধীন ভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪৪. যে আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয় এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যবরণ করে তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতরে মৃত্যু।[৪৩] এখানে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার এবং সামাজিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪৫. 'বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকীনদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।'[৪৪] এখানে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। চ্যারিটি বা দাতব্য সংস্থার বিষয় আসতে পারে। যার মাধ্যমে সমাজ তথা আর্তমানবতার অধিকার আদায় হয়।

৪৬. 'জালেম স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলাই উত্তম জিহাদ।'[৪৫] এখানে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকারেরকথা বলা হয়েছে।

৪৭.' যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তার বৃদ্ধ অবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন যে তাকে সম্মান করবে।'[৪৬] এখানে বয়স্কদের সম্মান রক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

৪৮. 'যে ব্যক্তি কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই চিকিৎসক হয়ে বসে, তবে মৃত্য রোগ বৃদ্ধির জন্য সেই দায়ী।[৪৭]

৪৯.'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার ফেতনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ নয় সে বেহেশতে যেতে পারবে না।'[৪৮]

এখানে [৫১ নং হতে ৫২ নং] বাণীতে সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

---

৪১ তিরমিজী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা'আ ফিল বুখলি, হাদীস নং ১৮৮

৪২ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, বাবু আল্লাহ য়ুহিব্বু মিনাল আমিলি ইযা 'আমিলা আঁইয়ুহসিনা, হাদীস নং ৫০৮৩

৪৩ আবূ আব্দিলাহ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিলাহি আল হাকিম, *আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), হাদীস নং ৩৭০

৪৪ বুখারী ,প্রাগুক্ত, বাবুস সা'ঈ আলাল মিসকীনি,হাদীস নং ৫৫৪৮

৪৫ আবু দাউদ ,প্রাগুক্ত, বাবুল আমরি ওয়ান নাহয়ি, হাদীস নং ৩৭৮১

৪৬ তিনমিযি, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা'আ ফী ইজলালিল কাবীরি, হাদীস নং ১৯৪৫

৪৭ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু ফীমান তাত্বাইয়াবা বিগাইরি ইলমিন, হাদীস নং ৩৯৭২

৪৮ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবু বয়ানি তাহরীমি ইযাইল জারি, হাদীস নং ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণসমূহে মানবাধিকারের চেতনা

মহানবী (সা.) তার নবুওয়াতী জিন্দেগীতে অনেক খুৎবা বা ভাষণ প্রদান করেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঐ সমস্ত ভাষণ নিয়ে আলোচনা করেছি যা তিনি কোন আম জনতার সম্মেলনে অথবা সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশ্য ভাষণ প্রদান করেছিলেন এবং যা মানবাধিকারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। রাসূল (সা.) কখনো ভূমিতে এবং কখনো মিম্বরে দাঁড়িয়ে, আবার কখনো উটের পিঠে বসে ভাষণ প্রদান করতেন। ভাষণ দানের সময় তাঁর চেহারা মোবারক অত্যন্ত প্রভামণ্ডিত ও কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। মনে হত যেন কোন জেনারেল তার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন।[৪৯] রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ভাষণ প্রধানত সংক্ষিপ্ত হত। রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ হত বাছাইকৃত ও অত্যন্ত সুমধুর। তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য ছিল সাবলীল ও ভাবসমৃদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ভাষণ দ্বারা শ্রোতারা প্রভাবিত হয়ে ঈমান, তাকওয়া, দয়া করুনা, ন্যায় বিচার, সদাচারের গুণে গুণান্বিত হয়ে অধিকার আদায় এবং আর্তমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রনীভুমিকা পালন করা নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটণা। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মূল ভাষণগুলো প্রচলনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তা করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জিহাদ সম্পকির্ত ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম বাহিনীকে কোন অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন বাহিনী প্রধানকে বিশেষভাবে তাকওয়া অবলম্বনের , আপন সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য এবং মানবতা ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত না হয় তার জন্য উপদেশ দিতেন। যেমন-

قال النبي صلى عليه وسلم اعزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا نت كفر بالله

'হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়বে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, খিয়ানত করবে না, শত্রুদের নাক-কান কাটবে না। তোমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তাদের সামনে পর পর তিনটি প্রস্তাব করবে। যদি তারা এর যে কোন একটি মেনে নেয় তাহলে তাদের সাথে কখনো যুদ্ধ করবে না।

প্রথমে তাদের কে ইসলামের প্রতি আহকান জানাবে। যদি তারা এ আহবানে সাড়া দেয় তাহলে তাদের সাথে। অতঃপর, তাদের কে বলবে, যেন তারা নিজেদের দেশ ---------:[৫০]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ :

১. সামজিক নিরাপত্তার অধিকার।
২. যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অধিকার তথা জানমালের নিরাপত্তালাভের অধিকার।

---

৫৩ আবদুল কাইয়ুম নদভী, *মহানবীর ভাষণ*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন , ২য় সংস্ক. জুন ২০১০), পৃ. ৩৪

[৫০] আবদুল কাইয়ুম নদভী, অনু. আবদুল মতীন জালাবাদী, *মহানবীর ভাষণ*(ঢাকা : ইসলাকি ফাউন্ডেশন, ২০১০ খৃ.), খ. ২, পৃ.১৪২-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মুতা যুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণে মানবাধিকার চেতনা

প্রেক্ষাপট

সাম্যের পতাকাবাহী নবী মুহাম্মদ (সা.) মুতার যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীকে 'ছানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য ভাষণ প্রদান করেন।

'তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে সিরিয়ায় আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বে। সেখানকার খানকাসমূহে (উপাসনালয়) সমুহে তোমরা অনেক সংসার ত্যাগী লোককে উপাসনারত দেখতে পাবে। সাবধান ওদেরকে তোমরা বিরক্ত করবে না। এদের ছাড়া তোমরা আরো কিছু লোক পাবে , যাদের মস্তিস্কে শয়তানের বাসা বেঁধেছে। তোমরা ওদেরকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবে। সাবধান ! কোন স্ত্রীলোক, দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ কাটবে না এবং কোন ঘরবাড়ীও ধ্বংস করবে না।'[৫১]

এখানে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
২. জীবন রক্ষার অধিকার।
৩. নারী, শিশু তথা আবাল বৃদ্ধ-বনিতার বিশেষ অধিকার।
৪. বিশ্ব পরিবেশে ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার।
৫. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

মূতার যুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা

প্রেক্ষাপট : হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সব বাদশাহ ও রঈসদের নামে দূত মারফৎ ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শারজীল অন্যতম। শারজীলের নিকট পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত হারিস ইবনে উমাইয়র (রা.)। কিন্তু অত্যাচারী শারজীল হযরত হারিসকে হত্যা করে। যেহেতু দূতকে হত্যা করা কোন ধর্ম বা সমাজে সিদ্ধ নয় তাইরাসুলুল্লাহ (সা.) ঐ হত্যা কাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাদেরকে রওয়ানা করার সময় তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন যার অনুবাদ নিম্নরূপ:

আল্লাহর প্রসংশা ও প্রশস্তি বর্ণনা করার পর হুযুর (সা.) বলেন ,এই বাহনীর অধিনায়ক হবে আমার গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসা। যদি সে শাহাদাত বরণ করে তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত হবে আমার চাচাত ভাই জা'ফর তাইয়ার। যদি সেও শাহাদাত বরণ করে তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত হবে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা। দেখ তোমরা প্রথমে শত্রুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই । আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে যুদ্ধ করবে। সাবধান ! অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, খেয়ানত করবে না, যুলুম করবে না, নারী ও শিশুদের উপর হাত তুলবে না, কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন রোগীকে কষ্ট দিবে না, বিনা কারণে গাছ কাটবে না, কোন শস্যক্ষেত্র নষ্ট করবে না, কোন গরু, বকরী কিংবা উট অন্যায়ভাবে যবাই করবে না । যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে , তাদেরকে আক্রমণ করবে না। এবং যারা উপাশনালয়ে বসে আছে , তাদেরকে কোন ভাবে বিরক্ত করবে না। যেখানে হারিস ইবনে উমায়ের শহীদ হয়েছে, সেখানে সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে অবশ্যই যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করুন।[৫২] এই ভাষণের কোন কোন অংশ বুখারীতে আছে। অবশিষ্টটুকু ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. ভালো আচরণ লাভের অধিকার
২. পরিবেশ রক্ষার অধিকার
৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার
৪. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের স্বতন্ত্র অধিকার
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপত্ত লাভের অধিকার
৬. প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের রক্ষার অধিকার
৭. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

তবুকের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা

১. প্রেক্ষাপট : হিজরী ৯ সনের রজব মাসে রাসূল (সা.) এর জীবনের সর্বশেষ তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাসূল (সা.) এর সাথে ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) সাহাবী ছিলেন। তিনি কোন একটি নামাযান্তে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।[৫৩]

২. রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর প্রসংশা প্রশস্তি ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর বলেন, ১. সবচেয়ে সত্যি কিতাব হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, ২. সবচেয়ে অধিক ভরসার কথা হচ্ছে তাক্ওয়ার কথা, ৩. সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত (ধর্ম) হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মিল্লাত। ৪. সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তরীকা হচ্ছে মুহাম্মাদের তরীকা, ৫. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিকর হচ্ছে আল্লাহর যিক্র ৬. সবসচাইতে পবিত্র বিষয় হচ্ছে আল-কুরান, ৭. সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। ৮. সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে বিদ‘আত ৯. নবীদের তরীকা সকল তরীকার উপরে। ১০. শহীদের মৃত্যু সকল মৃত্যুর উপরে। ১১ সবচেয়ে পথভ্রষ্টতা হচ্ছে সেই পথভ্রষ্টতা, যা হিদায়াত প্রাপ্তির পরে আসে। ১২. সেই আমল শ্রেষ্ট, যা উপকারী, ১৩. সর্বশ্রেষ্ট রীতি তাই, যর উপর মানুষ চলতে পারে, ১৪. জঘন্যতম পথভ্রষ্টতা হচ্ছে মনের পথভ্রষ্টতা। ১৫. উপরের দাতার হাত নীচের দাত(গ্রহীতার) হাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ ১৬. প্রয়োজন পুরন করতে পারে এমন অল্প পরিমাণ সম্পদ সেই অধিক পরিমাণ সম্পদের চাইতে শ্রেষ্ঠ যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়। ১৭. নিকৃষ্টতম তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) হচ্ছে সেটি, যা মৃত্যুর সময় করা হয়। (অর্থাৎ সারা জীবন তওবা না করে মৃত্যুর সময় করা হয়।) ১৮. নিকৃষ্টতম অনুতাপ হচ্ছে সেটি, যা কিয়ামতের দিন করা হবে। ১৯. কিছু লোক এমন আছে যারা জুমু‘আর দিন মসজিদে আসে এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর পিছনে দুনিয়ার দিকে পরে থাকে। ২০. অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কখনো কখনো আল্লাহর নাম স্মরণ করে। ২১. সবচেয়ে বড় পাপ হল মিথ্যা বলা, ২২. অন্তরের ঐশ্বর্য সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, ২৩. তাকওয়া হচ্ছে সবচাইতে উৎকৃষ্ট পাথেয়, ২৪. খোদাভীতি বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। ২৫. শংসয় সৃষ্টি করা কুফর, ২৬. ইয়াকিন অন্তরে রাখার জিনিস, ২৭. উচ্চ স্বরে

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

[৫৩] বায়হাকী,‘দালাইলুন নবুওয়াত, প্রাগুক্ত, বাবু মা রুভিয়া ফী খুতবাতিহী (স.), হাদীস নং ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ও ইনিয়ে বিনিয়ে ক্রন্দন করা মূর্খতার চিহ্ন ২৮. চুরি করা জাহান্নামের শাস্তির একটি উপঢৌকন। ২৯. নিশাগ্রস্থ হওয়া আগুনে পতিত হওয়ার শামিল ৩০. কাব্য (যার বিষয়বস্তু অশ্লীল ও জঘন্য) ইবলিসের অংশ। ৩১. মদ পান সমগ্র গুণাহের মিলনভূমি ৩২. নিকৃষ্টতম জীবিকা হচ্ছে ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ৩৩. সেই বাগ্যবান, যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে ৩৪. সেই প্রকৃত হতভাগা যে মায়ের পেট থেকে হতভাগা রুপে জন্মগ্রহণ করে। ৩৫. যে কোন কাজের আসল পূজি হচ্ছে তার তার সুন্দর পরিসমাপ্তি ৩৬. নিকৃষ্টতম স্বপ্ন হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন। ৩৭. যে ঘটনা অবশ্যই ঘটবে (মৃত্যু ও কিয়মিত) তা অতি সন্নিকটে। ৩৮. মু'মিনকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক ৩৯. হত্যা করা কুফর ৪০. মু'মিনের মাংস খাওয়া(তার নিন্দা করা) আল্লাহরই নাফরমানী তুল্য ৪১. মু'মিনের মাল (অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা) তেমনি হারাম যেমন হারাম তার রক্ত(রক্তপাত), ৪২. যে আল্লাহর সাথে দম্ভ করে, আল্লাহ তাকে বাতিল (অকেজো) করে দেন, ৪৩. যে, অন্যের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন করেন ৪৪. যে ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় ৪৫. যে নিজের রাগ হজম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুরুস্কৃত করেন, ৪৬. যে অন্যের ত্রুটি খোঁজে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন ৪৭. যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উন্নতি দেন। ৪৯. যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেন। ৪৯. যে ক্ষতির মধ্যেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর প্রতিদান দেন, ৫০. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থণা কর। তিনি প্রকৃত ক্ষমাকারী।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমুহ হচ্ছে:

১. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
২. আর্থ-সামাজিক নিরা পত্তা লাভের অধিকার।
৩. মর্যাদা লাভের অধিকার।
৪. জান ও মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা

প্রেক্ষাপট : আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাতে ৬৩০ খ্রি. সনের জানুয়ারী মাসে মক্কা বিজিত হয়। ঐ সময় তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন , যার প্রত্যেকটি কথা এবং প্রতিটি বাক্য একান্ত প্রণিধানযোগ্য এবং অবশ্য পালনীয়। ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল তাঁর ঐ সকল শত্রু যারা তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। তাকে গাল দিয়েছিল, প্রহার করেছিল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেছিল। তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন এবং প্রদত্ত ভাষণে বলেন,

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই । তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। তিনি আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং কাফির বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। সাবধান আজ কুফরীর সর্ব প্রকার দম্ভ, খুনের সমগ্র পুরাতন প্রতিশোধ এবং জাহিলিয়াতের সব রকম দাবীদাওয়া আমার পদতলে (পিষ্ট করলাম)। আজ শুধু মাত্র দুটি পদ বাকী থাকল। একটি কা'বা ঘরের খিদমত এবং অপরটি পানি পান করানোর দায়িত্ব। হে কুরায়শ! আল্লাহ তা'আলা জাহিলিয়াতের দাম্ভিকতা ও খানদানী (বংশগত) অহংকারের মূলোতপাটন করেছেন। তোমরা সবাই

আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। খোদা তা'আলা বলেছেন, "হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা এক অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।[৫৪]

আজ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মদের ব্যবসা এবং সুদী কারবার চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিলেন।[৫৫]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. মর্যাদা ও সম্মান লাভের অধিকার।
২. জীবন নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মানবাধিকারের চেতনা

বিদায় হজ্জ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ হজ্জ। এরপর তিনি আর হজ্জ করতে পারেন নাই। তাই বিশ্বাবাসীর সামনেই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রচারের এটাই ছিল সর্বশেষ সুযোগ। সুতরাং বিদায় হজ্জের বিদায়ী ভাষণ সঙ্গত কারণে একটু দীর্ঘ ছিল সন্দেহ নেই। সেজন্য হয়ত সকল শ্রোতা এই ভাষণের আদ্যোপান্ত মনে রাখতে সক্ষম হননি। সিহাহ সিত্তাহসহ প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই এই ভাষণের বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত এ সকল বর্ণনা একত্র করে দেখলে মনে হয় বিদায় ও হজ্জ উপলক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি স্থানে পৃথক পৃথক ভাষণ দান করেছিলেন।

প্রথমটি ৯ যিলহজ্জ আরাফার প্রান্তরে।

দ্বিতীয়টি ১০ যিলহজ্জ মিনাতে।

তৃতীয়টি ১১ অথবা ১২ যিলহজ্জ 'গাদীর-ই খুম' নামক স্থানে।[৫৬]

অতএব আমরা বলতে পারি বিদায় হজ্জের ভাষণ মূলত এই তিনটি ভাষণের সামষ্টিকে বুঝায়। উল্লেখ্য যে, মূল ভাষণটি একই সঙ্গে ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া দুষ্কর। তাই আমরা এ ভাষণ তাফসীর, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ হতে সংগ্রহ করত যথা সম্ভব বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

বিদায় হজ্জের ভাষণের প্রস্তুতি:

৯ যিলহজ্জ শুক্রবার বেলা দ্বি প্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফাতের অদূরে 'নামিয়ায়' তাবুতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁবু হতে বের হয়ে আসেন তখন সূর্য ঠিক মাথার উপর হতে অনেকটা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। তিনি "কাসওয়া" নামক উটনীকে প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন। কথামত উটনীকে সাজিয়ে তাঁর সামনে হাযির করা হল এবং তিনি তাতে আরোহণ করলেন। উটনী তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে "বাতনুল ওয়াদী" অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়। সেখানে তিনি উটের উপর অবস্থান পূর্বক উপস্থিত জনতার সামনে নীতি নির্ধারণী এক চিরন্তন

---

[৫৪] আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

[৫৫] আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন নবী(স.), হাদীস নং ১৬২৮

৫৬ শায়খুল হাদীছ মাও. মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা ইসলামী জীবনাদর্শের এক অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের পথিকৃত সনদ।[৫৭]

উচ্চ কণ্ঠে তিনি এই ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যেকটি বাক্য তিনি বিরতি দিয়ে বলেন। এ সময় রাবী'আ ইবনে উমাইয়্যা ইবনে খালাফ মহানবী (সা.) এর উচ্চারিত বাক্যগুলি সজোরে পুনরাবৃত্তি করছিলেন।[৫৮]

ইয়াওমু আরাফা বা আরাফার দিবস ছিল ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বিকাশের দিন, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐদিন জাহেলিয়াতের সকল বিধি বিধানকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং ইসলামের এই ভাষণে শ্রোতারা যিনি যে অংশ স্মরণ রাখতে পেরেছেন তিনি সেই অংশই বর্ণনা করেছেন। তাই এই ভাষণ বিভিন্ন স্থান হতে চয়ন করা হয়েছে।[৫৯]

বিদায় হজ্জের ভাষণ আরাফার ময়দানে:

ভাষণের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান রাব্বুল আলামীন এর প্রশংসা করলেন, তারপর উপস্থিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরাশাদ করলেন,

حدثنا ابو بكربن ابي شيبية واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حاتم قال----فخطب الناس فقال إن دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন হারাম তোমাদের জন্য এ মাস এবং এ শহর।"[৬০]

ألا وإن كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة واول دم اضعه دم ربيعة بن الحارث (كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل)

"সাবধান ! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের রাবী'আ ইবনে হারিসের পূত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পোষ্য ছিল। যখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।"[৬১]

وربا الجاهلية موضوع وأول ربا اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله

"জাহিলী যুগের সুদ বাতিল করা হল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইব্‌নে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল।"[৬২]

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستتحللتم فروجهن بكلمة الله ، و لكم عليهن ان لا يوطين فروشكم
[redacted] احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

---

৫৭. আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭

৫৮. শায়খুল হাদীছ মাও. মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০৭

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)*, খ. ১২শ, পৃ. ৫১০

৬০. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ(রহ.) আল কুশায়রী, আস *সহীহ মুসলিম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২য়, সংস্ক. ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ.), খ.৪র্থ, বাবু হাজ্জাতুন্নাবী, হাদীস নং ২১৩৭ পৃ.৮৯

৬১. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন নবী(স.), হাদীস নং ১৬২৮

৬২. ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবু হাজ্জাতি রাসূলিল্লাহ (স.),হাদীস নং ৩০৬৫

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায় সংগত ভরণ পোষণের ও পোশাক পরিচ্ছদের হক রয়েছে।"[৬৩]

اني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله

"আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে ' আল্লাহ্র কিতাব'।" [৬৪]

يايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي عجمي ولا لجعمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى

"হে মানব সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রভূ এক, তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নাই তাকওয়া ব্যতীত।"[৬৫]

ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل لامريء من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم

'হে লোক সকল! আমার কথা শোন এবং হৃদয়ঙ্গম কর। জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিষ তার খুশী মনে দান ব্যতীত গ্রহণ করা অবৈধ। তোমরা মানুষের উপর জুলুম করো না'।[৬৬]

'আর যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হল প্রস্তরের আঘাতে তাকে হত্যা করা। আর যে ছেলে নিজের পিতার বদলে অন্য কারো ঔরসে জন্ম হয়েছে বলে দাবি করল এবং কোন গোলাম আপন মনিব ব্যতীত অন্য কারো মালিকানার প্রতি নিজেকে সংযুক্ত করল, তার উপর আল্লাহর লা'নত ও অভিসম্পাত অবতীর্ণ হয়। মহিলাদের স্বামীর সম্পদ হতে অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয নয়। ধার করা বস্তু অবশ্যই ফেরত দিবে। কোন বস্তুর যিম্মাদার হলে তা অবশ্য পূরণ করবে। উপহারের পরিবর্তে উপহার প্রদান করবে।'[৬৭]

'হে লোক সকল! জেনে রাখ, আমার পরে আর কোন নবী নেই। আমিই শেষ নবী। তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই তোমরাই সর্বশেষ উম্মত। সুতরাং তোমরা আপন প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। রমযান মাসে রোযা রাখবে। আর তোমরা ধন-সম্পদের যাকাত সানন্দচিত্তে প্রদান করবে। আপন প্রভুর ঘরের হজ্জ আদায় করবে। নিজের শাসকের আনুগত্য

৬৩. মুসলিম,প্রাগুক্ত, বাবু হাজ্জাতুন্নাবী, হাদীস নং ২১৩৭
৬৪. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবু সিফাতি হাজ্জাতিন নবী(স.),হাদীস নং ১৬২৮
৬৫. বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, বাবু রাব্বুকুম ওয়াহিদুন হাদীস নং ৪৯২১
৬৬. ইব্ন ইসহাক, অনু. শহীদ আখন্দ, *সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স.)*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৩ হি./ ১৯৯২ খৃ.),খ. ৩, পৃ. ৬৪৮
৬৭. আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৪৫০

Dhaka University Institutional Repository

করবে। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'[৬৮]

وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واريت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد .

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন "তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? সাহাবীগণ বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহর নির্দেশসমূহ সকলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন এবং উত্তম উপদেশ প্রদান করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) আপন শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে তুলে এবং তা জনগণের প্রতি ঝুঁকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।[৬৯]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. জীবনের নিরাপত্তা লাভের অথিকার
২. সম্পদের নিরাপত্তালাভের অধিকার
৩. বাসস্থানের অধিকার
৪. অপসংস্কৃতি অপসারণের অধিকার
৫. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার
৬. সমতা লাভের অধিকার
৭. নিষ্ঠুরতা বা অবমাননা হতে মুক্ত থাকা অধিকার
৮. সম্পদ লাভের অধিকার
৯. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
১০. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

বিদায় হজ্জে মিনার ভাষণ

আরাফা প্রান্তরের ন্যায় মিনাতেও তিনি একটি ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণটিও ছিল গুরুগম্ভীর, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। এ ভাষণেও তিনি দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে কুরবানীর দিনের মর্যাদা, সম্মান, ফযীলত ও মক্কার পবিত্রতার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। এ ছাড়া আগের দিনের ভাষণের অনেক বিষয় তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, বিশেষ করে যে সকল বিষয় একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৭০]

তিনি ভাষণের প্রথমেই উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করে আরম্ভ করেন।

---

৬৮. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, অনু.খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*(আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন ,১৪২০হি./১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৫১৩

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইব্ন মাজা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খৃ.), খ.৩য়, হা.৩০৭৪, পৃ. ১০৭ বাবু হাজ্জাতি রাসূলিল্লাহ (স.), হাদীস নং ৩০৬৫

৭০. আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫১

Dhaka University Institutional Repository

يايها الناس الا اي يوم هذا ثلاث مرات قالوا يوم الحج الاكبر قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا لا يجني جان الا على نفسه ولا يجزي والد على ولده ولا مولود عن والده الا ان الشيطان قد ايس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من اعمالكم فيرضي بها الا كل دم من دماء الجاهلية موضوع واول ما اضع منها دم الحارث بن عبد المطلب (كان مرضعا في بني ليث فقلته هذيل) الا وان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا يا امتاة هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات .

"হে মানব মন্ডলী! ইহা কোন দিন? এ কথা তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল বড় হাজ্জের দিন। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের নিকট হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এই দিনে তোমাদের এই শহর। সাবধান! একজনের অপরাধে অন্যজন দায়ী হবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়ি করা যাবে না। সাবধান! শয়তান নিরাশ হয়ে গিয়েছে এ জন্য যে, তোমাদের এই ভূমিতে আর কখনো তার ইবাদাত করা হবে না। তবে অচিরেই তার আনুগত্য হবে এমন সব কার্যাবলীর মাধ্যমে যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করে থাক। আর তাতেই সে খুশি হবে। সাবধান! জাহিলিয়াতের সকল রক্তপাণ রহিত করা হল। আর প্রথম যে রক্তপণ রহিত করলাম তা হল হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর রক্ত বনী লায়স গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় তাকে হুযালী গোত্র হত্যা করে। সাবধান! জাহিলিয়াতের সকল সুদ রহিত করা হল। তোমরা কেবল মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা জুলুম করো না, তাহলে তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না, ওহে লোক সকল! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়োছি? এই কথা তিনি তিন বার জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তরে বললেন হ্যাঁ, তিনি বললেন হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এই কথাও তিনি তিনবার বললেন।"[৭১]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে কুরবানীর দিন রাসূল (সা.) বললেন, "আবর্তনের ফলে সময় আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। যে দিন আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই বৎসরের বার মাস। তার মাঝে চার মাস হারাম তিনটি মাস এক সাথে যিলকাদ, যিল-হাজ্জ ও মুহররম আর চতুর্থটি হল মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জামাদিউস সানি ও শা'বান মাসের মধ্যবর্তী তারপর তিনি বললেন, ইহা কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়ত এর পুরাতন মাসের বদলে নতুন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, ইহা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বললেন, ইহা কুরবানীর দিন নয় কি? আমরা বললাম হ্যাঁ, তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত, সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন, তোমাদের নিকট এই মাস, এই দিন ও এই শহর পবিত্র বা হারাম। তারপর

৭১ ইব্ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবুল খুতবাতি ইয়াওমান্নাহরি, হাদীস নং ৩০৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বললেন তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কর্মসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। একজন অন্য জনকে হত্যা করো না।[৭২]

অপর বর্ণনায় রয়েছে। তিনি পবিত্র কুরআনের অত্র আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ‘এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফুরী বৃদ্ধি করা যদ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলির গণনা পূর্ণ করতে পারে। অনন্তর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা যেন হালাল করতে পারে’।[৭৩]

কেননা কাফিররা সফর নামক মাসকে কোন বৎসর হারাম ঘোষণা করত, কোন বৎসর মুহাররম মাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করত। আবার কোন বৎসর সফর মাসকে নিষিদ্ধ করত, আবার মুহাররম মাসকে হালাল করত। আর এটাই হল মাস বদল।[৭৪]

“হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ভাল করে ধরে রাখ তবে কোন দিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন। তোমরা এর উপর আমল করবে।” তিনি আরও বলেন– “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে; তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, তোমাদের রমযান মাসটির রোযা রাখবে এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করবে, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? উপস্থিত জনতা সমস্বরে জবাব দিল হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই নির্দেশ পৌঁছে দিবে। কেননা অনেক সময় বাহকের তুলনায় শ্রোতা অধিক স্মৃতিধর হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি তাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন’।[৭৫]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. সুবিচার লাভের অধিকার।

২. জান-মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

৩. হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকরকরণে মানবাধিকার।

৪. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

৫. শাসকের আনুগত্য লাভের অধিকার।

---

৭২ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাছীর আদ-দামিশকী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২০-২২১

৭৩ আল-কুরআন, ৯ :৩৭

৭৪ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাছীর আদ-দামিশকী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২২

৭৫ ইব্ন কাসীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা*(বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ,লেবানন, তা.বি), খ.৪, পৃ. ৪০৩-৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ বিশেষ গাদীরে খুম

হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরদের এক বিরাট কাফেলা সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরছেন। রাস্তায় আল-জুহফা হতে তিন মাইল দূরে 'খুম' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। স্থানটি ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝখানে। সেখানে একটি পুকুর ছিল। আরবী ভাষায় পুকুরকে বলা হয় গাদীর। পরবর্তীকালে স্থানটি "গাদীরে খুম" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সমবেত করে একটি খুতবা প্রদান করেন। এই খুতবা (ভাষণ) সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেই খুতবায় প্রথমেই রাসূলুল্লাহ (সা.) চিরাচরিত পন্থায় আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনা করেন। তারপর ভাষণ প্রদান করেন, اما بعد الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكر الله في اهل بيتي

'হামদ ও ছানার পর বললেন, হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে আমিও মানুষ। সম্ভবত আমার প্রতিপালকের বার্তাবহ ফেরেশতা এসে উপস্থিত হতে পারেন এবং আমিও উহা কবুল করতে পারি। আমি তোমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। ইহাদের প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, পবিত্র কুরআন। এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। সূতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন, আর অপরটি হল, আমার পরিবারবর্গ। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'[৭৬] অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) গাদীরে খুমে হযরত আলী (রা.) এর হাত ধরে বললেন,

الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال الستم تعلمون اني اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والانه وعاده من عاداه فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنياء يا ابن اب طالب اصبحت وامسبت مولي كل مؤمن ومؤمنة .

'তোমরা কি জান না যে, আমি মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশী আপন? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি জান না যে, আমি প্রতিটি মু'মিনের নিকট তার নিজের অপেক্ষাও বেশী আপন? তারা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ! যে তার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হবে, তুমিও তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হও। আর যে, তার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হবে তুমিও তার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হও। অতঃপর হযরত উমার (রা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, মোবারকবাদ হে আলী ইব্ন আবি তালিব! আপনি সকল মু'মিন নর-নারীর অভিভাবক হয়ে গেলেন।'[৭৭]

---

৭৬. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাছীর আদ-দামিশকী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬

৭৭ আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণের অন্যান্য দিক

- মহানবী (সা.) সুস্পষ্টভাবে তাঁর ভাষণে বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের অভিভাবক বা আমানতদার তার উচিত মালিককে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া।[৭৮] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে - সম্পদের নিরাপত্তালাভের অধিকার।
- মহানবী (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন : কা'বা ঘরের খিদমত ও পানি পাণ করানো ব্যতিরেকে জাহিলি যুগের সকল প্রকার কুসংস্কার বাতিল ঘোষিত হলো।[৭৯] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।
- মহানবী (সা.) তাঁর ভাষণে হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার বিচার হত্যা (কিসাস) লাঠি ও পাথর দিয়ে হত্যা করা হয় তা শিবহু আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার মত হত্যা। এ হত্যার বিচার একশত উট এর উপর বাড়াবাড়ি করা জাহিলি যুগের কাজ। আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো।[৮০] এখানে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- হত্যাবিষায়ক দণ্ডবিধি কার্যকরণে মানবাধিকার।
- মহানবী (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যারা এই ঘোষণা দিবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট। তোমরা নিজের উপর জুলুম করোনা এবং আমার পরে কুফুরীর দিকে যেওনা।[৮১] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- নিষ্ঠুরতা ও অবমাননা হতে মুক্ত থাকার অধিকার।
- ইব্‌ন খারিজার সূত্রে– ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন– হে জনমন্ডলী! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ওয়ারিসের জন্য মীরাসের অংশ বণ্টন করে দিয়েছেন, কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত বৈধ নয় এবং এক তৃতীয়াংশের বেশীও কোন ক্ষেত্রে অসিয়ত করা বৈধ নয়।[৮২] এখানে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে - সম্পদ লাভের অধিকার ।
- সন্তান যার গৃহে জন্ম গ্রহণ করবে, তারই সন্তান বলে গণ্য হবে। ব্যাভিচারীর শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। যে স্বীয় পিতাকে বাদ দিয়ে অপরকে পিতা এবং যে দাস বা দাসী স্বীয় প্রভুকে বাদ দিয়ে অপরকে প্রভু বলে দাবী করে, তার উপর আল্লাহর ফেরেশতার ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত (অভিসম্পাত)।[৮৩] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- উত্তরাধিকার লাভের অধিকার ।
- মহানবী (সা.) বলেন– হে জনমন্ডলী! যদি কোন নাক কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের আমীর (নেতা) করে দেওয়া হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন অনুযায়ী তোমাদের

---

৭৮ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪৭

৭৯ প্রাগুক্ত।

৮০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে্ ইয়াযিদ ইবনে্ মাজাহ্ আল-কাযবীনী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮

৮১ আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*(মিশর : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৭২

৮২ মুহাম্মদ বিন সা'দ, *আত তাবাকাতুল কুবরা*(লেবানন : দারুল ইহইয়িয়িত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৬ খৃ.), খ.২, পৃ.১৮৬

৮৩ ইব্‌ন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*(বৈরূত: দায়রুল খায়র, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৬০৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করতে থাকে, তোমরা সর্বোতভাবে তার অনুগত ও বাধ্য থাকবে।[৮৪] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- শাসকের আনুগত্য লাভের অধিকার যা মূলত সামাজিক অধিকার।

- তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে তাই তাদেরও খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরিধান করাবে। যদি তারা অমার্জনীয় কোন অন্যায় করে ফেলে, তাহলে তোদেরকে অন্যত্র বিক্রয় করে দাও তাকে শাস্তি দিওনা।[৮৫] এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- দাস-দাসী ও শ্রমিকের অধিকার।

রাসূল (সা.) এর সর্বশেষ ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণে বলেন- হে মানুষ! আমার উপর কারো কোন হক (পাওনা থাকলে সে যেন তা অবিলম্বে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সেই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে আমার কাছ থেকে তার হক আদায় করে নেয় অথবা আমাকে মাফ করে দেয়- যাতে করে কারো প্রতি আমার প্রভূর সাথে সন্তুষ্টচিত্তে মিলন হতে পারি। কেউ আমার প্রতি বিদ্বেশ পোষণ না করে। তখন জনৈক্য উঠে দাড়াল এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি কোন এক সময়ে তিনটি দিরহাম আমার কাছ থেকে নিয়ে একজন ভিখারীকে দান করেছিলেন। সে দিরহাম এখনো আমি ফেরত পাইনি। তখন হুযুর (সা.) সংগে সংগে ঐ দেরহামগুলো পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। তিনি বার বার এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন , আমার কাছে কারো কোন পাওনা থাকলে সে যেন অবিলম্বে তা চেয়ে নেয়। হে মুসলমানগণ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করছি। তোমাদের তাকওয়া ও আনুগত্য অনুযাযী তিনি তোমাদের হিফাযত করবেন। আমি দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি । বিদায় নিচ্ছি এ সংসার থেকে। অতপর আলী কে বলেন - হে, আলী! দাস দাসীদের ব্যপারে আল্লাহকে স্বরণ রাখবে, তাদেরকে ভালভাবে খাওয়াবে, পরাবে এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে। হে আলী, খুব ধৈর্য ধারণ করবে এবং সুদৃঢ় থাকবে।[৮৬]

এভাষণে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে:

১. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

২. দাস-দাসীর অধিকার ।

৮৪ সীরাতে ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত।

৮৫ মুহাম্মদ বিন সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৮৬ আবদুল কাইয়ুম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রণীত চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা

চুক্তি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চুক্তি মূলত অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞারই একটি শক্তিশালীরূপ। চুক্তির আরবী প্রতি শব্দ হচ্ছে ' মু'আহাদাত '। এর অর্থ হচ্ছে শপথের সাথে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করা। এটি সাধারণত দুই পক্ষের মধ্যে সাধিত হয়ে থাকে। নবী যুগের মু'আহাদাত বলতে ঐ সকল চুক্তিকে বুঝায় যা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হিজরতের পর বিশেষত মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্টার পর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের সহিত সাধিত হয়।[৮৭]

রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা যেমন কুর'আনে এসছে, [৮৮] هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন এ দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন।যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে'।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন এ দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন আর সাক্ষ্য দাতা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট'।[৮৯]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন এ দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে'।[৯০] যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল অনন্যোপায়ের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পন্থা। এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ অনন্যোপায় হয়ে কেবল তখনই গ্রহণ করা হত, যখন বিরুদ্ধবাদিগণ কোনক্রমেই শান্তিপূর্ণ ভাবে সুপথে আসত না। রাসূল (সা.) আন্তরিকভাবে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন যে ভাবেই হউক যেন যুদ্ধে এড়ানো যায়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ও সাহাবীগণও যুদ্ধের ময়দানেও বিপদের সম্মুখে সন্ধির শর্তাবলী পেশ করতেন। তাহারা কোনও একটি শর্তও কবুল করে নিরে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে বন্ধ করে দেয়া হত। যুদ্ধ চলাকালীনও যদি বিপক্ষ সন্ধি প্রস্তাব দিত তবে তিনি তা কবুল করে নিতেন। সুতরাং সন্ধি ও শান্তি চুক্তি ছিল মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ন। কেননা তাঁর আসল মিশন ছিল শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করা।

ইসলাম চুক্তির প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ সব ধরনের চুক্তি বা অঙ্গীকার পুরণের নিদের্শ দিয়ে বলেন- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا অর্থ যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে অঙ্গিকারাবদ্ধ হলে তখন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর; দৃঢ় শপথের পর তা ভঙ্গ করো না।[৯১]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে - ' إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

---

৮৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২০, ই.ফা.বা, এপ্রিল-১৯৯৬, পৃ. ৬৭৭-৬৮২

৮৮ আল-কুরআন, ৯ : ৩৩

৮৯ আল-কুরআন, ৪৮ : ২৮

৯০ আল-কুরআন, ৩৭ : ৯

৯১ আল-কুরআন, ১৬ : ৯১

Dhaka University Institutional Repository

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ অর্থ; নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট জীব আল্লাহর নিকট তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না। আর যাদের সাথে আপনি চুক্তি করলেন তারা প্রত্যেকবারই তাদেও কৃতচুক্তি ভঙ্গ করেছে, তারা সতর্ক হয়নি। অতঃপর আপনি তাদেরকে যুদ্ধে পেলে এমন শাস্তি দিবেন যেন পশ্চাতের লোকেরা শিক্ষা পায়। তবে কোন সম্প্রদায় থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা হলে তাদেও চুক্তি ফিরিয়ে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না [৯২]। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রাজনৈতিক ও নবীজীবনে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজনে বহু নেতা, গোত্র ও গোত্র প্রধানের সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। 'যেগুলো মূলত সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশিলতা উপরন্ত মানবতাবোধ ও মানবিকতার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল শান্তি চুক্তি, মৈত্রীচুক্তি, নিরাপত্তা দলিল, হস্তান্তর দলিল, দানপত্র এবং সন্ধিপত্র ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত'।[৯৩] প্রায় ৮০ টিরও অধিক চুক্তি সংরক্ষিত আছে।[৯৪] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চুক্তি, সন্ধির বিষয়ক দলিলাদির ভাষা ছিল সহজ সরল,সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট। রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে কৃত এসব চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারা বা বিষয়ে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

হিলফুল ফুযুল চুক্তিতে মানবাধিকার

ইসলাম পূর্ব বছরগুলিতে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে তখন কার দিনের মেলা বসত। ঐ সমস্ত মেলায় নানা ধরনের পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চলত। তাছাড়া কাব্য, যুদ্ধ, ঘোড়া দৌড়, জুয়া খেলা ইত্যাদিও চলত। বিভিন্ন গোত্রের দলপতিরা মেলায় উপস্থিত থাকতেন। কখনো বা কোন বীর নিজের রণনৈপূণ্য ও বিজয় গাঁথার আবৃত্তি করে এবং একই সাথে অপর গোত্রের কাপুরুষতা ও কুৎসা কাহিনী বর্ণনা করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতেন। এসব ব্যাপার থেকেই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগরা, বিবাদ, মারামারি হানাহানি ও গৃহযুদ্ধের সৃষ্টিপাত ঘটত। এ ধরনের মেলার মধ্যে 'ওকাজ' মেলাটি ছিল সর্বপ্রধান। একবার এই মেলা থেকে আস্বাভাবিকভাবে একটি কলহের সৃষ্টি হলো। পরে এই কলহ ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হয়ে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই গৃহ যুদ্ধ পাঁচ বছর ধরে চলছিল। এতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ "হরবে ফুজ্জার বা অন্যায়ের যুদ্ধ" নামে পরিচিত।[৯৫]

হাশেম বংশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে আবু তালিব ও তাঁর আত্নীয়রা ছিলেন। শেষ দিকে কিশোর নবীকেও পিতৃব্যের সাথে এই যুদ্ধে শরীক হতে হয়েছিল। তবে যুদ্ধ করেন নি, শুধু পিতৃব্যের সাথে থেকে তাঁদের তীর কুড়িয়ে দিতেন। এ যুদ্ধে কুরাইশদের কোন দোষ ছিলনা। বিপক্ষগণ অন্যায়ভাবে তাঁদের উপর আক্রমণ করাতেই কোরাইশগণ যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে একটি সন্ধিচুক্তির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে কিশোর নবীর মন অশান্ত হয়ে পরেছিল। এজন্য তিনি আর্ত পীড়িত,ব্যথিত, অত্যাচারিতকে রক্ষা করার জন্য এবং

৯২ আল-কুরআন, ৮ : **৫৫-৫৮**

৯৩ ড. মুহাম্মদ সোলায়মান, *'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ'*,(ঢাকা : অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস, আরবী বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৯৯), পৃ.২২৯ ।

৯৪ ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযী, *যাদুল মা'আদ*(মিসর: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৩২৪ হি.), খ. ২. পৃ. ১২৭

৯৫ সেখ মোহাম্মদ ইসমাঈল, *বিশ্বনবীর জীবন ও আদর্শ*(ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ১১০০ , দ্বিতীয় প্রকাশ, মে ২০০৩), পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারীকে বাধা দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এতদউদ্দেশ্যে আরবের কতিপয় যুবকদের নিয়ে কিশোর নবী একটি চুক্তির মাধ্যমে সেবা সংগঠন দাড় করালেন।

আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন:

১. আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করব
২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব
৩. অত্যাচারিতকে সেবা করব
৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করব
৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব।

এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা বাণীর নাম 'হিল্‌ফ-উল-ফুযুল'। উল্লিখিত পাঁচটি আদর্শ যুগে যুগে, দেশে দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় হয়ে আসছে। আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেয়া, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ও মৈত্রী স্থাপন করা এগুলোই তো তরুণের ধর্ম।

নবুওয়াতের কিছুকাল পূর্বে বানু হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির মাঝে 'হিলফুযুল' এর চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কত গুরুত্ব দিতেন ত্বাহা ইবন্ সা'দ এর বর্ণণা দ্বারা অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, ' যদি; ইহা হতে দূরে থাকার জন্য আমাকে উৎকৃষ্ট জাতের একশত উটও যদি কেউ আমাকে সেই চুক্তির নামে আহবান করে তবে অবশ্যই আমি তাতে লাব্বায়ক বলব।[৯৬]'

এখানে মানবাধকারের চেতনাসমূহ হচ্ছে:

১. জীবন রক্ষার অধিকার।
২. মর্যাদা লাভের অধিকার।
৩. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৪. আর্তমানবতা সর্বশ্রেণীর লোকের অধিকার।

মদিনার সনদে মানবাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু, "আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র পবিত্র মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের পরে সর্বপ্রথম মসজিদে নববী স্থাপন করেন। অতপর দীর্ঘ প্রতিক্ষীত ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনকল্লে মদীনার আনসার, মুহাজির, ইয়াহুদ ও অন্যান্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ লক্ষ্যে উল্লিখিত দল ও গোত্র গোষ্ঠীর সমন্বয়ে তিনি ইতিহাসখ্যাত যে সনদ প্রণয়ন করেন তা ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।
মদীনা সনদকে আল-কিতাব এবং আস্ব-স্বাহীফা বলা হয়। মহানবী (সা.) এ সনদটি 'হাযা কিতাব' বলে শুরু করেছেন এবং সনদের কয়েকটি ধারায় একে আস-স্বাহীফা বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে একে দাসতুরুল-মদীনা বা মদীনা সনদ বলে উল্লেখ করেন।[৯৭]

৯৬ ইবন সা'দ, মুহাম্মদ, *আত্ব-ত্বাবাকাতুল-কুবরা*(বৈরূত : দারয়ি ইয়াহিয়া আত তাওরাত আল-আরাবীয়া, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৯২

৯৭ ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *মাজমু'আতুল-ওয়াছাইক্বিস সিয়াসিয়্যাহ লিল আহদিন নবাবীয়াল খিলাফাতি রাশিদাহ(*

Dhaka University Institutional Repository

জনাব বরকত আহমদ তাঁর 'মুহাম্মদ এ্যান্ড দি জিউ'স'-এ রি এগজামিনেশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ সনদের প্রথম ২৩টি ধারা ছিল আল-আক্বাবায় আনসারদের সাথে মহানবী (সা.)- এর মূল চুক্তির অংশ বিশেষ। অন্য ধারাগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে যুক্ত হয়েছে। মনে হয়, ইহুদীদের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো মদীনাকে হারাম ঘোষণার (৬২৮ খৃিষ্টাব্দের জুলাইয়ের) পর সম্পন্ন হয়েছিল। মদীনা সনদের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো[৯৮]।

(সনদের পাঠ উল্লেখের ক্ষেত্রে তার ধারাগুলো আলাদা আলাদা করে দেখানোর সুবিধার্থে ধারাগুলোর ক্রমিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে।)

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) هذا كتاب من محمد النبي الى[رسول الله] بين المومنين والمسلمين من قريش و [اهل] يثرب ومن تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم.

(٢) أنهم أمه واحدة من دون الناس.

(৩) المهاجرون من قريش علي ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفْدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المومنين.

(৪) وبنو عوف علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، و كل طاءقة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين.

(৫) وبنوالحارث[بن الخزرب] علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولي، وكل طاءفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين.

(৬) وبنوساعدة علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(৭) وبنو جشم علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(৮) وبنو النجار علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(৯) وبنوعمرو بن عوف علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(১০) وبنوالنبيت علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(১১) وبنو الأوس علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولي، وكل طاءقة تفدي عانيها بالمعرف والقسط بين المومنين.

(১২) وأن المومنين لا يتركون مفْرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

(১২-ب) وأنه لا يحالف مومن مولي مومن دزنه.

(১৩) وأن تامومنين المتقين [ايديهم] علي [كل] من بغي منهم أو ابتغي دسيعة ظلم أو إثما او عدوانا أو فسادا بين المومنين، وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.

বৈরূত : ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯

৯৮ বরকত আহমদ, মুহাম্মদ এ্যান্ড দি জিউ'স এর রি-একজামিনেশন, নয়াদিল্লী ১৯৭৯, পৃ. ৩৭-৫০; সরকার কাঠামো, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) ولا يقتل مومن مومنا في كافر. ولا ينصر كافرا علي مومن.

(১৫) وأن دمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم. وأن المومنين بعضهم موالي بغض دون الناس.

(১৬)وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

(১৭) وأن سلم المومنين واحدة لا يسالم مومن دون مومن في قتال في سبيل الله عزوجل إلا علي سواء و عدل بينهم.

(১৮) وأن كل غازية غزت معنا يعقف بعضها بعضاً.

(১৯) وأن المومنين يبيء بعضهم علي بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

(২০) و ان المومنين المتقين علي أحسن هدي و أوقومه.
(২০-ب) وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه علي مومن.
(২১)وأن من اعتبط مومنا قتلا عن بينة فانه قودبه إلا أن يرضي ولي [بالعقل]، وأن المومنين عليه كافة، ولايحل لهم إلا القيام عليه.
(২২) و أنه لا يحل لكومن أقر بما في هذه الصحيفة و آمن بالله واليوم الاجر أن ينصر مثا ولا يوويه، وأن من نصره، أو آواه، فان عليه لعنة الله و غضبه يوم القيامة، ولا يوخذ منه صرف ولا عدل.
(২৩) وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مردّه إلى الله وإلى محمد.

(২৪) وأن اليهود بنفقون مع المومنين ما داموا محاربين.
(২৫) وأن يهود بني عوف أمة مع المومنين، لليهود دينهم و للمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم و أءم فانه لا يوتغ إلا نفسه و أهل بيته.
(২৬) وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
(২৭) وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
(২৮) وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
(২৯) وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
(৩০) وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
(৩১) وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم و أءم فان لا يوتغ إلا نفسه و أهل بيته.
(৩২) وأن جفنة بطن من بني ثعلبة- كأنفسهم.
(৩৩) و أن لبني الشطيبه مثل ماليهود بني عوف. و أن البر دون الإثم.
(৩৪) وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.
(৩৫) وأن بطانة يهود كأنفسهم.\
(৩৬) وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.
(৩৬ب) وأنه لا ينحجز علي ثأر جرح. و أنه من قتل فبنفسه فتك و أهل بيته إلا من ظلم. و أن الله علي أبر هذا.

Dhaka University Institutional Repository

(৩৭) وأن علي البهود نفقتهم وعلي المسلمين نفقتهم .وأن بينهم النصر علب من حارب أهل هذه النصح و النصيحة والبر دون الإءم.

(৩৭ ب) و أنه لم يأءم امرو بحليفه وأن النصر للمظلوم.

(৩৮) و أن يهود ينفقون مع المومنين ما داموا محاربين

(৩৯) و أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

(৪০) وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آءم

(৪১) وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

(৪২) وأنه ما كان بين أهل ذده الصحيفة من حدث أو اشتحار يخاف فساده فإن مرد إلي الله وإلى محمد رسول الله(صلي الله عليه و سلم) وأن الله علي أنأتقي ما في هذه الصحيفة و أبره.

(৪৩) وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها

(৪৪) وأن بينهم النصر علي من دهم يثرب.

(৪৫) و إذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فانهم يصالحونه و يلبسونه. وأنهم إذا دعوا إلي مثل ذلك فإنه لهم علي المومنين إلا من حارب في الدين.

(৪৫ ب) علي كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

(৪৬) وأن يهود الأوس، مواليهم و أنفسهم، وعلي مثل مالأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وأن البر دون الإءم. لا يكسب كاسب إلا علي نفسه وأن الله علي أصدق ما في هذه الصحيفة و آبره.

(৪৭) لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آءم. زأنه من خرج آمن و من قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأءم. و أن الله جارلمن بر و أتقي ومحود رسول الله(صلي الله عليه وسلم)

অনুবাদ:

পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. এ সনদ আল্লাহর নবী (রাসুল) মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসী, কুরাইশ, মুসলিম ও মদীনাবাসী মুসলিম এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের এবং যারা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের ও যাদের সাথে জিহাদের অংশ গ্রহণ করবে তাদের সাথে সম্পাদিত।
২. তারা সবাই মিলে সব মানুষ হতে আলাদা একটি উম্মত।
৩. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই মুহাজির কুরাইশরা নিজদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দির মুক্তিপণ দিবে।
৪. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূ'আওফ এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।
৫. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূল-হারিছ- এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।
৬. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূ সা'ইদা-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূ জুশাম-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৮. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূন-নাজ্জার-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৯. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূ 'আমর ইবন 'আওফ-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১০. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূন নাবীত-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১১. পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূল-আওস-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১২. বিশ্বাসীরা তাদের মধ্যকার কোন ঋণীব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবে না; বরং ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাকে মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণ পরিশোধের জন্য সাহায্য করবে।

১২খ. কোন মু'মিন অন্য মু'মিনের মাওলার সঙ্গে সেই মু'মিনের সাথে ছাড়া সহঅবস্থানের চুক্তি করতে পারবে না।

১৩. কোন মুসলিম যদি অপর মুসলিমের প্রতি অন্যায় করে বা অন্যায় করার চেষ্ঠা করে কিংবা তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, শত্রুভাবা পন্নহয় বা ক্ষতিসাধন করে তবে আল্লাহভীরু মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যাবে, সে দুষ্কৃতিকারী কারো সন্তান হলেও।

১৪. কোন মু'মিন কোন কাফেরের পক্ষে অপর কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না। কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. আল্লাহ'র নিরাপত্তা সামগ্রিক। সম্প্রদায়ের একজন নগণ্য সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাও যুক্তভাবে সবার জন্য পালনীয়। অন্য মানুষের বিপক্ষে এক মুসলিম অন্য মুসলিমের মাওলা বা সহযোগী।

১৬. যে সব ইয়াহুদী আমাদের অনুসারী হবে তারা আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে । এ সম্পর্ক ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন তারা মুসলিমদের ক্ষতি করবে না বা তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করবে না।

১৭. মুসলিমদের যে কোন শান্তি চুক্তি এক এবং সামগ্রিক। জিহাদের সময় কোন মুসলিম পৃথক ভাবে কোন চুক্তি করতে পারবে না। চুক্তিতে সবার জন্য পালনীয় শর্ত সমান হবে।

১৮. যে সব দল আমাদের সাথে জিহাদে গমন করবে (তাদের মধ্যে যাদের) অশ্ব নেই তারাও পালাক্রমে (অশ্বে) আরোহণ করতে পারবে।

১৯. আল্লাহর পথে যুদ্ধে কেউ প্রাণ দান করলে প্রত্যেক মু'মিন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে।

২০. আল্লাহভীরু মু'মিনরা উত্তম ও সঠিক পথ প্রদর্শক।

২০ ক. কোন মুশরিক কুরাইশদের কোন সম্পদ বা কোন লোককে আশ্রয় দিতে পারবে না বা কুরাইশরা কোন মুসলিমকে সাহায্যদান করলে তাতেও বাধা দিতে পারবে না।

২১. কেউ যদি মুসলিমকে হত্যা করে এবং তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তবে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা নিহত ব্যক্তির প্রতিনিধিরা রক্তমূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

মুমিনরা সব সময়ে হত্যার বিপক্ষে এবং কোন ক্রমেই তারা তার বিরোধিতা থেকে পিছপা হবে না।

২২. এ সনদের শর্তাবলীর প্রতি স্বীকৃতিদানকারী কোন মু'মিন যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে কোন হত্যাকারীকে[৯৯] সাহায্য করবে না বা আশ্রয়ও দিবে না। যদি কেউ এরূপ লোককে সাহায্য বা আশ্রয় দান করে তবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিরন তার উপর আল্লাহর রোষ। এর প্রতিবিধান হিসেবে কিছু গ্রহণ করাও হবে না বা এর কোন প্রতিকারও নেই।

২৩. যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ বাধে তবে তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা.) এর উপর সিদ্ধান্তের জন্য ন্যস্ত করবে।

২৪. যুদ্ধের সময় ইয়াহুদীরা মুসলিমদের সাথে সমভাবে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

২৫. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীরা মুসলিমদের সাথে এক সম্প্রদায়। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে এবং মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করবে। এ বিধান তাদের ও তাদের মাওয়ালীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। তবে যে অণ্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধু সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।

২৬. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ নাজ্জার গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৭. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ হারিছ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৮. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ সা'ইদা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৯. বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ জুশাম গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

৩০. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ আউস গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

৩১. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধুমাত্র সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।

৩২. বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য ঐ গোত্রের জাফনা শাখার জন্যও তা প্রযোজ্য।

৩৩. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ শুত্বান গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। অপরাধের বিনিময়ে কল্যাণ।

৩৪. ছা'লাবা গোত্রের মাওয়ালীরা ছা'লাবা গোত্রের মতই বিবেচিত হবে।

৩৫.বিত্বান গোত্রের মাওয়ালীরা বিত্বান গোত্রের মতই বিবেচিত হবে।

৩৬. মুহাম্মদ সা. এর বিনা অনুমতিতে কেহ উম্মাহ ত্যাগ করতে পারবে না।

---

৯৯ মুহদিছ অর্থ নতুন অপছনাদনীয় কোন কিছুর প্রবর্তক, যা সবা কাছে নিন্দনীয়। এখানে হত্যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্র. *সীরাতে ইব্ন হিশাম*, খ. ১-২, পৃ. ৬৯০-৬৯১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬ ক. প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে কাউকে বিরত রাখা হবে না। হত্যার অপরাধ হত্যাকারী ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে। তবে কেউ অত্যাচারিত হয়ে এ কাজ করতে বাধ্য হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

৩৭. ইয়াহুদীরা তাদের খরচ ও মুসলিমরা তাদের খরচ বহন করবেন। এ সনদে স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এ সনদে স্বাক্ষরকারীদের সাহায্য করবেন। এ উম্মার সদস্যদের মধ্যে এক অপরের জন্য কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও ভালো আচরন করবে, অপরাধ বা অন্যায় আচরণ করবে না।

৩৭ ক. কেউ তার হালিফ গোত্রের সাথে অসদাচারণ করতে পারবে না। মাজলুমের জন্য আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সাহায্য রয়েছে।

৩৮. যত দিন যুদ্ধ চলবে ততদিন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের খরচ বহন করবে।

৩৯. মদীনা উপত্যকা এ সনদে স্বাক্ষরকারী সবার জন্য পবিত্র।

৪০. প্রতিবেশী নিজেদের ন্যায়, যতক্ষণ না সে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করে।

৪১. কোন মহিলাকে তার পরিবারের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতিবেশীর ন্যায় আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

৪২. এই উম্মাহভূক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ন্যস্ত করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দারা এ সনদে সম্পূর্ণ রাজী।

৪৩. কুরাইশ ও তাদের যারা সাহায্য করে তাদের কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

৪৪. ইয়াছরিব (মদিনা) কে আকস্মাৎ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সনদে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাহায্য (আল্লাহর তরফ হতে)।

৪৫. যখনই তাদেরকে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে আহবান করা হবে বা চুক্তি মেনে নিতে বলা হবে তারা তা সম্পাদন করবে এবং মেনে নিবে। যতক্ষন তারা এরূপ কোন কিছুর দিকে মুমিনদেরকে আহবান করবে তখন মুমিনরা তাদের সে আহবানে সাড়া দিবে। তবে যারা দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত তাদের কথা ভিন্ন।

৪৫ক. পূর্বের ন্যায় প্রত্যেকেই স্বীয় অংশ পাবে।

৪৬. আউস গোত্রের উয়াহুদী ও তাদের মাওয়ালীসহ এই চুক্তিতে আবদ্ধ অন্যান্যদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হবে যদি তারা এ সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের সাথে ভাল আচরণ করে। কল্যাণ, প্রতিজ্ঞাপালন ও ভাল কাজ সব গুনাহের প্রতিবন্ধক। যদি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধ করে তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে। আল্লাহ অত্যন্ত ন্যায় ও সংগতভাবে এ দলিল পালন করবেন।

৪৭. এ দলিল জালিম ও অপরাদীদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না যারা অন্যায় ও বিশ্বঘাতকতা করে তারা ব্যতিরেকে যে বেরিয়ে যাবে সে নিরাপদ হবে আর যে মদীনায় অবস্থান করবে সেও নিরাপদে থাকবে। যে কল্যাণমূলক ও সম্মানজনক কাজ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ তার নিরাপত্তাবিধানকারী।"

মদীনা সনদের মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. মানব মর্যাদা লাভের অধিকার।
২. সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার।
৩. নারীদের স্বতন্ত্র অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সম অধিকার লাভের চেতনা।
৫. আত্ম মর্যাদা লাভের অধিকার।
৬. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার।
৭. শাসকের আনুগত্য লাভের অধিকার।
৮. ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার।
৯. জীবনের নিরা পত্তা লাভের অধিকার।
১০. সম্পদ লাভের অধিকার।
১১. হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি ও মানবাধিকার।
১২. বন্দিদের অধিকার।

এ সনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় মহানুভবতার বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে এ সনদে ইতিপূর্বে যা কোথাও লক্ষ্য করা যায় নি। অবাধে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইয়াহুদীদের কথা উল্ল্যেখ করে মহা নবী (সা.) বলেন "ওয়ালিল ইয়য়াহুদি দ্বীনুহুম ওয়া লিল মুসলিমিনা দ্বীনুহুম"। সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদীদের চরম বাড়াবাড়ি, ধর্মীয় সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে । মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতামূলক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এ সনদে তাদের অন্তর্তভূক্ত করে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছেন এবং তাদের নিজ ধর্ম যথাযথ ভাবে নির্বিঘ্নে পালন করার অধিকার প্রদান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সূরা ও আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ'র মনোনীত দীন 'ইসলাম'। সকলকে ইসলম গ্রহণ করা ইসলামের দাবী। এ জন্য মহানবী (সা.) সকলকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ বলেন, مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

এ সনদে নর হত্যা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তবে বৈধ ভাবে রক্তপণ আদায়ের গোত্রগত পূর্বের অধিকার বহাল রাখা হয়েছে।

এ সনদে মাতৃভূমি রক্ষার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রণীত হয়েছে। বহিঃশত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে তখন এ সনদের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম অমুসলিম সকলকে ঐক্য বদ্ধভাবে তা প্রতিহত করবে এবং সে সময় নিজনিজ গোত্রে যুদ্ধের ব্যয়ভার নিজেরাই বহণ করবে এ বিধান রাখা হয়েছে। আকিদা ও বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মীয় অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও একই কাতারে দাঁড়িয়ে মহানবী সা. এর নেতৃত্বে বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। মদীনাবাসী জনগণের বিভিন্ন ধর্মীয় ও গোত্রীয় কলহ থাকা সত্ত্বেও মহানবীর পক্ষ থেকে তাদেরকে আল্লাহর অসীম মেহেরনবানীতে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এটি মহানবী (সা.) এর বিরাট কৃতিত্ব। স্বদেশ রক্ষার জন্য উৎসাহিত করে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ[100] এ সনদ [redacted] পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বাস্তব নমুনা। মুসলমানদের সাথে ইয়াহুদ ও অন্যান্যের অন্তর্ভূক্ত দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের উদার নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। যার অনুকরণে আধুনিককালে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন অংগ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে।

---

১০০ আল-কুর'আন, ৮ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

সনদের অন্তর্ভূক্ত মুসলিম বা অন্য কোন গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রীসুত্রে আবদ্ধ সবাই মিলে একটি আলাদা জাতি হিসেবে বিবেচিত।

সনদের একটি বিশেষ দিক এই যে, আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দান করার জন্য সনদে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এ সনদের ভিত্তিতে মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের জন্য মদীনা একটি পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে। এ সনদের শর্তাবলীর পবিত্রতা রক্ষা, সনদে প্রদত্ত অধিকার ভোগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অত্যাবশক করা হয়েছে। গোত্র, বর্ণ, রক্ত-সম্পর্ক ও ভূখন্ডের সীমা রেখা পেরিয়ে সকলে একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করতে সক্ষম হয়েছে একমাত্র আল্লাহর রহমত ও মহানবী সা. এর প্রচেষ্টায়। একে অপরকে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হুদায়বিয়ার চুক্তিতে মানবাধিকার

হুদাইবিয়ার চুক্তি : হুদায়বিয়া মক্কা থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এর বর্তমান নাম ‘শমীসা’ বা ‘শুমাইসি’। ৬ষ্ঠ হিজরীতে(খ্রি. ৬২৮ সনে) অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অন্যতম ঘটনা। মহানবী (সা.) এবং মক্কার কাফিরদের মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার চুক্তি ইসলামের প্রচার- প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছে। মহানবী (সা.)- এর অসাধারণ নেতৃত্ব ও প্রজ্ঞার সম্মিলনে ইতিহাসের এই যুগান্তকারী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ১০ বছর কোন যুদ্ধ -বিগ্রহ না করার চুক্তিবদ্ধ হয় তদানিন্তন আরব বিশ্ব এবং এই চুক্তির মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আল্লাহর ঘর কা‘বা শরীফ যিয়ারত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে তাই এই মহান চুক্তি গৌরবোজ্জল পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল-কুর’আনে এই চুক্তিকে ‘ফাতহুম মুবীন’ বা সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই মহান চুক্তির ধারাবাহিকতায় ইসলামের উত্তরোত্তর প্রসার এবং সর্বোপরি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। হুদায়বিয়া চুক্তির মূল পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল।

بسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو‘ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض‘ على أنه من قدم مكة من اصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله‘ ومن قدم المدينة من قريش مجتازاالي مصر أو الى الشام يبتغي من فضل الله فهو أمن علي دمه و ماله‘علي انه من أتي محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم‘ ومن جاء قريشأ ممن مع محمد لم يردوه عليه.وان بيننا عيبه مكفوفه و أنه لا إسلال ولاإغلال.وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله.ومن احب أن يدخل في عقد قريش و عهدهم دخل فيه. وأنت ترجع عنا عامك هذا فلاتدخل علينا مكة‘وأنه إذاكان عام قابل‘ خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا‘ معك سلاح الراكب: السيوف في القرب‘ ولاتدخلها بغيرها"

آشهد على الصلح رجال من المسلمين و رجال من المشركين: ابوبكر الصديق‘ وعمر بن لخطاب‘
وعبدالرحمن بن عوف‘ وعبدالله بن سهيل بن عمرو‘ و سعدبن أبي وقاص و محمود بن مسلمة.
ومكرزبن حفص(و .....من امشركين
وعلى بن أبي طالب و كتب

“দয়াময় প্রভূর নামে। এ চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ও সুহাইল ইবনে আমর এর মধ্যে সম্পাদিত। উভয়ে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, তারা আগামী দশবছর যাবত কোন যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করবে না। এ সময়কালের মধ্যে মানুষ নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে ও একে অপরের উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। হজ্জ অথবা উমরা অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের সহচরদের মধ্য হতে যারা মক্কায় আগমন করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কুরাইশদের মধ্য হতে কেউ তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুহাম্মদের কাছে আসলে তাকে তার অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এবং মুহাম্মদের সহচরদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের কাছে আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। আমরা সবাই স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পালনে আন্তরিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের কারো দ্বারা খিয়ানাত বা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না যে কেউ তার ইচ্চানুযায়ী মুহাম্মদ ও তার দরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে আবার যে কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী কুরাইশ ও তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে।

(সুহাইল ইবন 'আমর কর্তৃক প্রস্তাবিত) আপনি এ বছর ফিরে যাবেন, আমাদের কাছে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আগামী বছর আমরা অপনাদের জন্য মক্কার বাইরে চলে যাব, তখন আপনি ও আপনার সহচরসহ প্রবেশ করবেন এবং তিন দিন অপেক্ষা করবেন আপনাদের সাথে শুধু মাত্র আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র থাকবে; তা হলো কোষবদ্ধ অবস্থায় তরবারী। এছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এই সন্ধিপত্রে মুসলমানদের মধ্য থেকে ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সাক্ষী থাকলেন তারা হলেন; আবু বকর সিদ্দিক, উমার ইবনুল খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবন আওফ, আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল ইবন 'আমর, সা'ঈদ ইবন আবী ওক্কাস, মাহমুদ ইবন মাসলামা এবং মুকার্‌রাজ ইবনে হাবস(তখন তিনি মুশরিক ছিলেন) এবং আলী ইবন আবী ত্বালিব। সন্ধিপত্রটির লেখক 'আলী ইবন আবী তালিব।'[১০১]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার
২. সামজিক নিরাপত্তার অধিকার।
৩. আর্থ- সামজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৪. আত্ম রক্ষা ও আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার।
৫. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কমপক্ষে দশবছরর যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা এ সন্ধির মাধ্যমে কার্যকর হয়। ফলে মুসলিমরা নিরাপদে নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচাররের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা নিরাপদে তাদের ব্যবসা -বাণিজ্যর কাজ চালাতে সক্ষম হয়। সন্ধির কারণে মক্কা ও মদীনার মানুষের মধ্যে আসা যাওয়া শুরু হয়। ইসলামের সাম্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে পড়লো। মহানবী সা. এর অনুপম আদর্শ ও চরিত্র-মাধুর্যে, তাঁর আন্তরিকতা ও মহানুভবতায় তারা আকৃষ্ট হলো।

১০১ মুসনাদে আহমদ, খ. ৪, পৃ. ৩২৫, হাদীস নং ১৮১৫২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তিসমূহে মানবাধিকার

‘আযরুহ’ ও ‘জারবা’ এর অধিবাসীদের সাথে মহানবী (সা.) এর চুক্তিপত্রে মানবাধিকারের চেতনা

আযরু ও জারবা আরব উপদ্বীপ ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবম হিজরীতে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুকের যুদ্ধাভিযানকালে এ এলাকার কয়েকটি জনপদের জনগণ ও শাসকবৃন্দ মহানবী সা. এর আনুগত্য স্বীকার করে জিয্ইআ প্রদানে সম্মত হলে মহানবী (সা.) তাদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। এবং তাদের জন্য পৃথক পৃথক চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। উত্তর আরবের খ্রীষ্টন গোত্রগুলির মধ্যে আযরুহ এবং জারবা অন্যতম। বাৎসরিক একশত দীনার করে জিযইয়া প্রদানের শর্তে মহানবী (সা.) তাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন। চুক্তিপত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب محمد النبي لاهل أذرح و ذربا انهم امنون بامان الله وأمان محمد و أن عليهم ماءة دينار فى كل [redacted]

رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بانصح والاحسان الى المسلمين و من الجأ من المسلمين من المخافة و

التعزير إذا خشوا على المسلمين فهم أمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجة.

‘দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ চুক্তিনামাটি আল্লাহ’র নবী ও রাসূল মুহাম্মদ -এর পক্ষ থেকে আযরুহ ও জারবা এর জনগণের জন্য সম্পাদিত। তাদের আল্লাহ ও মুহাম্মদের নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তারা (নিরাপত্তা কর জিয্ইয়া হিসেবে) প্রতি রজব মাসে একশ দিনার করে প্রদান করবে। মুসলিমদের সাথে সদাচারণ ও সহ অবস্থানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের জন্য জিম্মদার। মুসলিমদের প্রতি তাদের ভীতি থাকা অবস্থায় যদি কোন মুসলিম কোন ব্যাপারে অপর মুসলিমের অথবা শাস্তির ভয়ে তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহলে তার বের হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ (সা.) পরবর্তী কোন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য সব রকম নিরাপত্তা নিশ্চিত।”

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে: সামাজিক নিরাপত্ত লাভের অধিকার।
মাক্বরীযীর মতে ‘জারবা ও ‘আযরুহ’[১০২]’ গোত্রদ্বয়ের সাথে মহানবী (সা.) পৃথক পৃথক দুটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিপত্র দু’টির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب محمد النبي لأهل أذرح أنهم أمنون بأمان الله و أمان محمد و ان عليهم ماءة دينار فى كل رجب [redacted]

وافيه طيبة و الله كفيل عليهم بالنصح و الاحسان إلى المسلمين ومن لجأ من المسلمين من مخافة و التزير

إذا خشوا على المسلمين فهم أمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب محمد النبي لأهل جربا أنهم أمنون بأمان الله و أمان محمد و ان عليهم ماءة دينار فى كل رجب [redacted]

وافيه طيبة و الله كفيل

---

১০২ ‘আযরুহ’ অর্থ টিলা। সিরিয়ার উপকণ্ঠে, বালকান ও আম্মান পর্যন্ত বিস্তৃত আরব উপদ্বীপের সন্নিকটে অবস্থিত একটি পাহাড়ী জনপদ। মুজামুল বুলদান খ.১, পৃ. ১২৯-১৩০, ‘জারবা’ সিরিয়ার পাহাড়ী জনপদ আযরুহ এর একটি প্রসিদ্ধ অংশ্ মু’জামুল-বুলদান, খ.২, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এ চুক্তির মাধ্যমে উত্তর অরবের খ্রিষ্টান গোত্রগুলির উপর রোমান আধিপত্যের পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান বাহিনী ও তাদের মিত্রদের মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার ফলে আরব গোত্রগুলি মুসলিম বাহিনীর শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে তারা রোমানদের অধিনে থাকার চাইতে মুসলিমদের অধিনে থাকা শ্রেয় মনে করে। এবং মহানবী (সা.) এর সাথে জিয্ইয়া প্রদানের সম্মতিতে চুক্তি সম্পাদন করে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন -‘ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ‘তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু‘মিনবৃন্দ-যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।[১০৩]’ মুসলিম মুজাহিদরা বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা সত্তেও প্রতিকুল আবহাওয়ায় বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে গমন করে মহানবী সা. এর নির্দেশ পালন করতে যুদ্ধ ব্যাতিরেকেই মহান আল্লাহ উত্তরাঞ্চলের আরব গোত্রগুলিকে ইসলামের ছায়াতলে এনে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন[১০৪]’ -‘ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

আযরুহ ও জারবাবাসীদের জন্য এ চুক্তি প্রত্র সর্বপ্রথম তাদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও যিম্মাদারী গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। তারপর জিযইয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে জান ও মালের নিরাপত্তার অধিকার ।

আইলা -এর ইউহান্না ইবন রু‘বা এর সাথে মহানবী সা. এর চুক্তিপত্র :

আইলা’ লোহিত সাগরের উপকূলে মিসর ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর ‘আক্বাবায় অবস্থিত জর্ডানের একটি শহর।[১০৫]’ ‘আইলা বিনতে মাদ্উন ইবন ইবরাহীম (আ.) এর নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়। প্রসিদ্ধ ‘তুর’ পাহাড় এ শহরটির কাছে অবস্থিত। বর্তমানে এই এলাকাটি ‘আক্বাবা’ নামে প্রসিদ্ধ।[১০৬] প্রাচীন আইলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।
মহানবী (সা.) ‘আইলার’ প্রশাসক ইউহান্না ইবন রুবা ও সেখানকার নেতৃবৃন্দের সাথে একটি চুক্তি পত্র করেন । চুক্তি পত্রটি হচ্ছে-

إلى مرْ يحنة ين روْبة وسروات أهل آيلة.

سلم أنتم؛ فانى احمد اليكم الله الذي لا إله ألا هو؛ فإني لم أكن لأقا تلكم حتى أكتب إليكم، فأسلم أو أعط الجزية، وأطع الله و رسوله، ورسل رسوله، وأكرمهم، واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء(؟)، واكس زيدا كسوة حسنة فمهما رضيت رسلي رضيت، وقد علم الجزية، فإن أردتم أن يأمن البر والبر فأطع الله و رسوله. ويمنع عنكم كل حق كان للعرب و العجم الا حق الله و حق رسوله.وإنك ان رددتهم و لم ترضهمر لا آجذ منكم شيا حتى أقاتلكم فأسبي الصغير و أقتل الكبير، فاني رسول الله بالحق؛ أومن بالله و كتبه ورسله، وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة الله، وإني أو من به أنه رسول الله.

---

১০৩ আল-কুর’আন, ৫: ৫৫-৫৬
১০৪ আল-কুর’আন, ৩৩: ২৭
১০৫ আল-মুনজিদ ফিল- আ'লাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২
১০৬ মাকতুবাতে নাবাবী. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

واءت   قبل أن يمسكم الشر، فأني قد أوصيت رسلي بكم. أعط حرملة ثلاثة أوثق شعيرا و ان حرملة سفع لكم. وإني لو لا الله وذلك، لم أراسلكم سيا شيأ حتى ترى الجيش، وإنكم إن أطعتم رسلي، فإن الله لكم جار ومحمد ومن يكون منه. وإن رسلي شر جبيل وأبي وحرملة و حريث بن زيد الطاءي، فإنهم مهما قضوا عليه فقد رضيته، وان لكم ذمت الله. والسلام عليكم إن أطعتم،

وجهزوا أهل مقنا إلي أرضهم.

মুহাম্মদ (সা.) এর পত্রের আহবানে সাড়া দিয়ে আইলার শাসনকর্তা ইউহান্না ইবনে রু’বা মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। মহানবী (সা.) তার জন্য একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। চুক্তিপত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল।[১০৭]

بسم الله الرحمن الرحيم

و هذه أمنة من الله و محمد النبي رسول الله ليوحنة بن روبة، وأهل أيلة لسفنهم و لسياراتهم، ولبحر هم ولبرهم، ذمة الله و ذمة محمد النبي و لمن كسان معهم من كل مار من الناس، من أهل الشام واليمن و اهل البحر فمن أحدث حدثا فإنه لا يحل ماله دون نفسه، وأنه طيبة لمن أخذه من الناس ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردنها من بر أو بحر.

“পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে। এ নিরাপত্তাপত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মদ এর পক্ষ হতে ইউহান্ন ইবন রু‘বাহ এবং আইলা-এর জনগণের জল,স্থল, জাহাজ, ও পথিমধ্যে অবস্থানরত সবার জন্য সম্পাদিত। তাদের সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ এর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। সিরিয়া, ইয়ামান ও সাগরে অবস্থানরত জনগণের মধ্যে পথ আক্রমণকারী হিসেবে যারা তাদের সাথে অবস্থান করবে তাদের জন্যও এই নিরাপত্তা বিবেচিত। যে কেউ এই চুক্তি নামার বরখেলাপ করবে, তার জন্য কোন নিরাপত্তা থাকবে না। যে জলাধারের পাদদেশে তারা অবস্থান করবে সে জলাধারের পানি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে না এবং জল ও স্থলের কোন পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা হবে না।”[১০৮]

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ :

১. জান- মালের নিরাপত্তালাভের অধিকার।
২. অভিবাসনের অধিকার।
৩. আন্তর্জাতিক জলাদার অধিকার ।
৪. সামুদ্রিক আইনে মানবাবাধিকার।

ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে জিযইয়া প্রদানের সম্মতিতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। তাদের জনপদের জল ও স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং পথিমধ্যে ভ্রমণরত সবার জন্য সুস্পষ্টভাবে এ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চুক্তিপত্রের এই অংশটির গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ এ সুবিধা না পেলে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারতো , তদ্রুপ আইলাবাসীদের জন্যও উপার্জন সংকীর্ণ হয়ে পড়তো।

১০৭ সীরাতে ইবনে হিসাম, খ.২, পৃ. ৫২৫-৫২৬; জামহারতু রাসাইলিল ‘আরাব, খ.১, পৃ.৫১; মাজমুয়াতুল ওয়াছাইক্ব, পৃ. ৮৯, ত্বাবাক্বাত, খ. ১-২, পৃ.৩৭

১০৮ *সীরাতে ইবন হিশাম*, খ.২, পৃ. ৫২৫-৫২৬; জামহারাতুল রাসাইলিল-‘আরাব, খ.১, ৫১; মাজমু‘আতুল-ওয়াচাইক্ব,পৃ. ৮৯, ত্বাবাক্বাত, খ.১-২, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনেসমূহের মধ্যে পানি অন্যতম। তারা যে জলাধারের পাশে অবস্থান করবে সে জলাধারের পানি তাদের জন্য অবারিত করা হয়েছে। স্থল বা জলপথ তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের জন্য যে কোন মুহূর্তে যে কোন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের ফলে তাদের এ ব্যাপারে কোন প্রকার কড়াকড়ি করা হয় নি।

তাইমার বানু‘আদিয়ার ইয়াহুদীদের জন্য মহানবী সা. এর নিরাপত্তাপত্রে মানবাধিকার

তাইমা আরব উপদ্বীপের উত্তর ও দাওমাতুল-জান্দালের দক্ষিণে অবস্থিত একটি আরব জনপথ।[১০৯] মহানবী সা. এর সাথে মিলিত হয়ে জিয্ইয়া স্বরূপ বার্ষিক একটি নির্ধারিত কর প্রদানের সম্মতিতে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। মহানবী (সা.) এ জিয্ইয়ার বিনিময়ে তাদের জান মালের নিরাপত্তা দান করেন। নিরাপত্তা দলিলটি নিম্নে প্রদত্ত হল:[১১০]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لبني عاديا: ان لهم الذمةوعليهم الجزية، ولاعدّاء ولا جلاء، الليل مدّ و النهارشدّ.

وكتب خالدبن سعيد.

‘দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ -এর পক্ষ থেকে বানু ‘আদিয়া গোত্রের জন্য। তাদের যিম্মাদারী গৃহীত হলো এবং তাদের উপর জিয্ইয়া আরোপিত হলো । তারা কোন প্রকার শত্রুতা করবে না। বাসস্থান থেকে তাদের উৎখাত করা হবে না। এই চুক্তি কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না।” লেখক খালিদ ইবন সা‘ঈদ।

ইবনে হিশাম এর বর্ণনায় এসেছে, “পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ নামে। নিরাপত্তাপত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.) পক্ষ হতে ইউহান্না ইবন রু‘বাহ এবং আই‘লা এর জনগণের জল, স্থল, জাহাজ ও পথিমধ্যে অবস্থানরত সবার জন্য সম্পাদিত। তাদের সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ এর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। সিরিয়া ইয়ামেন ও সাগরে অবস্থানরত জনগণের মধ্যে পথ অতিক্রমকারী হিসেবে যারা তাদের সাথে অবস্থান করবে তাদের জন্যও এই নিরাপত্তা বিবেচিত হবে। যে জলাধারের পাদদেশে তারা অবস্থান করবে সে জলাধারের পানি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে না এবং জল স্থলের কোন পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা হবে না।”

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. সর্বত্র চলাচল ও অভিবাসনের অধিকার।
২. জান মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৩. আন্তর্জাতিক নদী তথা জলাধার লাভের অধিকার।
৪. আন্তঃযোগাযোগের অধিকার লাভ।

---

১০৯ আল-মুনজিদ ফিল-আ'লাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১১০ ই'লামুস-সাইলীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

মাক্বনাবাসীদের জন্য মহানবী (সা.) এর চুক্তিপত্রে মানবাধিকার

মাক্বনা আইলার সন্নিকটে অবস্থিত একটি ইয়াহুদী জনপদ।[১১১] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবম হিজরীতে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুকের যুদ্ধে গমন করলে যে সব গোত্র ও জনপদ ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় মাক্বনা তার মধ্যে অন্যতম। চুক্তিপত্রটির মূল পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله لإلي بني جنبة وإلي أهل مقنا

اما بعد فقد نزل عليّ آيتكم راجعين إلي قر يتكم ، فإذا خاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون، لكم ذمةالله وذمة رسوله، وإن رسوله غافر لكم سياتكم وكل ذنوبكم، وإن لكم ذمةاللهوذمة رسوله، لاظلم عليكم ولا عدى. وأن رسول الله جبر لكم مما منع منه نفسه. فأن لرسول الله بزّكم و كل رقيق فيكم والكراع والحلقه، إلا ما عفا عنه رسول الله، أو رسول رسولالله. وأن عليكم بعد ذالك ربع ما أخرجت نخلكم، وربع ما صادت عروككم، وربع ما اغتزل نساوكم. وانكم برءتم بعد من كل جزية أو سجرة. فأن سمعتم وأطعم، فأن على رسول الله أن يكرم كريمتكم ، ويفو عن مسيءكم أما بعد فإلى المومنين والمسلمين: من أطلع أهل مقان بخير له، ومن أطلعهم بشر فهو شرله.

وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم، او من اهل رسول الله. والسلام.

وكتب علي بن أبو طالب فى سنة تسع.

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে ।

আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ -এর পক্ষ থেকে বনূ জারবা ও মাক্বনাবাসীদের প্রতি।

অতপর, তোমরা তোমাদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছো বলে আমার কাছে খবর এসেছে। আমার এ পত্র যখনই তোমাদের কাছে পৌঁছবে, তখন থেকে তোমরা নিজদের নিরাপদ মনে করবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা প্রদান করা হল। আল্লাহর রাসূল তোমাদের সব রকম অন্যায়, অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য আল্লাহ রাসূলের যিম্মাদারী ঘোষিত হল। তোমাদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হবে না। আল্লাহর রাসূল নিজে যে সব বিষয় থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন, সে সব বিষয় হতে তিনি তোমাদেরকেও রক্ষা করবেন। আল্লাহর রসূল বা তার প্রতিনিধিবর্গ যে সব বিষয় তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যতীত তোমাদের তৈরী কাপড়, তোমাদের ক্রীতদাস, অশ্ব এবং তোমাদের লৌহবর্ম সবই আল্লাহ রাসূলের মালিকানাধীন থাকবে। তোমাদের খেজুর বাগানে যা উৎপন্ন হয়, তোমরা বড়শি দিয়ে যা শিকার কর এবং তোমদের স্ত্রীরা যা বুনন করে, তার সবকিছুর চার ভাগের এক ভাগ প্রদান করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। তোমারা সব রকম জিযইয়া কর ও দৈহিক শ্রম থেকে মুক্ত। তোমরা এসব নির্দেশাবলী মান্য করলে আল্লাহর রাসূল তোমদের সম্মান করবে এবং অপরাধীদের সব রকম অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। অতপর, বানূ জারবা ও মাক্বনাবাসীদের মধ্যে যারা মু'মিন ও মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যাবহার করবে তাদের জন্য ভাল এবং যারা খারাপ ব্যবহার করবে তাদের জন্য খারাপ হবে। তোমদের উপর স্বয়ং তোমাদের মধ্যকার লোক অথবা রাসূলুল্লাহর পরিবারবর্গের সদস্য ব্যতীত অন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করা হবে না।

---

১১১ আবূ আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু আহমদ আল আনসারী, *আল মিসবাহুল মুদ্বী*(বৈরূত: আলামুল কুতুব ,তা.বি.), খ.২, পৃ.৩১৭; মাকতুবাতে নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ সনদটি ‘আলী ইবন আবী তালিব নবম হিজরীতে লিখেছেন।[১১২]

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে-

১. জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের অধিকার। এর দ্বারা ইসলামের উদার নীতির প্রতিফলন ঘটে।
২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার। জিযইয়া আরোপ না করে উৎপাদিত দ্রব্যাদির এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ ছিল মহানবী (সা.) এর একটি অর্থনৈতিক পলিসি। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার নিশ্চিত করেন।

উকাইদির ও দুওমাতুল-জানদালের অধিবাসিদের জন্য মহানবী (স.) এর চুক্তি

মহনবী (সা.) নবম হিজরীতে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুকের যুদ্ধে গমন করলে উত্তর আরবের বিভিন্ন খ্রিষ্টান ও আরব গোত্র ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে। কিন্তু দুওমাতুর জান্দাল এর শাসক উকাইদির স্বেচ্ছায় ইসলামের আনুগত্য না করলে মহানবী (সা.) তাঁকে বন্ধী করে নিয়ে আসার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা সফলতার সাথে উকাইদিকে বন্দী করে মহানবী (সা.) এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহলণ করে যাকাত প্রদানে সম্মত হলে তাঁকে ও তাঁর এলাকার জনগণের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন। চুক্তিপত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১১৩]

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله، لا كدرحين آجاب الى الاسلام، وخلع لأنداد و لأصنام مع خالدبن الوليد سيف الله في دوماء تاجندل و أكنافها:

إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي و أغفال الأرض والحلقه و السلاح ةالحافر والحصن. واكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور. لا تعدل سارحاتكم، ولا تعدل سارحتكم، ولا تعد فاردتكم، ولا يحظر عليكم النبات. تقيمون الصلاة لوقتها و توتون الزكاة بحقها. عليكم بذلك عهدالله وميثاق. ولكم بذلك الصدق والوفاء

شهدالله ومن حضر من المسلمين

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এ সনদ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে উকাইদির- এর উদ্দেশ্যে লিখিত যখন তিনি সাইফুল্লাহ-খালিদ ইবন ওয়ালীদ- এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক স্থাপন ও মূর্তীপুজা ছেড়ে দিয়েছেন। এ সনদ দাওমাতুল জান্দালবাসীর জন্যও প্রযোজ্য।

‘তোমাদের আবাদি জমির বহির্ভুত জমি, অনুর্বর জমি, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, ভারবাহী পশু এবং দুর্গ আমাদের অধিকারে থাকবে। আর তোমাদের অধিকার থাকবে ওসব খেজুর গাছ, যেগুলো দুর্গের মধ্যে রয়েছে এবং পানির প্রবাহমান ধারাসমূহ। চারণভুমি হতে তোমাদের পশুকে বারণ করা হবে না। নির্দিষ্ট নেসাবের অধিক সংখ্যক পশু হলে যাকাত নির্ধারণের সময় তা গণনা করা হবে না। আর তোমাদেরকে শাক-সবজি উৎপাদনে বাধা দেয়া হবে না। তোমাদের সময়মত সালাত আদায় এবং

১১২ মাজমূ‘আতুল-ওয়াছাইক্ব, পৃ. ৯১-৯২; ফুতুহুল বুলদান, প্রগুক্ত, পৃ. ৫৮; তাবাক্বাত, খ. ১-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১১৩ ত্বাবাক্বাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.২৮৮-২৮৯; ফুতুহুল বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে। এগুলো পালন করলে তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তোমরা আমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার হকদার। আল্লাহ এবং উপস্থিত মুসলিমরা সাক্ষী।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ হচ্ছে:

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থায়ী স্বার্বভৌমত্ব লাভের অধিকার। এ অধিকার এর কথা বলা হয়েছে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন সম্পর্কিত "প্রাকৃতিক সংস্থানের উপর স্থায়ী সার্বভৌমত্ব" ঘোষণার ১ নং ও ৫ নং ধারায় "। উল্লেখ করা হয়েছে–

ধারা-১ "জনগোষ্ঠী এবং জাতিসমূহের নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংস্থানের উপর স্থায়ী সার্বভৌমত্বের অধিকার অবশ্যই তাদের জাতীয় উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনগনের মঙ্গলের স্বার্থে প্রয়োগ করতে হবে।[১১৪]

ধারা-৫ "সার্বভৌম সমতার বিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি পারস্পারিক সম্মানের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতির নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার স্বাধীন ও মঙ্গলজনক প্রয়োগের আরও প্রসার সাধন করতে হবে।[১১৫]

নাজরানের খ্রিষ্টান জনগণের সাথে মহানবী সা. এর চুক্তি পত্র

নাজরান ইয়েমেনের উত্তর পূর্ব কোনে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ জেলা। হামদান গোত্রের আরব খ্রীষ্টানরা এ এলাকায় বাস করতে। এ এলাকায় তাদের একটি বিরাট গীর্জাছিল। যাকে এরা কাবা তুল্য জ্ঞান করত। নাজরান ছিল আরব উপদিপের সবচাইতে বড় খ্রিষ্টীয় কেন্দ্র। রাসূল (সা.) নাজরানের প্রধান বিশপের নামে পত্র দিয়ে ছলিেন । পত্রটি হল " ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের উপাস্য প্রভূর নামে- অতঃপর আমি তোমাদেরকে বান্দার ইবাদত থেকে আল্লাহর ইবাদত পানে আহবান জানাচ্ছি। বান্দার শাসন থেকে আল্লাহর শাসনের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছি। যদি তোমরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও তবে জিযইা দিতে হবে। আর যদি তাতেও অস্বীকৃত হও তবে তোমাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম।'

এ পত্রখানা যখন পাদ্রীর কাছে পৌঁছল তখন পাদ্রী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পরলেন। পাদ্রী সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অভিমত নেয়ার জন্য পরামর্শ বৈঠক ডাকেন। পরামর্শ মোতাবেক হামদানী গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শারজীল ওয়াদ'আ, হিময়ারী গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে শারজীল, হারিসী গেত্রের জব্বার ইবনে কায়েস এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধ দলকে রাসূল (সা.) এর দরবারে পাঠানো হয় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য। নাজরানের প্রতিনিধি দল মদিনায় রাসূল (স.) এর দরবারে উপস্থিত হয় প্রতিনিধি দল রাসূল (সা.) এর দরবারে। ইবনে ইসহাক, কারয্ ইবনে আলকামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত প্রতিনিধি দলে ---- আরোহী ছিলেন, তন্মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন নাজরানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। দরবারে তাঁরা রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করে 'আপনার কথা মত ঈসা (আ.) যদি আল্লাহর পূত্র না হন, তাহলে তাঁর পিতা কে?' তাদের এই আলাপ আলোচনা কালে নাযিল হয় মুবাহালার নির্দেশ সর্ম্পিত কুরআনের আয়াত ' আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত। আদমকে তিনি মাটি দিয়ে বানিয়ে বললেন 'হও' অমনি সে হয়ে যায়। (হে নবী !) এটা প্রকৃতই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ

---

[১১৪] আবুল ফজল হক, *আর্ন্তজাতিক আইনের মূল দলিল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩১৩

[১১৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সংঘটিত সত্য ব্যাপার , সুতরাং তুমি তাতে সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভক্ত হয়ো না। এমন নিশ্চিত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও তোমার সাথে এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করে তাদেরকে বল : চল এ ব্যাপারে চূরান্ত ফায়সালার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে , আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে ডেকে এনে আমরা ও তারা সকলে এভাবে দু'আ করি যে, হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যকার মিথাবাদিদেরকে তুমি লা'নত বর্ষণ কর!।[১১৬]

এ আয়াতগুলো নায়িল হতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ কন্যা ফাতিমা (রা.) ও তার স্বামী আলী (রা.). এবং তাদের সন্তানদ্বয় হযরত হাসান হোসেনকে ডেকে এনে নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে বলেন,'এসো আমরা ও তোমরা নিজ নিজ পরিবারবর্গসহ আল্লাহর দরবারে দু'আ করি , হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার বাতিল পন্থিদেরকে তুমি লা'নত বর্ষণ কর!

খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলটি এরূপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুবাহালা অর্থাৎ এরূপ দু'আ করতে সাহসী হল না। তাদের একজন বললো, তিনি যদি সত্যি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন তাহলে এরূপ দু'আ করলে আমরা ধ্বংশের স্বীকার হব। তার চাইতে জিযইয়া করের বিনিময়ে তাঁর সাথে চুক্তি করাটাই শ্রেয় হবে। মুবাহালার (অভিশাপ বষর্ণের) ব্যাপারটি আর কার্যকর হল না। পরদিন প্রত্যুষে হুযুর (সা.) তাদের জন্য এ চুক্তিপত্রটি লিখলেন :
চুক্তিপত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১১৭]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما كتب محمد النبي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لأهل نجران؛ اذكان عليهم حكمه ثمرة، وفي كل صفراء و بيضاء ورفيق، فأفضل ذلك عليهم، ترك ذلك كله لهم، علي ألفي حلة من خلل الأواقي: في كل رجب ألف حلة، كتل حلة أوفيه من الفضة. فما زادت علي الخراج، أو نقصت عن الاواقي فبالحساب.وما قضوامن دروع،او خيل، أوركاب أو عروض أخذمنهم بالحساب.

وعلى نجران مونة رسي، ومتعتهم، ما بين عشر ين يوما فمادون ذلك، ولا تحبسي رسلي فوق شهر. وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا. اذا كان كيد باليمن علي رسلي, حتي يرده إليهم.

ولنجران حشيتها،جوارالله وذمة محمد النبي رسول الله علي اموالهم، وأنفسهم، وملتهم، وغاءبهم، وشاهدهم و عشيرتهم، وبيعهم و كل ما تحت أيديهم من قليل أوكثير. لا يغير أسقف من أشقفسته ولا راهب من رهبانته، وليس عليهم ربية، ولا دم جاهليةز ولا يحشرون ,، ولايعشرون، ولايطأأرضهم جيس. ونت شأل منهم حقا قينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين.

وما أكل منهم ربا من ذى قبل فلعتى منه بريءة، ولا يخذ رجل منهم بظلم أخرز وعلي ما في هذا الكتاب جوارالله، وذمة محمد النبي رسول الله، حتى يأتي الله بأمره، مما نصحوا وأصلحوا ما عليهم, غير مثقلين بظلم.

شهد أبوسفيان بن حرب، غيلان بن عمرو، ومالك بم عوف،نت بنى النصر، والاقرع بن الحابس الحنظلي، والمغيرة بن شعبة. وكتب لهم هذا الكتابعبدالله بن أبي بكر.

---

[১১৬] আল-কুরআন, ৩: ৫৮-৬১

[১১৭] মাজমু'আতুর ওয়াছাইক্ব,, পৃ.১৪১-১৪২; কিতাবুলে খারাজ পৃ.৪১; ফুতুহুল-বুলদান, পৃ.৬৫-৬৬; ত্বাবাকাত, খ. ১-২, পৃ.৩৫-৩৬; যাদুল মা'দ, খ. ২, পৃ. ৪০; জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, খ. ১, পৃ.৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে।
'আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ -এর পক্ষ থেকে নাজরানের অধিবাসীর সাথে সম্পাদিত এই চুক্তি। তাঁর উপরে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার ছিল তাদের প্রতিটি ফলমুল, স্বর্ণ-রৌপ্য, লৌহ, অস্ত্র-সস্ত্র এবং ক্রীতদাসসমূহের উপর। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করে তাদের এসব কিছুই প্রদান করেন এই শর্তে যে, তারা জিয্ইয়া স্বরূপ প্রতি বছর ২০০০টি পরিধেয় পোষাক (হুল্লাহ প্রদান করবে। ১০০০টি প্রত্যেক রজব মাসে এবং ১০০০টি সফর মাসে প্রদান করতে হবে। প্রতিটি পেষাকের মূল্য হবে এক উকিয়া রূপার মূল্যের সমান।[১১৮] যে ক্ষেত্রে প্রদেয় কর এই হিসেবের বেশী অথবা পোষাকের মূল্য এক উকিয়ার কম হবে সে ক্ষেত্রে তার যথাযথ হিসাব অনুযায়ী তার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। জিয্ইয়া স্বরূপ তারা যদি লৌহবর্ম, ঘোড়া, বাহন উঠ, এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে তাও উক্ত 'হুল্লাহ' হিসেবে তার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। নাজরান আমার দূতদের ২০ দিন অথবা তার কম সময়ের জন্য আশ্রয় দিবে। কোন ক্রমেই তাদের এক মাসের অধিক ধরে রাখা যাবে না। ইয়ামানে যদি যুদ্ধবিগ্রহ বিদ্যমান থাকে সে অবস্থায় আমার দূতদের ৩০টি লৌহ বর্ম, ৩০টি ঘোড়া ও ৩০টি উট ধার হিসেবে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। ধার স্বরূপ আমার দূত কর্তৃক গৃহীত এসব বর্ম, ঘোড়া ও উঠ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত কোন ক্ষয় ক্ষতি হলে তারা তা যথাযথোভাবে প্রত্যার্পণ করবেন আমি এ নিশ্চয়তা প্রদান করছি। নাজরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের প্রাণ, সম্পদ, সমাজ, তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত জনগণের, তাদের বাড়ী ও তার আসবাবপত্র , তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং তাদের অধীনে কমবেশী যা কিছু আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ ও তাঁর নবী ও রাসুল মুহাম্মদ- এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ঘোষিত হল। কোন বিশপকে তাঁর ধর্মীয় এলাকা থেকে, কোন ধর্মজাযককে তাঁর গীর্জা থেকে এবং কোন সাধুকে তাঁর মর্যাদা থেকে সরানো হবে না। সূদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। জাহিলী যুগের রক্তপণ বাতিল করা হলো। জোর পূর্বক তাদের কাউকে যুদ্ধ নেওয়া হবে না এবং তাদের থেকে 'উশরও আদায় করা হবে না। তাদের ভুখন্ডে কোন সৈন্য পদার্পণ করবে না। তাদের মধ্যে কেউ কোন অধিকার দাবী করলে কাউকে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত না করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর পর যে ব্যক্তি সূদী কারবার করবে, তার ব্যপারে আমার কোন যিম্মা থাকবে না। তাদের কোন ব্যক্তিকে অন্যের অপরাধে অপরাধী করা হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোন নির্দেশ না আসা অবধি এ চুক্তিপত্রের নির্দেশ ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনকারীদের জন্য আল্লাহর আশ্রয় ও তাঁর নবী ও রাসুল মুহাম্মদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত,যদি তারা অন্যায়ের বোঝা বহনকারী না হয়।
স্বাক্ষী : আবু সুফইয়ান ইবন হারব, গাইলান ইবন 'আমর, মালিক ইবন 'আওফ, আক্বরা'ইবন হাসিব আল-হানযারী ও আল-মুগীরা ইবন শু'বা।
লেখক : 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী বাকর।'

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে-

১) জীবনের নিরাপত্তালাভের অধিকার।
২) সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৩) ধর্মীয় অধিকার লাভের অধিকার।
৪) সূদ নিষিদ্ধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার।
৫) আর্থ- সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৬) ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার।
৭) সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৮) ন্যায় বিচার লাভের অধিকার।

[১১৮] এক উকিয়া ৪০ দিরহামের সমান। ফুতুহুল-বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

উসমান ও বাহরাইনের জনগণের সাথে মহানবী (সা.) এর চুক্তিপত্র

মহানবী (সা.) ‘উসমান ও বাহরাইনের জনগণের জন্য একাটি নিরাপত্তা পত্র সম্পাদন করেন। পত্রটির পাঠ নিম্নরূপ :

‘আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পক্ষ থেকে আল-আকাবার ইবন আব্দিল ক্বাউসের প্রতি। জাহিলী যুগে তারা যেসব অপরাধ বা কবীরা গুণাহ করেছে সে ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হল। তারা যে ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তা পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক। তাদের খাদ্য সামগ্রী, পরিবহন বন্ধ হবে না, প্রবাতিহ ও জমা থাকা বৃষ্টির পানি ব্যবহার তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে না। পরিপক্ষ অবস্থায় তদের ফসল কাটতে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে না। আল ‘আলাকের বাহরাইনের জল, স্থল, ও এর বাইরের এলাকা সমূহের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা হলো। আল-আলাকে বাহরাইনের জনগণ ‘আল-আলাকে সব রকম ক্ষতি, কষ্ট জুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে। এগুলোর দ্বারা তাদের উপর আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে না এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।

মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের অর্ন্তভূক্ত করবেন। তাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করবেন এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে। এ আদেশ উভয় পক্ষের কারো জন্য পরিবর্তনযোগ্য নয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল স্বাক্ষী।”

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

(ক) জীবনের অধিকার।

(খ) আন্তর্জাতিক পানির অধিকার।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদলাভের অধিকার।

(ঙ) যুদ্ধনীতিতে মানবাধিকার।

(চ) সম্পদের নিরাপত্তা লাভেল অধিকার।

(ছ) সম্মান লাভের অধিকার।

মুকাওকিসের সন্ধি

মুকাওকিস ও মুসলিম বাহিনীর সিপাহ সালার আমের ইবনুল আসের মধ্যকার চুক্তির দফাগুলো হল:

১. আমাকে এবং কিবতী সম্প্রদায়ের সকলকে এ মর্মে পূর্ণ অভয় দেয়া হোক যে আমাদের ধর্ম, ইজ্জত-আব্রু ও জানমালের কোনরূপ ক্ষতি করা হবে না।

২. আমরা আপনার পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবো; বিনিময়ে বাচ্চা, বুড়ো ও নারীদের ছাড়া আমাদের সকলে মাথাপ্রতি দুই আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা কর পরিশোধ করবো।

৩. কায়সার আমার সন্ধির অবমাননা করেছেন। তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন এবং আমাকে অপদস্ত করেছেন। আপনারা কোনক্রমেই তার সারেথ চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না। তাতে আমাদের সমূহ ক্ষতির আশাংকা রয়েছে।

৪. আমার মৃত্যুর পর আলেকজান্দ্রিয়ার ‘আবী জানাশ’ নামক স্থানে আমাকে সমাহিত করতে দিতে হবে।

এখানে মানবধিকারের চেতনা হচ্ছে:

(১) ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

(২) মর্যাদা লাভের অধিকার।

(৩) নারী, শিশু ও বৃদ্ধ এর বিশেষ অধিকার।

উল্লেখ্য হযরত আমর ইবনুল 'আস (র.) এ সমস্ত শর্ত মেনে নেন এবং হিজরী ২০/২১ সালের মধ্যেই গোটা মিসর মুসলিমদের পদানত হয়। মুকাওকিস নবী করীম (স.) এর নবুওতের সত্যতার স্বীকৃতি দান, তাঁর দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নবীর দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ এবং মুসলিম অধিপত্য বরণ করে নেয়া সত্ত্বেও যে রাজত্ব হারাবার ভয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইলেন তাও অচিরেই তার হাত ছাড়া হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হল।[১১৯]

আমর ইবন মুররা জুহানীর সম্প্রদায়ের চুক্তি হল।[১২০]

বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম ।

'এ লিপিটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁকে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব দান করেছেন। আমর বিন মুররা জুহানীর তাঁর জমি জমার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। তিনি যেখানে ইচ্ছা তাঁর গবাদি পশু চরাবেন এবং সেগুলোকে পানি পান করাবেন। তবে শর্ত হলো, তার গবাদি পশুগুলোর নির্দিষ্ট যাকাত তাঁকে আদায় করতে হবে। কৃষি কার্যে ব্যবহার্য পশুতে কোন যাকাত নেই।

এই চুক্তিপত্রের ব্যাপারে আল্লাহ এবং মুসলমানগণ সাক্ষী রইলেন।'

(সীলমোহর)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে:

(১) আর্থ- সামাজিক নিরাপত্তা।

(২) সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার।

বানু যামরার সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মৈত্রীচুক্তি

মক্কা থেকে স্থল পথে যে কাফেলা চলার সুদীর্ঘ পথটি সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশের দিকে চলে গেছে, বনু যামরা গোত্রটির আবাস স্থল এ মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত ছিল। এটা ছিল বড় এবং জনবহুল গোত্র। মদীনা থেকে একশ ত্রিশ মাইল দুরে লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে এ স্থানটি অবস্থিত রাস্তাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ জন্যই এ মহাসড়কের দুই পাশে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) মৈত্রীচুক্তি করে রেখেছিলেন। সেসব চুক্তির কোন কোনটিতে স্থায়ী মৈত্রী এবং কোন কোনটিতে পারস্পারিক সামরিক সাহায্য দানের অঙ্গীকারেরও উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন কোন চুক্তিতে কেবল নিরপেক্ষ এবং শত্রুদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার অঙ্গীকার টুকুই রয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় (৬৩২) খ্রি. শুরুর দিকে সফর মাসেই হুযুর (স.) বানু যামরার নিকট থেকে যুদ্ধ নয়, মিত্র রূপে থাকার অঙ্গিকার আদায় করে নেন। মৈত্রীচুক্তিটি ছিল এরূপ :

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এলিপিটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বানু যামরার প্রতি।

---

[১১৯] রাসূলুল্লাহর পত্রাবলী : সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ/৮৭

[১২০] কানযুল উম্মাল এর বরাত রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ২২৫-২২৮; মাকতুবাতে নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

(১) তারা জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করেবে।
(২) তাদের প্রতি যে কোন বহিরাক্রমনের মুকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা হবে।
(৩) আল্লাহর নবীর সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের জন্য জরুরী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর নবী যখনই তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান জানাবেন তখনই তারা সাহায্য দানে বাধিত ধাকবে তবে ধর্ম যুদ্ধে সাহায্য করা তাদের জন্য জরুরী হবে না।
(৪) তারা যতদিন চুক্তির উপর প্রতিষ্টিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের সাহায্য সহোযোগিতা করা হবে।
(৫) এ চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ, তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী রইলো।'

এখানে মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে:

(১) জান ও মালের নিরাপত্তার অধিকার।
(২) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

উল্লেখ্য যে, এ মর্মে আরো কয়েকটি চুক্তি বানু যামরার প্রতিবেশী গোত্রের সাথেও হয়েছিল। এসব চুক্তির পাঠ প্রায় একইরকম।[১২১]

তায়েফবাসী ছাকীফ গোত্রীয়দের সাথে রাসূল সা. এর চুক্তি

তায়েফ ছিল বিত্তবান কুরেশদের গ্রীষ্মনিবাস। মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত জাবালুস সারাত পাহাড়ে সমুদ্রস্তর থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত শীতল ও সবুজ শ্যামল এই শহরটি তার সৌন্দর্য, উর্বরতা ও বাগবাগিচার প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। এই তায়েফ বাসিরা রাসূল (সা.) কে হিযরতের প্রাক্কালে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার অপরাধে পস্তরাঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। হযরত আয়েশা কর্তৃক প্রশ্ন করা হয়েছিল হে রাসূল (সা.) আপনার জীবনে সবচেয়ে কঠিন দিন কোনটি ?" তার জবাবে রাসূল স. বলেন 'সেই সবচেয়ে কঠিন দিনটি ছিল, তায়েফের দিন'।[১২২] মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে যখন তায়েফের আশেপাশের শহরের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তায়েফ বাসীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসলে রাসূল (সা.) মসজিদে নববীতে তাদেরকে স্বাগত জানালেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে প্রতিনিধি দলের সাথে চুক্তি করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন আবদে ইয়ালীল, হাকাম ইবনে উমর বিন ওহাব, শারজীল ইবনে গায়লান, উসমান ইবনে আবিল 'আসআওস ইবনে বাহায ইবনে খারশা। প্রতিনিধি দল ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মধ্যে মধ্যমরূপে আলাপ করার দায়িত্ব পালন করেন খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স (রা.)। তিনি উভয় শিবিরে যাতায়াত করে তাদের মত বিনিময় করতেন এবং তাঁর হাতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এ চুক্তি পত্রটি লিখিত হয়।[১২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে আলাপ আলোচনা করে তায়েফ বাসিরা উক্ত প্রতিনিধিদল আনুগত্যের জন্য কয়েকটি পূর্ব শর্ত পেশ করে : (১) তাদের লাত দেবতাকে তিন বছর পর্যন্ত ধ্বংশ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) সরাসরি নাকচ করে দেন। (২) তারা নামায থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। তাতে হুযুর (সা.) অসম্মতি জানিয়ে বলেন : 'যে- দীনের মধ্যে সালাত বা নামায নেই , তাতে কোন

[১২১] বিস্তারিত তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খ.৩, পৃ ২৪; দ্র. মকতুবাতে নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২-৮৩
[১২২] বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৮
[১২৩] আসাহ্হুস্ সিয়র, পৃ. ৪০৬, ৪০৭; বাংলা ভাষ্য, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮, ইফাবা প্রকাশিত ১ম মুদ্রণ ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ নেই'। (৩) আবদে ইয়ালিলের পুত্র কিনান রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে আবেদন জানায় ' আমাদেরকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। কেননা এছাড়া আমাদের গতি নেই।" জবাবে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন। তার ফরমান হচ্ছে : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا -" ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১২৪] (৪) সে আবার বলল "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে সূদের অনুমতি দিন।' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : আসল পুঁজি তোমাদেরই থাকবে। তা তোমরা নিয়ে যাও কিন্ত অতিরিক্ত গ্রহণ আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি ফরমান " لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا "'তোমরা সূদ খেওনা।"[১২৫] (৫) সে আবার বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের কে মদ্য পানের অনুমতি দিন। কেননা এতো অমাদের ভুমিরই নির্যাস। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এটা হচ্ছে শয়তানী বস্তু। হারাম ও নাপাক। আল্লাহ স্বয়ং একে অপবিত্র বলে ঘোষণা করে বরেছেন-إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ "মদ এবং জুয়া অপবিত্র শয়তানের কাজ।"[১২৬]

রাসূলূল্লাহ (সা.) এরূপ জবাব শুনে মজলিশ থেকে উঠে বাইরে গিয়ে সলাপরামর্শ করে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, আল্লাহর রাসূল যা বলেন তা'ই শিরোধার্য করে নিতে হবে। নতুবা আমাদের অবস্থাও মক্কাবাসীদের মত হবে। শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২৭]

(৬) তাদের আর একটি আবদার ছিল, তায়েফকে যেন হেরেম' এর মর্যাদা দেয়া হয়। চুক্তিপত্রে তার স্বীকৃতি রয়েছে।

তায়েফ বাসীদের সাথে চুক্তি পত্রটি নিম্নরূপ:[১২৮]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(১) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে ছকীফ গোত্রের জন্য লিপি-

(২) এ পত্রের লিপিতে লিপিবদ্ধ বক্তব্যের য়িম্মাদারী একক লা-শরীক আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী ও আব্দুল্লাহর পূত্র মুহাম্মদের উপর বর্তাবে।

(৩) ছকীফের গোটা উপত্যকাই 'হেরেম' (আল্লাহর সম্মানে সম্মানিত নিষিদ্ধ এলাকা)। সেখানকার বন্য, কাঁটা জাতীয় বৃক্ষ কাটা, সেখানে শিকার করা, যুলুম, চুরি এবং যাবতীয় অপকর্ম নিষিদ্ধ।

(৪) ওজ- উপত্যকায় ছকীফদেরই হক সবার্ধিক। তায়েফ ভুমিতে সামরিক অভিযান চালানো যাবে না। কোন মুসলিম বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসিদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। তারা নিজেরা তাদের তায়েফ উপত্যকায় যা ইচ্ছা তাই করবে, যেমন ইচ্ছে ইমারত নির্মাণ করবে।

(৫) পশু-পাখীদের যাকাত আদায়ের জন্য তাদেরকে তাহশীলদারদের নিকট সমবেত হতে হবে না।

(৬) তাদের নিকট থেকে উশর আদায় করা হবেনা।

(৭) তাদেরকে যুদ্ধে যেতে হবে না বা তাদের থেকে যুদ্ধ কর নেয়া হবে না।

---

[১২৪] আল-কুর'আন, ১৭ : ৩২

[১২৫] আল-কুর'আন, ৩: ১৩০

[১২৬] আল-কুর'আন, ৫ : ৯০

[১২৭] আসহহুস সিয়র, প্রাগুক্ত, পৃ. বাংলা, ৪৪৭-৪৫০/ আরবী ৪০৬-৪১০

[১২৮] কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ(মৃত্যু ২২৪ হি. পৃ. ১৯৪-১৮৫(মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারীয়া, কায়রো ১৪০১ হিমুদ্রণ), তাবাকাতে ইবনে সা'াদ, খ-৩, পৃ.৩৩ ও ৫৩; মাকতুবাতে নবভী সাইযদ মহবুব রিযভী, পৃ. ২৩২-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

(৮) তারা মুসলমানদের একটি জামায়াতরূপেই গণ্য হবে এবং মুসলমাদের মধ্যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে।

(৯) কেউ তাদের এলাকায় বন্দী হলে, তার ব্যাপারে তাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।

(১০) রেহেন-বন্দকী বাবদ তাদের যা দেনাপাওনা আছে এবং তার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে তা এখনি পরিশোধ্য এবং যার মেয়াদ ওকায মেলা পর্যন্ত, তা তখন পর্যন্ত পরিশোধ্য, আর সূদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ সূদ বাবদ পাওনা নেয়া যাবে না।

(১১) তায়েফ বাসিদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের সমূদয় পাওনা তারা পাবে।

(১২) তায়েফীদের কোন আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ যদি আমানত দারের নিকট বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা মালিকের পাওনা হবে।

(১৩) ছাকীফ গোত্রের অনুপস্থিত লোকেরাও এই নিরাপত্তার অধিকার লাভ করবে। তাদের যে সম্পদ 'লাইয়াতে' রয়েছে সেগুলো 'ওজ' এর সম্পদের মতই সম্মানিত, অনতিক্রম্যও সুসংরক্ষিত (হারাম) বলে গণ্য হবে।

(১৪) তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র, ও সমব্যবসায়ীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাও এসব অধিকার লাভ করবে।

(১৫) ছাকীফ গোত্রের জানমালের উপর কোনরূপ যুলুম করতে পারবে না।

(১৭) তাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তারা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলতে পারবে।

(১৮) তাদের আমীর তাদের মধ্য থেকেই হবে- বনি মালিকের আমীর বনী মালিক গোত্র থেকে, আর বনী অখলাফের আমীর বনি আখলাফ থেকে হবে।

(১৯) ছকীফ গোত্রের যে সব লোক কুরাইশদের আঙ্গুর বাগানে পানি সিঞ্চন করে থাকে, ফসলের অর্ধেক তাদের পাওনা হবে।

(২০) বন্দকী জিনিষের বিনিময়ে সূদ নেয়া যাবে না। বন্দক ছুটিয়ে নেয়ার সামর্থ থাকলে দেনা পরিশোধ করে তা এখনই ছুটিয়ে নেবে, নতুবা আগামী বছরের জুমাদাল উলা পর্যন্ত তা শোধ করে দেবে। আর যে ব্যক্তি মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সত্তেও পাওনা পরিশোধ করলো না, সে যেন তাকে সূদ বানিয়ে নিল।

(২১) ছকীফ গোত্রীয়দের কাছে যাদের পাওনা আছে, তারা কেবল আসল পাওনাই ফেরত পাবে।

(২২) তাদের কাছে যদি এমন কোন বন্দী বা ক্রীদাস থাকে- যাকে তার মুনিব বিক্রি করে দিয়েছে, তা হলে তার সে বিক্রি বিশুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে সব বন্ধীকে বিক্রি করা হয় নাই, তাদের মুক্তিপণ হবে ছয়টি উটনী যা দুটি কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।

(২৩) যে ব্যক্তি কোন বস্তু কয়েদ করেছে, কেবল সেই ঐ বস্তু বিক্রির হকদার।

সীলমোহর
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

(১.) সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
(২.) আদিবাসীদের অধিকার।
(৩.) বিশ্ব পরিবেশ অধিকার।
(৪.) সম্পদ লাভের অধিকার ।
(৫.) আর্থসামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
(৬.) বন্দিদের অধিকার।
(৭.) দাস-দাসী ও শ্রমিকের অধিকার।
(৮.) মালের মালিকানা লাভের অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

বাহরায়নের প্রতিনিধিদলের সাথে চুক্তিপত্র

বাহরাইনের অপর এক গ্রোত্রপতি আকবর বিন আব্দুল কায়স তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। চুক্তিপত্রটি মূল টেক্স নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহ হিররাহমা নিররাহীম

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর (স.) এর পক্ষ থেকে আকবর ইবন আব্দুল কায়েসের নামে-

(১) জাহেলিয়াতের যুগে তারা যে সব ফিৎনা ফ্যাসাদে অংশ গ্রহণ করেছে, বা অপকর্ম করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তবে আগামীতে তাদের অঙ্গিকার মেনে চলতে হবে।

(২) রসদ ও শষ্যাদি সরবরাহে তাদেরকে প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখা হবে এবং ফলমূল উৎপাদনের মওসূমে তাদেরকে বিব্রত করা হবে না।

(৩) বৃষ্টি থেকে পানি ব্যাবহারের তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

(৪) আলা বিন হাযরামী রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে। নাজরান বাসীও তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে বাধ্য ধাকবে।

(৫) মুসলিম বাহিনী যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল তাদেরকে অংশ দিতে এবং তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করতে বাধ্য থাকবে। জিহাদের সময়ও তাদের প্রতি ন্যায্য ও সুসম আচরণ করা হবে।

(৬) উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই এই চুক্তি মধ্যে কোনরূপ রদবদল করতে পারবে না। বা এই চুক্তি থেকে কোন পক্ষই সরে দাঁড়াতে পারবে না।

(৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই চুক্তিনামায় সাক্ষী রইলেন।

সীলমোহর

(মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ)

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ :

১. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।
২. আর্থ-সামাজিক অধিকার।
৩. আন্তর্জাতিক জলাধার তথা বিশ্ব পরিবেশের অধিকার।
৪. ন্যায় বিচার লাভের অধিকার।
৫. যুদ্ধনীতিতে মানবাধিকার।

খালিদ ইব্ন যিয়াদ আল-আবুদীর নামে ফরমান পত্র।[১২৯]

ফরমান পত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হল:

বিসমিল্লাহির রাহমনির রাহীম।

খালিদ বিন যিয়াদ যে ভূ-সম্পদসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই মালিকানাধীন থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাঁকে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে হবে- যার কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল। তাঁকে নামায পরতে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে, রমযানে রোজা রাখতে হবে, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করতে হবে। কোন নতুন কথা সৃষ্টিকারী (বেদ'আতী) কে তিনি আশ্রয় দিতে পারবেন না। ইসলামের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করা চলবে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। আল্লাহর বন্ধুদেরকে বন্ধু এবং শত্রুদেরকে শত্রু জ্ঞান করতে হবে। নবী মুহাম্মদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে যে, তিনি যেন তাঁর এমনি হিফাযত করেন যেমনটি নিজের জানমাল ও পরিবার পরিজনের তিনি করে থাকেন।

---

[১২৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১, মাকতুবাতে নদভী, সাইয়েদ রিযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

খালিদ আল- আবুদীর জন্য আল্লাহ্ ও নবী মুহাম্মদের উপর যিম্মাদরী রইলো- যাবৎ না খালিদের পক্ষ থেকে কোনরূপ অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পাবে।

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ

এখানে মানবাধিরের চেতনাসমূহ:

১) ভূ-সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

২) ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার।

৩) সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

বনী গাদিয়ার ইয়াহুদীদের নামে রাসূলুল্লাহর (স.) এর ফরমান চুক্তিপত্র।[১৩০]

বিসমিল্লাহির রাহমানি রাহীম

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বনূ গাদিয়ার ইহুদীদের প্রতি

(১) বনু গাদিয়ার ইহুদীদের যিম্মাদারী গ্রহণ করা হল।

(২) তাদের উপর জিযইয়া ধার্য করে দেয়া হল।

(৩) এরা রাসূলের কোন প্রকার অবাধ্যতা করবে না।

(৫) তাদেরকে তাদের বাড়িতে ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।

(৬) কোন কিছুই এ চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে না।

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ হচ্ছে:

১.বাসস্থানের অধিকার।

২. বাস্তু হাড়া না হওয়ার অধিকার।

৩. শরণার্থীদের অধিকার।

৪. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

ইয়ামেনের গর্ভনর আমর বিন হাযম আনসারীর নামে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আহবানে হারিস গোত্রে প্রতিনিধিদের সাথে চুক্তি পত্র

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে এই লিপি আমর ইবনে হাযম আনসারীকে ইয়েমেনে প্রেরণকালে প্রদত্ত হল।

আল্লাহ তা'লার ইরশাদ 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা তোমাদের সন্ধিচুক্তি অঙ্গীকারদি পালন করবে।[১৩১] আমি তাকে সর্বব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করার জন্যে তাগিদ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহতা'আলা তাদের সাথে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা কর্মশীল।[১৩২] আমি আমার হাযমকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার হক উশুল করেন, লোকের সাথে সৎ ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন। তাদেরকে কুর'আন শিক্ষা দেন এবং দীনের আহকাম আরকান বুঝিয়ে দেন। কুর'আন শরীফ কেবল পাকসাফ ব্যক্তিই স্পর্শ করতে পারবে। লোকজনকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে হবে। তাদেরকে তাদের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সর্বশ্রেণীর লোকদের প্রতি সদাচারণ করবেন, যাতে করে তারা দীনের

[১৩০] তাবাকাতে, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৯; ই'লামুস সা-য়িলীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

[১৩১] আল-কুর'আন, ৫:১

[১৩২] আল-কুর'আন, ১৬: ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

বিধিনিষেধ উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। গোত্র ও বংশের দোহাই দিয়ে কেই কাউকে তার পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করবে না। সাহায্য হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থলে কেবল গোত্র ও বংশের খাতিরে স্বপক্ষে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করে, এমন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিহ্ন করে দেয়া উচিত। যুদ্ধের দাওয়াত হবে কেবল আল্লাহর জন্য। যে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান স্বেচ্ছায় সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করে সে মুসলিম। অন্য দশ মুসলিমের যে অধিকার ও কর্তব্য ,তা তার জন্যে এবং তার উপরও বর্তাবে।

যে ব্যক্তি তার ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ধর্মে অবিচল থাকে, তাকে কোনমতেই তার ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য তাদের প্রত্যেক পূর্ণ বয়ষ্ক ব্যক্তির উপর ১ দীনার হারে জিযইয়া ধার্য হবে যা বছরে একবার মুদ্রায় বা দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে আদায় করতে হবে। সমমূল্যের বস্ত্র দ্বারাও তা আদায় করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে সে আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের শত্রুরূপে গণ্য হবে। আল্লাহর অসীম রহমত ও বরকত মুহাম্মদের প্রতি বর্ষিত হোক।

(সীলমোহর)

মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ :

১. শিক্ষার অধিকার।
২. মর্যাদা লাভের অধিকার।
৩. জীবনের নিরাপত্তা লাভে অধিকার।
৪. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
৫. ধর্মীয় নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

বানূ দারমার[১৩৩] সাথে চুক্তি পত্র

চুক্তি পত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল :

بسم الله الرحمن الرهيم

هذا كتاب من محمد رسول الله' لبني ضمرة:

با نهم امنون على اموالهم و أن لهم النصر على من رامهم' الا ان يحاربوا في دين مابل بحر صوفة.

وان النبي ادا دعاهم لنصره اجابوه.عليهم بذ لك ذمةالله وذمةرسوله.ولهم النصر على من برمنهم وأتقى.

'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ -এর পক্ষ থেকে 'বানূ দামরা' গোত্রের সদস্যদের জন্য এ সনদ ঘোষিত হচ্ছে যে, তারা অনাদিকালের জন্য তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপার ব্যতিরেকে তারা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে তারা সাহায্য লাভ করবে । আর নবী (সা.) সাহায্যের জন্য তাদের আহবান করলে তারা সে আহবানে সাড়া দিবে। এর বিনিময়ে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে। তারা তাদের মধ্যে উত্তম, চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করবে।'[১৩৪]

---

[১৩৩] বানূ দামুরা : মদীনার পশ্চিমে আবওয়া নামক স্থানের সন্নিকটে বসবাসরত কিনানা গোত্রের শাখা। সরকার কাঠামো, পৃ.১০

[১৩৪] মাজমু'আতুল-ওয়াসাইক, পৃ.২২০; তাবাকাত, খ.১-২, পৃ. ২৭; জামহ্বানাতু রাসাইল-'আরাব, খ.১, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. জান মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

২. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

বানু আদিয়া' এর জনগনের উদ্দেশ্যে প্রণীত নিরাপত্তা দলিল

নিরাপত্তা পত্রটির পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হল:[১৩৫]

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ দলীল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে বানু আদিয়া - এর সদস্যদের জন্য সম্পাদিত। তাদের পুরোপুরি নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তারা জিযইয়া প্রদান করবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। এবং তাদের বসতবাড়ি হতে উৎখাতও করা হবে না। অনাদিকালের জন্য এ চুক্তি বলিষ্ঠভাবে বিদ্যমান থাকবে।

লেখক : খালিদ ইবন সা'ঈদ ।

এখানে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ:

১. সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার।

২. নিষ্ঠুরতা থেকে বেচে থাকার অধিকার।

৩. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ না হওয়ার অধিকার।

---

[১৩৫] ই'লামুস-সাইলীন, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী মানবাধিকারের প্রকৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী মানবাধিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক রূপায়ন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী মানবাধিকার

প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুর'আনে মানবাধিকার ঘোণষা হয়েছিল। প্রাক ইসলামী যুগের বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি বা আচার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং মানুষের বিভিন্ন অধিকার ঘোষণা করে। ইসলামী মানবাধিকার আল্লাহ প্রদত্ত। এই অধিকার কোন অবস্থাতেই স্থগিত করা যাবে না কোন জরুরী অবস্থায়। কোন বিধি নিষেধ এর উপর আরোপ করা যাবে না। এই অধিকারগুলো বিশ্বের সকল মানুষের। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী আইন সকল মুসলমানের জন্য একটি পূণাঙ্গ বিধান।[১]

মানবাধিকার সংক্রান্ত আলোচনা যেমন প্রাচীন তেমন আধুনিক। সমস্যাটি প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকেই উদ্ভুত এবং আমাদের যুগেও অব্যাহত। বিষয়টি উদ্ভব ঘটেছে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। কেননা মানুষের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনই হলো দেশে দেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি, ও সমৃদ্ধির স্বাভাবিক সোপান। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পরম সম্মানিত ও সকল সৃষ্টির সেরা প্রাণী। মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও তার মানবত্বের প্রসঙ্গে কুর'আনে বলা হয়েছে- " আমি আদমের বংশধরগণকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের ব্যবস্থা করেছে, পবিত্র জীবিকা দান করেছি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[২] মানবাধিকার প্রতিষ্টায় সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মই ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। ইসলাম ধর্মই ধর্মের মাধ্যমে কতগুলো অধিকার প্রদান করেছে যা যে কোন রাষ্ট্রের চুক্তি ছাড়াই ইসলামের ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তা পালন করে থাকে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রকার চুক্তির প্রয়োজন হয় না। এর অনেক পরে ক্লাসিক্যাল যুগ পার হয়ে মধ্য যুগে আধুনিক মানবাধিকার এর জন্মের সূত্রপাট ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। ইসলাম ধর্মে বর্ণিত অধিকারগুলোই পরবর্তীতে আধুনিক মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

মানবাধিকারের ভিত্তিসমূহ ও মৌলিক আইনসমূহ প্রণয়ণের কাজ সর্বাগ্রে সমাধান করেছে ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে। ইসলামই এসব আইন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুষ্ঠভাবে, দ্বর্থহীনভাবে ও বিশদভাবে রচনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পরম সম্মানিত ও সকল সৃষ্টির সেরা প্রাণী।

---

[১] আল- কুরআন, ৫ : ৩

[২] আল-কুরআন, ১৭ :২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও তার মানবত্বের স্বীকৃতি সম্বলিত বহু সংখ্যক আয়াত কুর'আনে নাযিল হয়েছে।' وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً 'আমি আদমের বংশধরগণকে সম্মাণিত করেছি, তাদেরকে জলে, স্থলে চলাচলের ব্যাবস্থা করেছি, পবিত্র জীবিকা দান করেছি এবং আমার সৃষ্টি করা অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৩]

ইসলাম মানুষকে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে ঘোষণা করেছে। এমর্মে আল্লাহ বলেন " إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 'স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তার সৃষ্টির কাজ শেষ করবো এবং তার মধ্যে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমনা তার সামনে সিজদাবনত হয়ো।[৪] মানুসকে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, এরূপ ন্যায় সংগত সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সে সুখী, সমৃদ্ধ , ভারসম্যপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল পথে চলমান জীবন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন , তা দ্বারা আখেরাতকে খুজে নাও, তবে দুনিয়া থেকে তোমার পাওনা অংশ ভূলে যেয়োনা। আর আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি মাহনুভবতা দেখিয়েছেন, তেমনি তুমিও মহানুভবতা দখাও এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়িও না। আল্লাহ অরাজকতা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৫]

লক্ষণীয়, শরীয়াতের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত জ্ঞান মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ , লালন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তার সেবা প্রদান করে থাকে। কেননা সে দুনিয়া ও আখিরাতের মানুষের কল্যাণ সাধন ও তার অকল্যাণ দূরীভূত করাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। কুর'আন সুন্নাহর বাণী ও শরী'য়াতের যুক্তি-প্রমাণের সর্বাত্নক পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় , বান্দাদের কল্যাণ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে নিহত :

১. অনিবার্য প্রয়োজন : যা না হলে মানব জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এগুলো হলো ধর্ম, সুপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও সম্পদ।

---

[৩] আল-কুর'আন, ১৭ : ৭০
[৪] আল-কুর'আন, ৩৮ : ৭১-৭২
[৫] আল-কুর'আন, ২৮ : ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রয়োজন : যা না হলে মানুষের জীবনে তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব নিয়ে সুষ্ঠভাবে টিকে থাকতে পারে না। যেমন স্বাধীনতা ও মত ব্যক্ত করার সুযোগ।

৩. সৌন্দর্য বর্দ্ধক ও পরিপূরক : যা না থাকলে মানব জীবনের চাহিদাগুলো সুষ্ঠভাবে পূরণ হতে পারে না। যেমন সম্মান ও মর্যাদা।

আর ইসলামের সকল আইন ও বিধান এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যেই প্রণীত। এইগুলোর সমন্বয়ে সে এই মহান শরীয়াতের মধ্যে মানবাধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানকারী একটা প্রাচীর গড়ে তোলে। যিনি মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করেছেন তাঁর এই উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই পূর্ণ করা উচিৎ এবং তাদের সার্বিক কণ্যাণ সাধনে এগুলোর ওপর তার নির্ভর করা উচিত।
পরবর্তীতে এই অধিকারগগুলোর উপর ভিত্তি করে বর্তমান আধুনিক অধিকার সনদ গড়ে উঠেছে।[৬]

ইসলামী আইনে মানবাধিকার

ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারসমূহ

১. জীবনের নিরাপত্তা

২. সম্পদের নিরাপত্তা

৩. সম্ভ্রমের নিরাপত্তা

৪. ব্যাক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা

৫. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ

৬. একজনের কার্যকলাপের জন্য অপরজন দায়ী নয়

৭. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

৮. মত প্রকাশের অধিকার

৯. বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

১০. সম অধিকার

১১. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

১২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার

১৩. পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার

১৪. সংগঠন ও সভাসমাবেশ করার অধিকার

১৫. রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার

১৬. স্থানান্তর গমন ও বসবাসের স্বাধীনতা

১৭. পরিতোষিক ও বিনিময় লাভের অধিকার

---

[৬] এডভোকেট বাহাউদ্দিন আহমেদ '*আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন*' (ঢাকা : সামছু পাবলিকেশন্স, জানুযারী ২০০৭), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সকল মানুষ সমান

১৯. সংখ্যালঘুর অধিকার

ইসলাম শুধু অধিকার ঘোষণা দিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা বাস্তবায়নের পদ্ধতির ঘোষণা করেছে। এর দৃটি পদ্ধতি রয়েছে।

(১) রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারের মাধ্যমে এর প্রতিকার পাওয়া যায়।

(২) মৃত্যুর পর শাস্তির প্রতি বিশ্বাস।

ইসলাম নিম্নলিখিত অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

(ক) শিশুর অধিকার

(খ) নারীর মর্যাদা ও অধিকার

(গ) দাসদের অধিকার

(ঘ) সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকার

(ঙ) সংখ্যালঘিষ্টের অধিকার

(চ) যুদ্ধবন্দীদের অধিকার

(ছ) কন্যা সন্তানের অধিকার

(জ) গরিবের হক বা অধিকার।

ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণা

ইসলাম মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েছে অন্য সকল মানব রচিত আইন কর্তৃক ঘোষণা দেওয়ার চৌদ্দশ বছর আগে। এই ঘোষণার বিভিন্ন অংশ ও উপাদান কুর'আন ও সুন্নাহতে পাই। এ থেকে অন্য সমস্ত মানব রচিত আইনের ওপর ইসলামী শরী'আত নির্ধারিত মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। এ আইন চিরন্তন ও শাশ্বত। এই আইনের কোন পরিবর্তন ও বিকৃত সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ নিজেই এর রক্ষক । 'আমি এই কুর'আন নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষক'।[৭]

এ আয়াত পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে মানবাধিকার রচনা করেছেন ,তা রদ বদলের অধিকার কারো নেই। কেই এর বাস্ত বায়ন বন্ধ করতে পারবে না। অথচ অন্য যে কোন মানব রচিত আইন বা আর্ন্তজাতিক ঘোষণা যা বিশ্বের দেশগুলোর সমর্থন ও অনুমদনের উপর নির্ভশীল, যে কোন সময় তার রদবদল হতে পারে এবং যে কোন সময় তা বাস্তবায়ন বন্দ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ মানুষের জন্য যে অধিকার রচনা ও বরাদ্দ করেন, তা তাদের প্রকৃতির সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জসপূর্ণ।

মানবাধিকার স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দার জন্য প্রদত্ত। তিনি ও তাঁর রাসূল (সা.) এগুলিকে কুর'আন ও সুন্নায় বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ইসলামী শরী'আতই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ও সবার আগে

[৭] আল-কুরআন, ১৫ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েছে, তাই এসব অধিকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যও তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক রূপায়ন

মানবাধিকার সংরক্ষণে ও তার তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের ভুমিকা নিশ্চিত করা ও এই ভুমিকা নতুন করে প্রত্যায়ন এবং **আন্তর্জাতিক** রূপায়নের লক্ষ্যে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত বিশ্ব ইসলামী পরিষদ "আল-মুতামার আল-আলামিল ইসলামী" ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে ' ইসলামী মানবাধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক ঘোষণা" প্রচার করে। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে মানবাধিকারের ধারাসমূহের যে ভিত্তি ও উৎস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই এ ঘোষণার আওতাভূক্ত। বিশ্ব ইসলামী পরিষদ ইসলামী শরী'আতের অলংঘনীয় উৎস কুর'আন ও হাদীসের অনুসরণে ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আনর্তজাতিক আইনের ধারা-উপধারা সমূহ পর্যালোচনা করে মানবাধিকারের এই ঘোষণা প্রদান করেছেন। এ ঘোষণা প্রচারিত হয় উল্লেখিত তারিখে প্যারিস থেকে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে: "দেশ ও জাতি নির্বিশেষে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম জনতা, আমাদের পবিত্র মহাগ্রন্থের আলোকে মহা বিশ্বে মানুষের অবস্থান ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্রান্ত নির্ভূল ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে, আল্লাহর দিকে আহবানের পতাকাবাহী আমরা মুসলমানরা, দীন ইসলামের নামে পঞ্চদশ হিজরী সূচনালগ্নে পবিত্র কুর'আন ও মহান সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত এই ঘোষণা প্রচার করছি।"[৮]

ধারা-১: এ সমাজের সকল মানুষ সমান। জাতীয়তা, বংশ,গোত্র, লিংগ,বর্ণ,ভাষা বা ধর্মেও ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য নেই।

ধারা-২: এ সমাজে সমতাই অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যভার প্রাপ্তির ভিত্তি। আর মানুষের জন্মের উৎস এক হওয়ায় এ সমতার ভিত্তি ও কারণ। "হে মানবজাতি! আমি তোমদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছে।[৯] আর মহান আল্লাহ মানুষকে পরম সম্মানে ভুষিত করেছেন এই বলে: "আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি। এবং আমার বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১০]

---

[৮] ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, '*মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৯] আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

[১০] আল-কুরআন, ৪৫ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৩: এ সমাজে মানুষের স্বাধীনতা তার জীবনের সার্থকতারই সমার্থক। সে স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করুক, স্বাধীন পরিবেশ নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ফটাক, দমন, পরাধীনতা, অবমাননা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত অবস্থায় বেড়ে উঠুক এবং এটা এ সমাজ নিশ্চিত করবে।

ধারা-৪: পরিবার এই সমাজের ভিত্তি। সমাজ তাকে সর্বাত্মক সম্মান ও নিরাপত্তা দেবে এবং তার স্থিতি ও উন্নয়নের জন্য যাবতীয় উপায় উপকরণ সরবরাহ করবে।

ধারা-৫: এই সমাজে আল্লাহর রচিত আইনের সামনে শাসক ও শাসিত সমান। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য থাকবে না।

ধারা-৬: এ সমাজে শাসন ক্ষমতা একটি আমানত। যা শাসককের ঘারে চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে শরী'আতের ইঙ্গিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শরী'আতের নির্ধারিত পদ্ধতিতেই বাস্তবায়িত হয়।

ধারা-৭: মুসলিম সমাজের সকলে বিশ্বাস করে, একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক, মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর সকল সৃষ্টির ব্যবহারের উপযোগী। সে গুলো তার সেবায় ও উপকারর্থে নিয়োজিত। এগুলো তাঁর কৃপার দান , এতে কারো কোন অগ্রাধিকার নির্ধারিত নেই, এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে আল্লাহর এই দান থেকে তার ন্যায্য অংশ লাভ করার।'আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী করেছেন'[১১]

ধারা-৮: এই সমাজে সমগ্র উম্মাহর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা ও সংহত করার নীতিমালা নির্ধারিত রয়েছে এবং যে ক্ষমতা বলে সেই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হবে, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। "তাদের সামষ্টিক কার্যকলাপ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে[১২]।"

ধারা -৯: এ সমাজে যাবতীয় পরিপূরক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ও সূলভ থাকবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যেতা অনুসারে দায়িত্ব বহন ও পালন করতে পারে। অতঃপর ইহকালে জনগনের সামনে ও পরকালে তার স্রষ্টার সামনে জবাবদিহী করবে।" তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।"

ধারা-১০: এ সমাজ আদালতের সামনে শাসক ও শাসিত একই কাতারে সমান মর্যদায় দাঁড়াবে, এমনকি বিচারানুষ্ঠান পর্যায়ের যাবতীয় কার্য্কলাপেও।

ধারা-১১. এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বিবেক স্বরূপ। তার অধিকার রয়েছে, যে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে সমাজের পক্ষ থেকে মামলা রুজু করার। অন্যদের কাছ থেকেও তার সাহায্য ও

---

[১১] আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

[১২] আল-কুরআন, ২৬ : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন চাওয়ার অধিকার রয়েছে। অন্যদের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা এবং তার ন্যায়সংগত দাবিতে তার বিরোধিতা না করা।

ধারা-১২: এ সমাজ সকল ধরণের আগ্রাসন প্রত্যাখান করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্বাধীনতা, সম্মান ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহর আইন মানুষকে যে সকল অধিকার দিয়েছে, তার আনুগত থেকে , তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়ে ও তা সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে উক্ত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে। ইসলাম সারা বিশ্বের জন্যই এ অধিকারগুলো ঘোষণা করছে।

এই গোষণার পরে ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগাষ্ট মুসলিম দেশর প্রতিনিধি বৃন্দ কর্তৃক গৃহীত আর্ন্তজাতিক ঘোষণার সিদ্ধান্তসমূহ যা ঐতিহাসিক ‘কায়রো ঘোষণা’

(Cairo Declaration) নামে পরিচিত। বিভিন্ন মুসলিম দেমের শরী’য়াহ-বিশেষজ্ঞগণ কুর’আন-হাসীস ও ফিকাহর আলোকে বর্তমানযুগের অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণা পেশ করেন। এতে ২৫ টি ধারা ও ৩৭ টি উপ-ধারায় ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় স্থান লাভ করে। এ ঘোষণাপত্রে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, মানবাধিকার সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে (Exploitation and Persecution) থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামী শরী’আহ মুতাবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপননের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা আবশ্যক।

ঘোষণা-পত্রে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, মৌলিক অধিকার এবং বিশ্বজনীন ব্যক্তি স্বাধীনতা (Universal Freedom) ইসলাম ধর্মে সমগ্রতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন ক্রমেই একে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে নস্যাৎকরা, লংঘন করা বা অবজ্ঞা করার অধিকার নেই। এটি একটি অলংঘনীয় ঐশী বিধান। এ বিধান সংরক্ষিত আছে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবে, যা পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর শেষ নবীর (সা.) মাধ্যমে ।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফিকাহ একাডেমীর ঘোষিত মানবাধিকার দলিল[১৩]

ধারা-১ (ক) আদম থেকে সৃষ্ট এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র মানব জাতি এক পরিবারের সদস্য। জাতি গোত্র, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক অবস্থান বা অন্য কোন বিবেচনা নির্বিশেষে মূল্য মানবিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে মানবিক পূর্ণতা এনে দিয়ে এই মর্যাদা বৃদ্ধিকে গ্যারান্টি দেয়।

[১৩] বাহাউদ্দিন, আন্তর্জাতিক মানবাধকার আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

খ) প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর অধীন। সেই সকল মানুষকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন যাঁরা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শুধুমাত্র খোদাভীতি ও সৎকর্মের ভিত্তিতেই একজন মানুষ অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

ধারা ২ :

ক) জীবন হলো আল্লাহ-প্রদত্ত এক নিয়ামত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধানের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রেরই কর্তব্য-এ অধিকারকে যে কোনো প্রকার অবমাননা থেকে রক্ষা করা। শরী'আহ-নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

খ) এমন কোন কাজ করা বা উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ যা মানবজাতির ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ) স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারো জীবন রক্ষা করা শরী'আত নির্দেশিত একটি কর্তব্য।

ঘ) শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত, এ নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরীয়াহ-নির্দেশিত কোনো কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।

ধারা : ৩

ক) সামরিক অভিযান বা সশস্ত্র কোন সংঘর্ষের সময় নির্দোষ ব্যক্তি, যেমন-বৃদ্ধ, নারী এবং শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। আহত এবং পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা পাবার অধিকার রয়েছে এবং যুদ্ধবন্দীদের অধিকার রয়েছে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় পাবার। মৃতদেহ বিকৃত করা অবৈধ। যুদ্ধবন্দী বিনিময় এবং যুদ্ধের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করে দেয়া মানবিক কর্তব্য।

খ) গাছপালা বিনাশ, শস্য ও প্রাণীর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন, প্রাণহানিকর শেল নিক্ষেপ, বোমা-বিস্ফোরণ বা অন্য কোনো প্রকারে শত্রুপক্ষীয় বেসামরিক সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির ক্ষতি সাধন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ধারা : ৪

ক) প্রত্যেক ব্যক্তি,জীবিত বা মৃত সকল অবস্থায়, পবিত্রতা রক্ষার হকদার এবং নিজ নিজ সুনাম ও মর্যাদা রক্ষার অধিকারী। রাষ্ট্র বা সমাজ পরিত্যাক্ত ধন-সম্পত্তি ও সমাধি রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা : ৫

Dhaka University Institutional Repository

ক) সমাজের বুনিয়াদ হলো পরিবার এবং পরিবার গঠনের ভিত্তি হলো বৈবাহিক প্রথা। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পূরুষের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার আছে। গোত্র, বর্ণ বা জাতীয়তার কারণে উদ্ভুত কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদেরকে এ অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

খ) সমাজ এবং রাষ্ট্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করার দায়িত্ব নেবে এবং বৈবাহিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলবে। পরিবারের নিরাপত্তা বিধান এবং কল্যাণ সুনিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্র।

ধারা : ৬

ক) মর্যাদা ও তার ভোগ করার অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের দিক থেকেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার । নারীর রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বা পরিচয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিজের নাম এবং বংশ পরিচয় বজায় রাখার অধিকার।

খ) পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক কল্যাণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে।

ধারা : ৭

ক) জন্ম মুহূর্ত থেকেই প্রতিটি শিশু তার মা বাবা, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে উপযুক্ত লালন-পালন, শিক্ষা ও বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও নৈতিক পরিচর্যা পাবার অধিকার রাখে। সন্তানের ভ্রুণ এবং সন্তানের মা, উভয়কে অবশ্যই নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে এবং তাদের যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে।

খ) মা-বাবা অথবা উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ অভিবাবকের অধিকার রয়েছে তাদের শিশুদের জন্য যে কোন প্রকার শিক্ষাদানের পদ্ধতি বেছে নেয়ার। তবে সে ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ ও শরীয়াহ্র মূলনীতি অনুযায়ী শিশুর উন্নত জীবন পরিগঠন ও ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

গ) মা বাবার উপর সন্তানের যেমন, সন্তানের উপরও তেমনি মা-বাবার হক রয়েছে, আবার তেমনি আত্মীয়ের হক বা অধিকারও শরীয়াহ্র মূলনীতি ও বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত।

ধারা : ৮

ক) প্রতিটি মানুষ বাধ্যবাধকতা ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তার বৈধ (LegalCapacity) শিক্ষা উপভোগের অধিকার রাখে। এ ক্ষমতা কোনভাবে হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার অভিভাবক তার প্রতিনিধিত্ব করবে।

ধারা : ৯

জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র শিক্ষা অর্জনের সকল পদ্ধতিকে সহজলভ্য করবে এবং সমাজের স্বার্থে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বহুমূখী করার নিশ্চয়তা দিবে

Dhaka University Institutional Repository

যেন তা মানব জাতির কল্যাণে লাগে। এবং মানুষকে ইসলাম ও বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তোলে।

খ) বিভিন্ন শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, পরিবার, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি থেকে ধমীয় এবং দুনিয়াবী শিক্ষা লাভের। অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। এ শিক্ষালাভের অধিকার এমন হতে হবে। যে শিশুর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও সার্বিক প্রতিভার স্ফুরণে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় করণে এবং মানুষ হিসাবে তার অধিকার ও কর্তব্য বা দায়-দায়িত্বের (Obligation) প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির ফলে তার মানসিক স্থিতি ও উৎকর্ষ সাধন সহজতর হয়।

ধারা : ১০

ইসলাম স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও অবিকৃত জীবন বিধান। কোন রকম বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি অথবা কারো দরিদ্র বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করা বা নাস্তিকে পরিনত করা অবৈধ।

ধারা : ১১

ক) প্রতিটা মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। কাইকে দাসত্বে আনা , লাঞ্ছনা বা অবমাননা করা , শোষণ করা বা তাকে হীণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার (Exploit) করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে বশ্যতা (Subjugation) স্বীকারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

খ) দাস প্রথা সবচেয়ে কুৎসিত রূপ হিসেবে পরিগণিত সব ধরনের উপনিবেশিকতা (Colonialism) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উপনিবেশিকতার শিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বীয় স্বীয় লক্ষ্য নির্ধারণের অধিকার। প্রতিটি রাষ্ট্র ও জনগণের কর্তব্য এসব মানুষকে তাদের যাবতীয় উপনিবেশিক কুপ্রভাব, এবং দখলদারিত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার সংগ্রামে সমর্থন যোগানো। দুর্দমাগ্রস্ত এসব দেশে ও জনগণের অধিকার রয়েছে তাদের স্বীয় পরিচয় সংরক্ষণ ও তাদের সমস্ত বিত্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার।

ধারা ১২ : শরী'আহ্ -নির্দেসিত সীমারেখার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা, স্বদেশ সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে নির্যাতনের শিকার হলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় -প্রার্থনার। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা করবে তবে আশ্রয়-প্রার্থনাকারী অবশ্যই শরী'আহ-নির্দেশিত কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

ধারা : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ক) প্রতি কর্মক্ষম মানুষের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক কাজ করার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকেরই রয়েছে তার পছন্দমাফিক উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা পাবার অধিকার রয়েছে। পাশাপাশি থাকবে অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির নিশ্চয়তা। সাধ্যের বাইরে কাউকে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য বাধ্য করা চলবে না অথবা কোনরূপ বল প্রয়োগ, জোর জবরদস্তি বা হীন উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা যাবে না,অথবা তার কোন ক্ষতি সাধন করা যাবে না। কর্ম-সম্পাদন শেষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি কর্মচারীকে যুক্তিসঙ্গত উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, অন্যদিকে কর্মচারিকে হতে হবে তার কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান, যথোপযুক্ত ও সচেতন । কর্মচারী ও চাকুরীদাতার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্র তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে, তাদের দুর্দশার প্রতিকার করবে, তাদের স্বস্ব অধিকার সুনিশ্চিত করবে এবং কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

ধারা : ১৪

ক) বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগের অধিকার সবার আছে। তবে তা যে স্বেচ্ছাচারমূলক বা প্রতারণামূলক না হয় এবং তাতে নিজের বা অন্যের কোন রূপ ক্ষতি সাধিত না হয়। সুদ নেয়া বা দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ধারা :১৫

ক) বৈধ উপায়ে পাপ্ত নিজস্ব সম্পত্তির ওপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং নিজের, অন্যদের বা সাধারণভাবে সমাজের অন্য সদস্যের কোন অধিকার ক্ষুন্ন না করে এ সম্পত্তি ভোগ-দখলের যাবতীয় অধিকার তার রয়েছে। জনস্বার্থে দখলকৃত জমি বা সম্পত্তির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তিসঙ্গত মূল্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কাউকে তার নিজ জমি বা সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করা যাবে না।

খ) আইনের নির্দেশ মুতাবিক কোন জরুরী অবস্থা দেখা না দিলে কারো সম্পত্তি সরকারী ক্ষমতা বলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

ধারা : ১৬

ক) প্রত্যেকের স্ব স্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম বা প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার ফলাফল ভোগের অধিকার সবার রয়েছে এবং এসব কর্ম থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষার অধিকারও তাদের রয়েছে; তবে অবশ্যই তার কর্ম শরী'আহর মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারে না।

ধারা : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ক) প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে একটি পরিচ্ছন্ন পরিমন্ডলে বসবাসের, যা মুক্ত থাকবে সব রকম কদর্যতা এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে, এমন পরিমন্ডল যা তার আত্মোন্নয়নের অনুকূল হবে। এ অধিকার ভোগে রাষ্ট্র ও সমাজ তাকে অবশ্যই নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

খ) প্রত্যেকের াধিকার রয়েছে সুচিকিৎসা সামাজিক সুবিধাদি ভোগ করার। সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার আওতায় প্রত্যেককে তার নিজ নিজ সম্পদ ও সামর্থের মধ্যে জীবনকে সহজ ও স্বচ্ছল করে তোলার সমস্ত উপকরণ ভোগের অধিকার তার রয়েছে।

গ) রষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির শালীন, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে, যা তার এবং তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদাসহ সব ধরনের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

ধারা : ১৮

ক) প্রত্যেকেরই নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। এই নিরাপত্তার যেমন তার নিজের , তেমনি তার সম্মান-সম্পত্তি, তার ওপর নিভরশীলদের এবং তার ধর্মের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

খ) প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়ীতে, নিজ পরিবারে, নিজ স্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্নীয়তা বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিরুপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি উপর গুপ্তচরবৃত্তি, তাকে কড়া নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কোন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে।

গ) প্রত্যেকের বসতবাটির নিরাপত্তা বিধান ও তাতে অবৈধ হস্তক্ষেপ না হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং বাসিন্দাদের অনুমতি ছাড়া বা বে আইনীভাবে কারো বাসগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং এর বাসিন্দাদেরকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা তাদের বাসস্থান বলপূর্বক দখল করে নেয়া বা বাড়ি-ঘর নির্মূল করা যাবে না।

ধারা : ১৯

ক) শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান।

খ) ন্যায়বিচার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য।

গ) প্রত্যেকের দায় একান্তভাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত।

ঘ) কোথাও যেন অপরাধ সংঘঠিত হতে না পারে এবং শরী‘আহ-নির্ধারিত কোন কারণ ছাড়া যেন কাউকে শাস্তি দেয়া না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) নিরপেক্ষ বিচারের বা শুনানির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ। এ নিরেপক্ষ বিচার প্রক্রিয়া বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে।

ধারা : ২০

ক) বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অসংগত। কাউকে কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা বা তার মানহানি করা ও তার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা তাকে কোন রকম অমর্যাদা করা যাবে না । অথবা কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বা তার স্বাস্থ্য বা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন ডাক্তারী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষায় তাকে ব্যবহার করা যাবে না। অথবা এমন কোন জরুরী আইন ঘোষণা করা যাবে না, যাতে এ ধরণের কাজে কেউ বিশেষ কর্তৃত্ব পেতে পারে।

ধারা : ২১

ক) যে কোন প্রকারের অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে কাউকে জিম্মি করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

ধারা : ২২

ক) প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে, তবে শরী‘আহ্‌র মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারবে না।

খ) প্রত্যেকেরই সঠিক বিষয়ের পক্ষে কথা বলার বা সুপারিশ (advocate) করার এবং যা কিছু বলার ভাল, তা প্রচার ও প্রসারের অধিকার রয়েছে। ইসলামী শরী‘আহ মুতাবিক ভুল ও মন্দ কাজ থেকে কাউকে সাবধান করার অধিকার সব মানুষের আছে।

গ) তথ্য (information) হলো সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকতা। কোন তথ্যকে এমনভাবে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার(exploit) করা বা অপব্যবহার করা যাবে না যা নবী-রাসূলদের পবিত্রতা বা মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে, নৈতিক (Moral) ও শালীন (ethical) মূল্যবোধকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল (undermine) করে অথবা সমাজে ভাঙ্গন ধরায়, দুর্নীতির বিস্তার ঘটায় বা সমাজে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা ঈমানকে (Faith) দুর্বল করে দেয়।

ঘ) জাতীয়তাবাদ বা এমন কোন মতবাদ (doctrin) যা পরষ্পরের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ায় বা বর্ণগত ও গোত্রীয় বিভেদ সৃষ্টি করে-এমন কোন মতবাদ বা ধারণা ইসলাম অনুমোদিত নয়।

ধারা : ২৩

ক) ক্ষমতা (Authority) একটি আমানতস্বরূপ, এটাকে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ বা কাউকে বঞ্চিত করা, অপপ্রয়োগ করা, বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাউকে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার (abuse) করা

Dhaka University Institutional Repository

(Malicious exploitation) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে যাতে মৌলিক মানবাধিকার সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

খ) নিজ রাষ্ট্রের গণপ্রশাসনে(Administration of public affairs) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। শরী'আহ মুতাবিক সরকারী/রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিকার সকলের জন্যই সংরক্ষিত।

ধারা : ২৪

ক) এ ঘোষণায় প্রদত্ত সব অধিকার ও স্বাধীনতা(Freedom) ইসলামী শরীয়াহ্'র অর্ন্তগত।

ধারা : ২৫

ক) প্রদত্ত ঘোষণার যে কোন ধারা ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টকরণে একমাত্র উৎস ও ভিত্তি হলো ইসলামী শারী'আহ।[১৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ

মহানবী (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শুধু কল্পনাতীত ছিলনা বরং তাঁর পরবর্তী আজকের এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, আইনের শাসন, ও মানবাধিকারের এক অনুপম ও অনবদ্য দলীল হয়ে বেঁচে থাকবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ এমন অনেক মানবাধিকারের কথা বলেছেন যেগুলো– আজকের মানবাধিকারের সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে, মানবাধিকার আইন, মহাদেশীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় দলিল ও আইনে যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। এমন কি প্রতিফলিত মানবাধিকার চেতনাসমূহের কাছে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সনদ সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে পড়েছে।

রাসূলে করীম (সা.) তদানিন্তন পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে এবং অনাগত পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের চেতনা সম্বলিত যে বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ প্রদান ও প্রনয়ণ করেছিলেন তা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে যে সকল মানবাধিকারের চেতনার বিবরণ রয়েছে বিষয় বস্তুর দিক থেকে তা আরও ব্যাপক। রাসূলে করীম (সা.) বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনা সম্বলিত বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আমরা এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এবং এর সাথে আধুনিক মানবাধিকার ধারণার প্রসঙ্গ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছি।

---

[১৪] The Message International USA, September 2000 থেকে অনুদিত। উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *মানবধিকার ও ইসলাম*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০২খ্রি.), পৃ. ৫৭-৬২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের চেতনাসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

২. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের অধিকার।

৩. সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

৪. সার্বজনীন শিক্ষা লাভের অধিকার।

৫. পেশা ও পারিশ্রমিক লাভের অধিকার।

৬. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

৭. দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের অধিকার।

৮. মানব মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার।

৯. অমানবিক আচরণের স্বীকার না হওয়ার অধিকার।

১০. নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগে বাধ্য না হওয়ার অধিকার।

১১. নিষ্ঠুরতার স্বীকার না হওয়ার অধিকার।

১২. মানবের স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভের অধিকার।

১৩. নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতের বিচার প্রাপ্তির অধিকার।

১৪. বর্ণ বৈষম্য সহ সকল রকম বৈষম্য দুরিকরণ এর অধিকার।

১৫. বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র অধিকার।

১৬. নারী ও শিশুদের অধিকার।

১৭. গণতন্ত্র ও জনমত গঠনের অধিকার।

১৮. আন্তর্জাতিক ভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

১৯. ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার।

২০. পরিবেশ রক্ষার অধিকার।

২১. সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার।

২২. সমান অধিকার লাভের অধিকার।

২৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

২৪. বাসস্থান লাভের অধিকার।

২৫. অপসংস্কৃতি অপসারণের অধিকার।

২৬. নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভের অধিকার।

২৭. সুবিচার লাভের অধিকার।

২৮. গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধিতে মানবাধিকার।

২৯. শাসকের আনুগত্য লাভের অধিকার।

৩০. সমঅধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. উত্তরাধিকার সুত্রে সম্পদ লাভের অধিকার।

৩২. দাস-দাসীদের অধিকার।

৩৩. বন্দীদের অধিকার।

৩৪. আন্তর্জাতিকভাবে জলাধার লাভের অধিকার।

৩৫. আন্তঃযোগাযোগ ও স্থানান্তর গমনের অধিকার।

৩৬. আদিবাসী ও সংখ্যা লঘুদের অধিকার।

৩৭. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মর্যাদা রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধিতে মানবাধিকার প্রসঙ্গ

চতূর্থ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: হযরহ মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার প্রসঙ্গ

সপ্তম পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

অষ্টম পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিতে বাসস্থানের অধিকার প্রসঙ্গ

নবম পরিচ্ছেদ : রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গ

দশম পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও ভাষণে জাতীয়তার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার প্রসঙ্গ

একাদশ পরিচ্ছেদ: রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্যের পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চুক্তিসমূহে জলাধার, সামুদ্র ও মহীসোপান আইনে মানবাধিকার লাভ প্রসঙ্গ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিসমূহে আন্তঃযোগাযোগ ও স্থানান্তর গমনের অধিকার প্রসঙ্গ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিতে বিশ্বপরিবেশ রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার প্রসঙ্গ

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ :হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীতে শ্রমিকের অধিকার প্রসঙ্গ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ন্যায় বিচার লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

জীবনের নিরাপত্তা তথা স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিলনা। কন্যা সন্তান ছাড়াও যখন তখন যাকে ইচ্ছা হত্যা করা হত । জীবন রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন– إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

"হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহর যেমন পবিত্র তোমাদের প্রতিপালকের নিকট-উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য তদ্রুপ পবিত্র" ।[১৫] এখানে মানুষের জীবন রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

তাবুকের ঐতিহাসিক ভাষণে জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ বলেন, "হত্যা করা কুফর"[১৬]

মদিনার সনদের ১৪নং ও ২২ নং ধারায় জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার স্পর্কে বলা হয়েছে এ ভাবে-

ولا يقتل مومن مومنا في كافر. ولا ينصر كافرا علي مومن.

ধারা : ১৪"কোন ম'মিন কোন কাফেরের পক্ষে অপর কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না। কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।"

ধারা : ২২

---

১৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নে ইয়াজীদ ইব্নে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, অনু.ও সম্পাদনা পরিষদ, *সুনান ইব্নে মাযাহ্*(ঢাকা : ইসলামিতক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৪২৩ হি./২০০২ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ১০৭, বাবু হাজ্জাতি রাসূলিল্লাহ, হাদীস নং ৩০৫৬

১৬ আবদুল কাইয়ুম নদভী, *মহানবীর ভাষণ*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খৃ.), পৃ.১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

و أنه لا يحل لكومن أقر بما في هذه الصحيفة و آمن بالله واليوم الاخر أن ينصر مثا ولا يوويه، وأن من نصره، أو آواه،

فان عليه لعنة الله و غضبه يوم القيامة، ولا يوخذ منه صرف ولا عدل.

"এ সনদের শর্তাবলীর প্রতি স্বীকৃতিদানকারী কোন মুমিন যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে কোন হত্যাকারীকে [১৭]' সাহায্য করবে না বা আশ্রয়ও দিবে না। যদি কেউ এরূপ লোককে সাহায্য বা আশ্রয় দান করে তবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিরন তার উপর আল্লাহর রোষ। এর প্রতিবিধান হিসেবে কিছু গ্রহণ করাও হবে না বা এর কোন প্রতিকারও নেই।"

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বলা হয়েছে " أنه من قدم مكة من اصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يتغي من فضل الله

فهو آمن على دمه وماله' হজ্জ অথবা উমরা অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের সহচরদের মধ্য হতে যারা মক্কায় আগমন করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে"

রাসুলূল্লাহ (সা.) বানু যামরার সাথে মৈত্রীচুক্তিতে ১নং ধারায়

জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে এভাবে " তারা জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।"

মহান আল্লাহ তা'আলা অবৈধ হত্যাকে এমন জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন যে, এইরূপ হত্যার শাস্তি পৃথিবীতে কিসাসের মাধ্যমে ভোগ করার পর অপরাধীর পরকালে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার ঘোষণাও প্রদান করেছেন।

ইসলাম মানব জীবনকে সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের ধারা ১২৭৬ নং এ বলা হয়েছে "বেঁচে থাকার অধিকার" অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার তথা জীবন রক্ষার অধিকার রয়েছে। বৈধ কোন কারণ ছাড়া মানুষকে এই অধিকার হতে বঞ্চিত করা যায় না।[১৮]

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ইসলাম মানব জীবনকে একান্ত সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং একটি মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল, আর কেহ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"[১৯] কুর'আন মাজীদের উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায় যে, মানব-জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান ও পবিত্র।

জীবনের ধারণ ও নিরাপত্তা লাভ মানুষের একটি অতি বড় প্রয়োজন। যার জীবনের নিরাপত্তা নেই তার অন্য কোন অধিকার ভোগের প্রশ্নই ওঠে না। বেঁচে থাকলে তবেই তো অন্য সকল অধিকার ভোগ করার প্রশ্ন আসে। ইসলাম মানুষের প্রাণ হরণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানবতার সামগ্রিক কল্যাণকে সামনে রেখে এতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে

১৭ মুহদিছ অর্থ নতুন অপছনাদনীয় কোন কিছুর প্রবর্তক, যা সবা কাছে নিন্দনীয়। এখানে হত্যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১-২, পৃ. ৬৯০-৬৯১

১৮ সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, খ. ৩, পৃ. ৭৭০

১৯ আল-কুরআন, ৫ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে স্বেচ্ছায় অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব জীবনের নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি মানুষের জীবন সংহারকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

"আল্লাহর কাছে একজন মুমিনকে হত্যা করার চাইতে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ।[২০]

অন্য বর্ণনায় এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে:

ان فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

"হযরত ফাযালা ইবন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : মু'মিন সেই ব্যক্তি , যার হাতে লোকদের জান-মাল নিরাপদে থাকে।"[২১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম পূর্বযুগের পারস্পরিক হানাহানি ও রক্তের হোলিখেলা বন্ধ করে এমন একটি সুশীল ও সুস্থ সমাজ নির্মাণ করেছিলেন, যাতে সকল মানুষই জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। এ সমাজে প্রত্যেকের জীবনকে অতি সম্মানিত বস্তু হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কেউ কারো জীবন নিয়ে খেলা করতে পারত না, কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারত না। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের ব্যাপারে শংকামুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে কিসাসের বিধি-বিধান কার্যকর করতেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা (আনাস ইবন মালিকের ফুফু) রুবাঈ (রা.) একজন আনসারী মহিলার সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন আনসাররা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নালিশ পেশ করলেন। তিনি কিসাস অর্থাৎ যথার্থ বদলা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় আনাস ইবন মালিকের চাচা আনাস ইবন নাদার (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তার বোনের দাঁত না ভাঙ্গার আবেদন জানান। তখন রাসূল (সা.) বললেন– আনাস! আল্লাহর নির্ধারিত বিধান হল কিসাস। পরে অবশ্য আনসারগণ সন্তুষ্টচিত্তে কিসাসের পরিবর্তে দিয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ করেন।[২২]

মানব জীবনের নিরাপত্তা মানুষের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জীবনেও কিসাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন। নিজেকেও কিসাসের জন্য পেশ করেছেন। বর্ণিত রয়েছে: "একদিন ঘটনাক্রমে নবী করীম (সা.)-এর হাতের ছড়ির খোঁচায় এক ব্যক্তি সামান্য আহত হন। তিনি সাথে সাথেই সে ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে নিজেকে সে ব্যক্তির দিকে এগিয়ে দিলেন। লোকটি লজ্জিত স্বরে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি মাফ করে দিলাম।"[২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মতকে সর্বপ্রকার নিপীড়ন, কষ্টদান ও হত্যা থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নসীহত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এই সব মহামূল্য বাণী মানুষকে অকারণ হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে সাবধান ও সতর্ক করে রাখতে চেয়েছেন।

---

২০ সুনানে নাসাঈ, বাব : তা'যীমুদ দাম, হাদীস নং ৩৯২৪

[২১] সুনানু ইবনে মাজাহ, বাব : হুরেরমাত দামিল মু'মিনিন ওয়াল মালাহু, হাদীস নং ৩৯২৪

২২ বুখারী ,প্রাগুক্ত, বাবু ওয়াল জুরুহা কিসাসুন, হাদীস নং ৪২৪৫

২৩ আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে যে সমাজে বংশ নিধন চলে অবাধে, বংশ বৃদ্ধি অসমর্থিত হয়, বংশ নিয়ন্ত্রণ ও তার পরিণতিতে জনসংখ্যার হ্রাস প্রাপ্তিতে গোটা মানব বংশের বিলুপ্তি নিশ্চিত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে, ইসলামে তা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"[২৪]

এমনিভাবে মহানবী (সা.) মানুষের জীবনের নিরাপত্তার তাগিদ দিয়েছেন। মানুষের প্রাণহরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুতঃ ইসলামি জীবনাদর্শ মানবতার জয়গানে মুখরিত। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হত্যা মহাপাপ এবং শাস্তিযাগ্য অপরাধ।

মাতৃগর্ভে স্থিতি থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সময়কে মানুষের জীবনকাল বলা যায়। এই সময়ের জন্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের নামই জীবনের অধিকার। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে কোন ব্যক্তি দ্বারা আহত বা নিহত না হবার। অধিকার আছে স্বাভাবিকভাবে জীবন বিপন্নকারী কোন কিছুর ভয়ে সন্ত্রস্থ না থাকার।[২৫]

জীবন বলতে কোন রকমে বেঁচে থাকা নয়। যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মানব দেহ গঠিত এবং যে সকল ব্যক্তি নিয়ে মানুষের সুখের পৃথিবী তার সবগুলো মিলেই জীবন। এসবের অধিকারই জীবনের অধিকার। তাই বলে জীবিকার অধিকার আর জীবনের অধিকার এক নয়। 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' বলতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, অবরুদ্ধ না হওয়ার অধিকার, শাস্তি না পাওয়ার অধিকার, গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি বোঝায়।[২৬]

আন্তর্জাতিক দলিল ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে জীবন রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

ক) Universal Declaration of Human Rights- UDHR- 1948 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' ১৯৪৮-এর অনুচ্ছেদ ঃ ৩ এ বলা হয়েছে– "প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।"[২৭]

খ) The Eurppean. Convention Human Rigths- (ECHR-1953), "মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয়ান কনভেনশন– ১৯৫৩, এর ২ নং ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

অনুচ্ছেদ : ২.১ "প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন অপরাধের জন্য আইনের দ্বারা অনুরূপ শাস্তির (মৃত্যুদন্ড) বিধান করা হলে সেই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রাণ দন্ডের আদেশ কার্যকরী করণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা যাবে না"।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –"আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।"[২৮]

---

২৪ আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

২৫ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২৭ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আঞ্চলিক চুক্তির তৃতীয় ভাগে অনুচ্ছেদ ৬ এ বলা হয়েছে–

অনুচ্ছেদ : ৬.১ "প্রত্যেক মানব প্রাণীর জীবনধারণের সহজাত অধিকার (In herent right to life) আছে। এই অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।"[২৯]

এই আন্তর্জাতিক দলিলের ৯ নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলা হয়েছে–

অনুচ্ছেদ : ৯

(১) প্রত্যেকের স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাত্তার (security of person) অধিকার আছে। কাউকেও স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ এবং আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাহাকেও তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে, গ্রেফতারের সময় তাকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন করতে হবে; এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তাকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের (criminal charge) দায়ে গ্রেফতারকৃত অথবা আটক কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে কোন বিচারক কিংবা আইনের দ্বারা বিচার-ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে, এবং অনুরূপ ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিচার অথবা মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। এটি সাধারণ নিয়ম বলে ধরতে হবে না যে, বিচারাধীন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখতেই হবে; কিন্তু কারো মুক্তি (release) বিচার সংক্রান্ত কার্য-ধারার অন্য যে কোন পর্যায়ে বিচারের জন্য এবং প্রয়োজন হলে, আদালতের রায় কার্যকরী করার জন্য, হাজিরাদানের নিশ্চয়তার শর্ত-সাপেক্ষ হতে পারে।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা (Liberty) হতে বঞ্চিত হলে আদালতে কার্য-ধারা গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে, যাতে আদালত অবিলম্বে তার আটকের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইতে পারেন এবং উক্ত আটক আইন-বিরুদ্ধ হলে তার মুক্তির আদেশ দিতে পারেন।

(৫) কোন ব্যক্তি অন্যায় গ্রেফতার অথবা আটকের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎ যোগ্য (enforceable) অধিকার তার থাকবে।[৩০]

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের অনুচ্ছেদঃ ২ এবং অনুচ্ছেদঃ ৫-এ এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

অনুচ্ছেদ : ২

২৮ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩১ সেপ্টেম্বর– ২০০০, পৃ. ৯

২৯ আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৩০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন অপরাধের জন্য আইনের দ্বারা অনুরূপ শাস্তির (মৃত্যু দন্ড) বিধান করা হলে সেই অপরাধে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকরীকরণ ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে তার জীবন হতে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) যদি নিম্নলিখিত কোন কারণে অপরিহার্য পরিমাণে বল প্রয়োগের ফলে কোন ব্যক্তি তার জীবন হতে বঞ্চিত হয়, তবে উহা এই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে না :

(ক) কোন ব্যক্তিকে বেআইনী হিংস্রতা (violence) হতে রক্ষা করা;

(খ) কোন ব্যক্তির আইনসম্মত গ্রেফতার কার্যকরী করা অথবা আইনসম্মতভাবে আটক কোন ব্যক্তির পলায়ন নিরোধ করা;

(গ) কোন দাঙ্গা বা বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৩১]

অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Convenant on Economic Social and Cultanal Rights) এর ১নং অনুচ্ছেদে "জীবন ধারণের" অধিকার প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন–

অনুচ্ছেদ : ১

(১) সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা (status) নির্ধারণ করবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয় অনুধাবন করবে।

(২) অ-স্বায়ত্বশাসিত এবং অধিভুক্ত অঞ্চল প্রশাসনের দায়িত্ব যেসব রাষ্ট্রের উপর রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রসহ বর্তমান চুক্তির পক্ষরাষ্ট্রগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বাস্তবায়নের উন্নতিবর্ধন করবে, এবং জাতিসংঘের সনদের বিধানাবলী অনুসারে সেই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

কারাগার মানুষের কাছে যেমন অসহনীয় তেমনি অসহনীয় পলাতক জীবন। কারাজীবনে থাকে না স্বাধীনতা, আর পলাতক জীবনে থাকে না নিরাপত্তা। আতংক, অনিরাপত্তাবোধ কারাবাসের চেয়েও কষ্টকর। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের নিরাপত্তা চায়; নিরাপত্তা চায় পরিবারের, সন্তানের, সম্পত্তির এবং সম্মান ও মর্যাদার। নিরাপত্তাহীনতা যদি তাড়া করে বেড়ায় সর্বক্ষণ তাহলে জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ হয় বাধাগ্রস্থ।[৩২]

'জীবন ধারণের অধিকার' এর প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে এতে বলা হয়েছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।'[৩৩]

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার বর্ণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কারো জীবন বা স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে না, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস, খর্ব বা বিনষ্ট করবার অধিকার আছে একমাত্র আইনের।

আইন বলতে এখানে সংসদীয় আইনকে বোঝানো হয়েছে। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংসদ যে আইন প্রণয়ন করবেন সে আইনের দ্বারা ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যায়।

---

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৩২ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৩ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান মানব জীবনকে মহাপবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। সে কারণে একদিকে যেমন জন্ম থেকে জীবনের যে প্রসারিত প্রবাহ, তাকে অবিরাম অক্ষুণ্নভাবে বহমান রাখার অধিকার স্বাভাবিক মানুষের জন্য মৌলিক।[৩৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মর্যাদা রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিশ্চয়তা দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসুলূল্লাহ (সা.) মান সম্মান তথা মানব মর্যাদা রক্ষার অধিকার সম্পর্কে তাঁর বাণীতে বলেন-

عن ابى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال كل المسلم غلى المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ‘আবূ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জান, মাল ও মান সম্মান অপর মুসলিমের উপর হারাম।’[৩৫]

ঐতিহাসিক তাবুকের ভাষণে বলেন- ‘মু’মিনকে গালি দেয়া ফিসক’। মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে মানব মর্যাদার অধিকার সম্পর্কে বলেন-হে কুরায়শ! আল্লাহ তা‘আলা জাহিলিয়্যাতের দাম্ভিকতা ও খানদানী (বংশগত) অহংকারের মূলোৎ পাটন করেছেন। তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। খোদা তা‘আলা বলেছেন,“হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা এক অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন[৩৬]। রাসসুলূল্লাহ (সা.) এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে উল্লখ করে- “লোকজনকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে হবে। তাদেরকে তাদের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সর্বশ্রেণীর লোকদের প্রতি সদাচারণ

---

৩৪ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৩৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্‌বীনী (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,৩খ.মার্চ ২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ফিতান, বাব, হুরমাতে দামিল মু’মিন ওয়াল মালিহি, হাদিস নং ৩৯৩৩, পৃ.৪৫৮

৩৬ . আল-কুর’আন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

করবেন।" এভাবেই রাসুলূল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে বিশ্বমানবতার মর্যাদা রক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

মানুষের মর্যাদাহানি, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নিন্দা, কুৎসা রটনা, বিদ্রূপ ও উপহাস করা, নাম ও উপাধি বিকৃত করাকে নিষিদ্ধ করে আল কুর'আনে ঘোষণা হয়েছে– يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ "হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন, কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হয় উক্ত উপহাসকারিণী অপেক্ষা সে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা।"[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অসংখ্য হাদীসে মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের মান হানিকর অথবা, এমন কোন প্রকারের জুলুম করে, তবে সেই দিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চাওয়া উচিত যে দিন তার না থাকবে সে সম্পদ আর না অন্য কিছু।"[৩৮]

প্রত্যেক ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, কেউ তার ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং হাতের দ্বারা অথবা যবানের দ্বারা তার উপর কোন প্রকারের বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। তাইতো, ইসলাম যুদ্ধকালিন অবস্থায়ও নারীর মর্যাদা হরণ, যিনা, ব্যভিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, নৈতিকতার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। মহানবী (সা.) সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত, মৌলিক অধিকার, জানমাল, সম্ভ্রমের অধিকার রক্ষার উপর ভীষণ জোর দিয়েছেন তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে।

রাসূল (সা.) কোন মানুষের মর্যাদাহানিকে ঘৃণ্যতম জুলুম বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও নারীর মর্যাদা হরণ, যিনা-ব্যভিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, নৈতিকতার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।[৩৯]

মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি মূলতঃ মনুষ্যত্বের মর্যাদার বিষয়।

ইসলাম মানবতার মর্যাদার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এই বিশ্ব চরাচরে আল্লাহর পরেই তাকে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ঘোষণা করেছে। আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ঘটনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই মাটির পুতুলের মধ্যে নিজেদের রূহ-প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সাজদা করিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ "যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা সকলে তার সামনে সাজ্দাবনত হবে।"[৪০]

---

৩৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১

৩৮. বুখারী। উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯

৩৯. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪০. আল-কুরআন, ১৫ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

তাকে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ "আমি তো মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে) সুন্দরতম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।"[৪১] শুধু তাই নয়, বরং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং জগতের সমস্ত নিয়ামতরাজি ও শক্তিসমুহ তার নিয়ন্ত্রণাধীন এনে তার সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ ادَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

"আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদেরকে চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৪২]

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِىْ السَّمٰوتِ وَمَا فِىْ الاَرْضِ

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন?"[৪৩]

এই মহত্ব ও মর্যাদা শুধুমাত্র মানুষ হিসেবেই সে লাভ করেছে। এতে সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। কেননা একই আত্মা থেকে সকলের সৃষ্টি। মহানবী (সা.) মানুষের এই মহত্ব ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তাওয়াফকালীন পবিত্র কা'বা ঘরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- কতই না পবিত্র তুমি! তোমার পরিবেশ কতই না মনোমুগ্ধকর, কত মহান তুমি এবং কতই না মহান তোমার মর্যাদা! যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, একজন মুসলমানের জান-মাল ও রক্তের মর্যাদা আল্লাহর নিকটে তোমার চাইতেও বেশী।

ইসলামে মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ সকলেই সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ করতে, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে, নির্যাতন করতে ইসলাম বারণ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ নিরপেক্ষ ও সম আচরণ লাভের অধিকারী। অতএব কোন মানুষ নিজের প্রতি যে আচরণ কামনা করে না, অন্যের প্রতি সেই আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কোন মানুষই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের প্রতি নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতন কামনা করে না আর তাই অন্যের প্রতি এ জাতীয় আচরণ প্রত্যাশিত নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا "তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৪৪] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি

---

৪১. আল-কুরআন, ৯৫: ৪

৪২. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

৪৩. আল-কুরআন, ৩১ : ২০

৪৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

না করে; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।"[৪৫] এই আয়াতে প্রতিকারের অধিকার বলতে কিসাস তথা রক্তের বদলা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আইনগতভাবে কাউকে হত্যা করতেও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৬]

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "পুরুষ চোর কিংবা নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪৭] কিন্তু পরের আয়াতেই আবার বলা হয়েছে, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "কিন্তু সীমালঙ্ঘন করার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন; আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৮]

সারা সভ্য বিশ্ব একটি প্রত্যয়কে স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, মানুষ আসলে ভাল। এই সত্য স্বীকৃত হলেও দৃশ্যত বাস্তবে প্রতীয়মান তাতে অসৎ মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই পরিস্থিতিতে বলা হয় যে, আসলে মানুষ ভাল হলেও পরিবেশের কারণে ও পরিস্থিতির মোকাবেলায় খারাপ হয়ে যায়। এই খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটি ব্যাধি। এই ব্যাধিকে উৎপাটন করতে হলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি উন্নত করতে হয়। উদরাময় থেকে মানুষকে বাঁচাতে বিশুদ্ধ পানি যেমন প্রয়োজন, মন্দ ও অসৎ মানুষকে সৎ করতে হলে তাই সততা নষ্টকারী পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূলোৎপাটন প্রয়োজন। মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের ধারণা (Concept) বেশী স্পষ্ট। ইসলাম মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর।

সার্বজনীন মানবাধিকারের সনদে মর্যাদা রক্ষার অধিকার

মহানবী (সা.) এ বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানব মর্যাদার যে অধিকার ঘোষণা করেছেন তা ঘোষিত হয়েছে: UDHR এর অনুচ্ছেদ ১-এ

অনুচ্ছেদ : ১ 'সকল মানুষ স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সম-মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে।'[৪৯] মানবাধিকার সক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেশন ১৯৫৯ এর অনুচ্ছেদে: ৩-এ বলা হয়েছে– 'কোন ব্যক্তিকে পীড়ন, অথবা অমানুষিক কিংবা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তির শিকার করা যাবে না।'[৫০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধিতে মানবাধিকার প্রসঙ্গ

৪৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩
৪৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৪৭. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮
৪৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩৯
৪৯ আবুল ফজল হক, *আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
৫০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম মানবতাকে সন্ধান দিয়েছে এক শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশনার। ইসলামের এ পথ নির্দেশনায় সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণের জন্য বৈষয়িক বা পারলৌকিক শান্তির বিধানই শুধু বর্ণিত হয়নি বরং মানব সমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য দণ্ডবিধি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের এ দণ্ডবিধি অপরাধ প্রতিরোধক। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধি বিশ্বে অপরাধ দমনের এক অনুপম আদর্শ। আল্লাহ এ দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেছেন তাঁর নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার মহান লক্ষ্যে। এজন্য আল-কুর'আনে কিছু কিছু অপরাধের হদ্দ বা সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। ইসলাম একটি মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবহত্যা বিষয়ে তাঁর উম্মতকে সাবধান ও সর্তক করেছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। এতদসত্ত্বেও যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় অথবা কোন ব্যক্তি যখন অসৎ উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তিকে শত্রুতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এমন কর্মপন্থা অবলম্বণ করে যা কারো মৃত্যু ঘটাতে পারে, এমতাবস্থায় ইসলাম হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি প্রদান করেছে। সাথে সাথে নির্ধারিত শাস্তি ও জরিমানার চেয়ে বাড়াবাড়ি কঠোর ভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে এটিকে মানবতা বিরোধী ও জাহিলিয়াতের কাজ বলে অবহিত করেছে। কেন না এতে মানবাধিকার লংঘিত হয়। ইসলাম হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকারের চেতনা তুলে ধরেছে। ইসলাম মানবহত্যা বিষয়ে মুসলিমগণকে সাবধান ও সতর্ক করেছে কেবল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইসলামিক দণ্ডবিধি কার্যকর করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হল ইসলামী রাষ্ট্র । কোন ব্যক্তি বিশেষ রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতিত ইসলামিক দণ্ডবিধি কার্যকর করলে তা ইসলামিক দণ্ডবিধি এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিধানমতে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর এ জন্যই আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টায় রত থাকা ঈমানের দাবী।

মহানবী (সা.) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে নির্ধারিত শাস্তি ও জরিমানা চাইতে বাড়াবাড়ি কঠোরভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে এটি জাহিলিয়াতের কাজ বলে অবহিত করেছেন। কেননা এতে মানবাধিকার লংঘিত হয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার বিচার কিসাস[৫১], লাঠি ও পাথর দিয়ে যে হত্যা এ হত্যার বিচার একশত উট। এর উপর বাড়াবাড়ি করা জাহিলি যুগের কাজ। আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো।"[৫২] রাসুলূল্লাহ (সা.) ভাষণে আরো বলেন- 'সাবধান! জাহিলিয়াতের সকল রক্তপাতকে রহিত করা হল। আর প্রথম যে রক্ত রহিত করলাম তা হল হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর রক্ত বনী লায়স গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় তাকে হুযালী গোত্র হত্যা করে।' মদিনা সনদের ৩নং ধারা হতে ১২নং ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে মানবাধিকারের চেতনা ' গণহত্যা ও হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকর করণে মানবাধিকার প্রসঙ্গ।'

৫১ কিসাস; প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যার দাবি করা, সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'কিসাস' বলে। কিসাসের বিধান অন্যায় হত্যা বন্ধ করে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

৫২ ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবু হাজ্জাতু রাসূলিল্লাহ, হাদীস নং ৩০৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নরহত্যা বিষয়ে তাঁর উম্মতকে সাবধান ও সতর্ক করেছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। এতদসত্ত্বেও যদি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়ে যায় তাহলে দু'টি জিনিস একটি প্রতিকার আর একটি কিসাস বা সমান-সমান দণ্ড, এরমধ্যে পার্থক্য করা হবে। প্রতিকার পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই– আল্লাহ তা'আলা ভুলক্রমে হত্যা ও ইচ্ছামূলক হত্যার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

ভুলক্রমে হত্যা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত: হত্যা করলে, তাকে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করা ও নিহতের পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য এটাই আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫৩]

কিন্তু সেই হত্যা যদি ইচ্ছামূলক হয়, তাহলে এই অপরাধ আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করে, তার ওপর আল্লাহর লানত হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণীতে সুস্পষ্ট ভাষায় কঠিন দণ্ড ঘোষিত হয়েছে– وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৫৪] এটা বিশেষ করে পরকালীন দণ্ড।

ইচ্ছামূলক হত্যার ইহকালীন ও তাৎক্ষণিক দণ্ড বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ "আমি তাদের জন্যে উহাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।"[৫৫] এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে– "হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"[৫৬]

সকল পর্যায়ে হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যাকারীকে মৃত্যু দেয়ার বিধান ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতটিতে। অঙ্গহানিতেও অনুরূপ ধরনের বিধান, যে কোন প্রকারের যখম ঘটানোর দণ্ড হিসেবে অনুরূপ দৈহিক যখম ঘটানোর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই যে সব প্রকারের বাড়াবাড়ি ও

---

৫৩ আল-কুরআন, ৪: ৯২

৫৪ আল-কুরআন, ৪ : ৯৩

৫৫ আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

৫৬ আল-কুরআন, ২ : ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে হবে, সংযম সহিষ্ণুতার মাধ্যমে এই কিসাস ও প্রতিকারের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হত্যা ও দণ্ডনীয় হত্যা

হত্যাকে আরবি ভাষায় কাতল বলা হয়। 'বান্দার এমন কোন কর্ম যাহা মানুষের জীবন সংহার করে তাহাই হত্যা'[৫৭]। অন্য ভাবে বলা যায় কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, পাথর নিক্ষেপে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণ নাশ। আর হত্যা বিষয়ক দণ্ড হল হত্যার অপরাধে অপরাধী এবং কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা। যেমন দণ্ডনীয় নরহত্যা। 'যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যু ঘটায় কিংবা দৈহিক জখমে মৃত্যু ঘটাতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটানো উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটায় কিংবা যে কার্য মৃত্যু ঘটাতে পারে মর্মে সে অবহিত আছে, সে কার্য দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, তা হলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় নরহত্যার অপরাধ সংঘটন করেছে মর্মে পরিগণিত হবে।[৫৮]

হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও ধারণা

মহানবী (সা.) তাঁর বাণী, বিদায় হজ্জের ভাষণ এবং মদিনা সনদে হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকারের চেতনা তুলে ধরেছেন। হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও ধারণা হচ্ছে :

হত্যা মোট আট প্রকার :

১. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা
২. মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা
৩. যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা
৪. যিম্মীকে ভ্রমবশত হত্যা
৫. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা
৬. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যা
৭. হরবী কাফির কে ইচ্ছাকৃত হত্যা
৮. হরবী কাফির কে ভ্রমবশতঃ হত্যা।[৫৯]

উল্লেখিত সকল প্রকার হত্যার বিধান কুর'আন ও হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

প্রথম প্রকারের বিধান

প্রথম প্রকারের বিধান হল কিসাস[৬০] ওয়াজিব হওয়া। সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে তাৎক্ষণিক দণ্ড। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ "হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে

---

[৫৭] সালামত আলী খান, *ইসলামে ফৌজদারি আইন*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী , ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১২৫

[৫৮] অধ্যক্ষ এ.এ.এম. মনিরুজ্জামান, *দণ্ডবিধি*(ঢাকা: সামছ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৪৪

৫৯ হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৬০ 'কিসাস' কিসাসুন এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ অনুরূপ । শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। দ্র. হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের জন্যে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[৬১]

আর পারলৌকিক বিধান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি রাখবেন।"[৬২]

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান

কোন মুসলিমকে হত্যা করা হলে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে এবং হত্যাকারী রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে নিহত ব্যক্তির স্বজনদেরকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ "মুসলিমেনর কাজ নয় যে, মুসলিমকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলিমকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে।"[৬৩]

তৃতীয় প্রকারের বিধান

তৃতীয় প্রকারের বিধান হল যিম্মি হত্যার বিনিময়ে কিসাস গ্রহণ করতে হবে। কেননা, দারে-কুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিম্মি হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিমের কাছ থেকে কিসাস নিয়েছেন।[৬৪]

চতুর্থ প্রকারের বিধান

হত্যাকারী চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলে রক্তপণ সমর্পণ করতে হবে নিহত ব্যক্তির স্বজনদেরকে এবং মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়ে বলেছেন– "যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদের এবং একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে।"[৬৫]

পঞ্চম প্রকারের বিধান

সূরা নিসায় ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– "কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বাজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

---

৬১ আল-কুরআন, ২ : ১৭৮

৬২ আল-কুরআন, ৪: ৯৩

৬৩ আল-কুরআন, ৪ : ৯২

৬৪ হেদায়া। উদ্ধৃতি : হযরত মাও.মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

৬৫ আল-কুরআন, ৪: ৯২

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে; তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন– سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا "এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে তারা তোমাদের কাছে এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তোমাদেরকে ফাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ দান করেছি।"[৬৬]

আমরা সূরা নিসার ৮৯-৯১ নং আয়াতে হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধির উদাহরণ পেতে পারি। আলোচ্য আয়াত সমূহে তিনটি দলের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়াতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়াত

আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমণ করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলিম, হিজরত করে মদিনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কায় চলে যায়। এর পর তারা কেউ কেউ বলল এরা কাফির, আর কেউ কেউ বলল এরা মু'মিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ "অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেল? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের সঙ্গ কাজের জন্য।"[৬৭] এই আয়াতে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদের হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত

ইবনে আবী শায়বা হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি খালেদ (রা.) কে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্যে সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কোরায়েশরা মুসলিম হয়ে গেলে আমরাও মুসলিম হয়ে যাব। যে সব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার। যেমন আল-কুর'আনে এসেছে وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا

৬৬ আল-কুরআন, ৪ : ৯১

৬৭ আল-কুরআন, ৪: ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"তারা চায় যেমন তারা কাফের, তোমারাও তেমনি কাফের হয়ে যাও যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তোমরা তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকেও পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানাইওনা।"[৬৮]

ষষ্ঠ প্রকারের বিধান

ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে।" কেননা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব যিম্মীও অভয়প্রাপ্ত কাফিরের অন্তর্ভুক্ত। 'দুররে মোখতার' গ্রন্থের 'দিয়্যাত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয় এরই রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।[৬৯]

সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান

সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইন সিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল হরবের কাফিরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশত হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।[৭০] এ বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃএব তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয় তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবেন এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। (মুক্তিপণ)। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে ঈমানদারগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[৭১]

হত্যার প্রকারভেদ ও তার বিধান

---

৬৮ আল-কুরআন, ৪ : ৮৯
৬৯ হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৭০ বয়ানুল কোরআন। উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত।
৭১ আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা তিন প্রকার–

প্রথম প্রকার

প্রথম প্রকার হত্যা হচ্ছে 'আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই- বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যা লৌহনির্মিত অথবা এমন অস্ত্র অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে যা লৌহ নির্মিত অস্ত্রের মত। যথা– ধারালো বাঁশ, ধারালো পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার

দ্বিতীয় প্রকার 'শিবহুল আমাদ' অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ইচ্ছা করেই হত্যা করা কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার

তৃতীয় প্রকার 'খাতা' অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন– দূর থেকে মানুষকে শিকার, জন্তু কিংবা হরবের কাফির মনে করে লক্ষ্যস্থির করত গুলি করে ফেলা, কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা: যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া, কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ ও রক্ত বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ ও রক্ত বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের পাঁচটি করে উট থাকবে।

তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের বিশটি উট থাকবে। তবে রক্ত বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। তবে ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ হবে। ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়।

উপরে যে তিন প্রকারের হত্যার স্বরূপ বর্ণিত হল; তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহর দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা জানেন এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মুসলিম ও যিম্মীর রক্ত বিনিময় সমান। রাসূল (সা.) বলেন– دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار ।[৭২]

কাফফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরী'আতের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।[৭৩] এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের

৭২ উদ্ধৃতি, হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫
৭৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছৃঙ্খল কাজ কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

- নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কেননা ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয় যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সমপুর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
- যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা রক্ত বিনিময় তাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।[৭৪]
- চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয় প্রাপ্ত) এর ক্ষেত্রে যে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয় যখন যিম্মী কিংবা অভয় প্রাপ্তের পরিবার পরিজন বিদ্যমান থাকে না, থাকারই শামিল এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যাবে।[৭৫]
- নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে, রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না।[৭৬]
- ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফফারা নেই তওবা করা উচিৎ।[৭৭]

হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি: ইসলাম

কিসাসুন এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়।

শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

বিধানসমূহ

ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় 'কিসাস' অর্থাৎ জানের বদলায় জান, এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

- শরী'আতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়্যাত বা অর্থ দণ্ড প্রদান করতে হয়। তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের আলোচিত ওজন অনুপাতে এক দেরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সে মতে পূর্ণ দিয়্যাত এর পরিমাণ দু'হাজার নয়শ তোলা আট মাসা রৌপ্য।
- 'কিসাস' এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়্যাত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপশ নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

---

৭৪ প্রাগুক্ত।

৭৫ দুররে মুখতার, উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

৭৬ বয়ানুল-কুরআন, উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

৭৭ বয়ানুল-কুরআন, উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা কোন অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সুক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়ি ও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফিকাহবিদগনের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস' এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।[৭৮]

হত্যাবিষয়ক দণ্ডবিধি কার্যকরণে শুধু ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। তার উপর ইহসান ও সকলের প্রাপ্য। যদি এক পক্ষের ২০০ লোক অন্য পক্ষের ৩০০ লোকের সঙ্গে শত্রুতা করে এবং হত্যার ইচ্ছা নিয়ে অহেতুক ক্ষুদ্র স্বার্থে বা ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল হিসেবে মারামারি করে এবং দু'পক্ষেরই সর্বসমেত ২৫ জন লোক মারা যায়। তবে আদল বা বিচার অনুসারে ২০০+৩০০= ৫০০ -২৫= ৪৭৫ জনেরই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিৎ। এটা হল আদল। কারণ দলের প্রত্যেকটি লোক অন্যদলকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করেছিল এবং কিছু লোককে হত্যাও করেছে।

হাম্বলী মাযহাব মতে অনুরূপক্ষেত্রে সকলেরই মৃত্যুদণ্ড হবে। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন এখানে আদলের উপর ন্যায় বিচার কিন্তু ইহসান নয় কারণ এতে বহু পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে দুঃখ অশান্তি নেমে আসতে পারে। তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যাদের প্রত্যক্ষ আঘাতে ২৫ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং যারা খুব বেশী আক্রমনাত্মক হয়ে মারামারি করেছে বা অন্যদেরকে প্ররোচিত করেছে, এরূপ আরও কিছু লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বাকীদেরকে রহম এবং ইহসান করে মৃত্যুদণ্ডের কম শাস্তি দেয়ার জন্য। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে বিচার এবং ইহসান দু'টোরই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে যারা মযলুম এদের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং তাদেরকে 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ একটি পূর্বশর্ত।[৭৯]

মদিনা সনদের অনুচ্ছেধ ২১ এ বলা হয়েছে "কেউ যদি মুসলিমকে হত্যা করে এবং তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তবে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা নিহত ব্যক্তির প্রতিনিধিরা রক্তমূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। মুমিনরা সব সময়ে হন্তার বিপক্ষে এবং কোন ক্রমেই তারা তার বিরোধিতা থেকে পিছপা হবে না। "

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে গণহত্যা ও হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি

গণহত্যাজনিত অপরাধ নিরোধে ও তার শাস্তি সম্পর্কিত কনভেনশন (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) এর ১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"শান্তি অথবা যুদ্ধকালে -যখনই সংঘটিত হোক না কেন, গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে একটি অপরাধ। পক্ষসমূহ তার নিরোধ ও শাস্তি বিধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"[৮০]

---

৭৮ উদ্ধৃতি, হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৭৯ মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৮০ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অত্র কনভেনশনের ৪ নং অনুচ্ছেদে হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে-"যে সব ব্যক্তি গণহত্যা সংঘটন করবে , তারা সংবিধান অনুসারে দায়িত্বশীল শাসক হোক অথবা সরকারী কর্মকর্তা হোক অথবা বেসরকারী ব্যক্তি হোক, সে সব ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হবে।"[৮১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

জীবন রক্ষার সাথে সাথে সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের একান্ত প্রয়োজন। জীবনের নিরাপত্তার জন্য চাই সম্পত্তির বা সম্পদের নিরাপত্তা। কেননা বিশ্বশান্তির জন্য মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা সর্বপ্রথম । আইয়ামে জাহিলিয়ায় ছিনিয়ে নেয়া হতো অন্যের সকল সম্পদ। হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা ছিল সর্বত্র। রাসূল (সা.) তাঁর বাণী, ঐতিহাসিক ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সম্পদের নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। রাসূলে করিম (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, "তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র।"[৮২] 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুকের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন- মু'মিনের মাল (অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা) তেমনি হারাম যেমন হারাম তার রক্ত (রক্তপাত)। একজন অমুসলমানের জীবন, সম্পত্তি ইসলামী আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অমুসলমানের সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই। খালিদ ইবনে যিয়াদ আল-আবুদীর সাথে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করেন-" খালিদ বিন যিয়াদ যে ভূ-সম্পদসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই মালিকানাধীন থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাঁকে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে হবে- যাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল।"

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন গ্রন্থের ধারা ১২৭৮ -এ বলা হয়েছে "মালের মালিকানা লাভের অধিকার।" শরী'আত সম্মত বৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন মালের মালিকানা লাভ করতে পারে এবং বৈধ কোন কারণ ছাড়া উক্ত অধিকার হতে বঞ্চিত করা যায় না।"[৮৩]

ধারা : ১২৭৯

ক) ভোগ-ব্যবহারের অধিকার

খ) অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার

গ) সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার

ঘ) মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করার অধিকার।[৮৪]

সরকার কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামগ্রিক স্বার্থে অধিগ্রহণের সত্যিকার প্রয়োজন মনে করলে মালিককে উপযুক্ত মূল্য প্রদানের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে পারবে। মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের

---

৮১ প্রাগুক্ত,পৃ.৪৬৭

৮২ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ(রহ.) আল কুশায়রী আন নিশাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯

৮৩ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ৭৭৪

৮৪ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রগুক্ত, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) যে স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন তা ছিল দুই ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন। তারা তাদের মালিকানাধীন জমি খন্ডটি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য দান করতে সম্মত হয়ে ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমান পূর্বক মূল্য নির্ধারণ করেন এবং তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী উহার মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।[৮৫] খালিদ ইবন যিয়াদ আল-আবুদির সাথে কৃত চুক্তিপ্রত্রে বলা হয়েছে- "খালিদ বিন যিয়াদ যে ভূ-সম্পদসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই মালিকানাধীন থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাঁকে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে হবে- যাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল।" প্রকৃতপক্ষে ইমাম (সরকার) কোন প্রতিষ্ঠিত আইনগত অধিকার ছাড়া কোন ব্যক্তির মালিকানা হতে তার কোন মাল নিতে পারেন না।[৮৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।'

মাল বা সম্পত্তির পরিচয়

মাল বা সম্পত্তির ইংরেজী প্রতিশব্দ Property আর Property শব্দের অর্থ হচ্ছে- আইনসিদ্ধ অধিকারের বিষয়বস্তু অথবা সম্পদের দখল। Property শব্দটি ল্যাটিন Proprietas থেকে Proprite হয়ে ইংরেজীতে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে দ্রব্যের নিজস্ব প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য।[৮৭]

ব্যাপক অর্থে ব্যক্তির বর্ণনাযোগ্য সকল আইনসিদ্ধ অধিকার সম্পত্তির আওতাভুক্ত। একজন মানুষের সম্পত্তি বলতে সেসব কিছুকেই বোঝায়, আইনসিদ্ধভাবে যা তার অধিকারে আছে, এই ধারণাটি অতীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিককালে তা প্রায় উঠেই গেছে। এ ধারণা মতে, ব্যক্তির স্বাধীনতা, জীবন, খ্যাতি, যশ, স্ত্রী, দাস ইত্যাদি সবই সম্পত্তি বলে গণ্য।

সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তির মালিকানার অধিকার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। সব রকমের মালিকানা এবং স্থাবর সম্পত্তির অধিকার সম্পত্তির অধিভুক্ত। সম্পত্তির আইন মূলত মালিকানার অধিকার সংক্রান্ত আইন। এ অর্থে লাখেরাজ জমি, ইজারার বলে অর্জিত জমি, স্থাবর সম্পত্তির পেটেন্ট, গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি সম্পত্তি বলে গণ্য, কিন্তু চুরির আয় ও ঋণ সম্পত্তি নয়।[৮৮]

মাল বা সম্পত্তি বলতে এমন বস্তু বা বিষয়কে বুঝায় যার উপযোগিতা রয়েছে এবং যার উপর মানুষের অধিকার শরী'আত ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। বস্তুগত মাল হচ্ছে ঘর-বাড়ী, দালানকোঠা, ভূমি দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

সম্পত্তির প্রকারভেদ

প্রথমত, সম্পত্তিকে শরীরী (Corporeal) এবং অশরীরী (Incorporal) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর সম্পত্তি স্পর্শন দ্বারা বোধগম্য কেননা এর বাস্তব স্বত্বা বা অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুগত জিনিসের উপর মালিকানার অধিকার হচ্ছে বস্তু বা জিনিস ব্যবহারকারীর সাধারণ স্থায়ী ও উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়তা। ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা হচ্ছে এর উপর ব্যবহারকারীর সামগ্রিক

---

৮৫ নাঈম সিদ্দিকী, *মাহাসিন ইনসানিয়াত*(লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৭২ খৃ.), পৃ. ২২৪

৮৬ আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, উদ্ধৃতি : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ.৭৭৬

৮৭ গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, পৃ. ৩৫৮

৮৮ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার। অশরীরী সম্পত্তি হচ্ছে এমন প্রকৃতি, যা স্পর্শন দ্বারা বোধগম্য নয়। অর্থাৎ ধরা ছোয়ার বাইরে।

শরীরী বা বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন সম্পত্তিতে এর স্থানান্তরযোগ্যতার দিকটি বিবেচনা করে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) অস্থাবর এবং (২) স্থাবর। স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর অযোগ্য। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভূমি। স্যামন্ডের (Salmond) মতে- "স্থানান্তর অযোগ্য এক টুকরা জমির অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ।"[৮৯] এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভূপৃষ্ঠের তলদেশ, পৃথিবীর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত।

সম্পত্তির উপরোক্ত বিভক্তিকে বাস্তব (real) এবং ব্যক্তিগত (personal) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বাস্তব সম্পত্তি সাধারণ ভূমিকেই নির্দেশ করে। আর ভূমি বলতে শুধু ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগকেই বোঝায় না বরং পৃথিবীর বহিরঙ্গে এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থায়ী প্রকৃতির সবকিছুই স্থাবর সম্পত্তি বলে বিবেচ্য। যেমন খনিজ দ্রব্য, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে স্থানান্তর যোগ্য মালিকানার অধিভুক্ত সবকিছুকে বোঝায়। এর আওতায় পড়ে নোট, স্টক, টাকা ইত্যাদি; এমনকি অস্থার সম্পত্তিও অবাস্তব সম্পত্তির পরিধিভুক্ত।

মালিকানার সংজ্ঞা

মালিকানা শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার সম্বন্ধীয় দাবি। মালের মালিকানা অর্থ হচ্ছে মালের অধিকার। কোন মাল দখলে রাখার, ব্যবহার করার, ভোগ করার, দান করার, বিক্রয় করার অধিকারকেই মালিকানা বলে। অধিকার বলতে বুঝায় মালের মালিক হওয়ার অধিকার। প্রত্যেক মানুষ চায় মালের মালিক হতে, জীবন যাপন, পরিবারের ভরণ–পোষণ, সন্তানের শিক্ষা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, রোগে-শোকে চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য মানুষ মালের মালিকানা লাভ করতে চায়।

সম্পত্তি অর্জনের উপায়

সম্পত্তি অর্জনের চারটি উপায় রয়েছে। উপায়গুলো হচ্ছে:

ক. দখল (prssession) ।

খ. দীর্ঘ ভোগজনিত অধিকার (prescription) ।

গ. চুক্তি বা সমঝোতা (agreement) ।

ঘ. উত্তরাধিকার (inheritance) ।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিকানার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিকানা দৃশ্যত ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকেই নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত মালিকানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, কাউকে তার সম্পত্তি থেকে যথেচ্ছভাবে, খেয়ালখুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না। এটা হচ্ছে ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষাকবচ।

---

৮৯ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতীক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে মানুষ ইচ্ছামত সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত হতে পারে। অবসরকালে সুখী সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

সার্বজনীন ঘোষনায় বলা হচ্ছে যে, কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না।

ইসলামী শরী'আতে হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু কর্তব্য থেকে যায়। যেমন– যাকাত আদায়, দান খয়রাত করা, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের লালন-পালন ও যত্নের ব্যয়ভার বহন, রাষ্ট্রের আরোপিত কর প্রদানসহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প, জ্বলোচ্ছাস, মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা দান। এসব শর্ত পালন করলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

ইসলামী শরী'আত অনুসারে সম্পদের মালিক কতগুলো অধিকার ভোগ করেন। যেমন-

প্রথমত: সম্পত্তির মালিক সম্পদের ভোগের ও ব্যবহারের অধিকার রাখেন। তবে এক্ষেত্রে সামান্য সীমাবদ্ধতা আছে। সম্পত্তি বা সম্পদ অপচয় করার অধিকার ইসলাম প্রদান করে না। সম্পদের মালিক হলেই এর যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে ইসলাম তা স্বীকার করে না। হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ সৎ, সঠিক ও কল্যাণমূলক খাতে খরচ করতে বলা হয়েছে। সম্পত্তি ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অপচয় এই দু'টিকেই ত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সম্পত্তির মালিকের অধিকার আছে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার, তবে এ ক্ষেত্রে অসৎ পথ অবলম্বন করা তথা কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, সুদের কারবার ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে যে, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন।"[৯০]

তৃতীয়ত: সম্পদের স্বত্ব রক্ষা এবং মালিকানা হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে সম্পদের মালিকের। স্বত্বরক্ষা সম্পর্কে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[৯১] সরকার জাতীয় প্রয়োজনে বা সামগ্রিক মূল্য প্রদান করে তা গ্রহণ করতে পারেন। কথিত আছে যে, মদিনায় মসজিদে নব্বী নির্মাণের জন্য মহানবী (সা.) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তার মালিক ছিল দুজন ইয়াতিম বালক। বালকদ্বয় জমিটি মসজিদের জন্য বিনামূল্যে দান করতে চেয়েছিল কিন্তু মহানবী (সা.) অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করলেন, এবং তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী তা পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করলেন।

সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার

৯০ আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৯১ আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও রক্ষার অধিকার ঘোষণা করেন এবং এর যথার্থ বাস্তবায়নও করেছিলেন। রাসূল (সা)- এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সম্পদের যে অধিকার বিধৃত হয়েছে তা ঘোষিত হয়েছে UDHR এর ১৭ অনুচ্ছেদে এভাবে:

অনুচ্ছেদ : ১৭ (১) প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে এবং অন্যের সাথে যৌথভাবে সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকারী।[৯২] অর্থাৎ প্রত্যেকেরই একাকী এরং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৭ (২) কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[৯৩] অর্থাৎ কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমত বঞ্চিত করা চলবেনা।

মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকান কনভেনশনের অনুচ্ছেদ- ২১ এ সম্পত্তি লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২ এ সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।[৯৪]

অনুচ্ছেদ : ৪২ (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যায়ভাবে বিলি ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রয়াত্ত বা দখল করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ৪২ (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহন, রাষ্ট্রয়াত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হবে এবং ক্ষতিপুরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে। তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন উত্থাপন করা যাবে না।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার নীতি বর্ণিত হয়েছে এভাবে [৯৫]

অনুচ্ছেদ : ১৩ উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হবে:

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

খ) সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

(৫) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণে সার্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

---

৯২ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

৯৩ প্রাগুক্ত।

৯৪ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান*(আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩১ শে মে ২০০০ পর্যন্ত সংশোধিত), পৃ. ১২

৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সকল স্তরের মানব সমাজের উপর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে মানবাধিকার সমুন্নত করেছে। ‘ যে জ্ঞান অর্জনের পথ ধরল, সে জান্নাতেরই পথ ধরল।’[৯৬]

‘জ্ঞান অর্জন কর যদি এজন্য সুদূর চীনে পর্যন্ত যেতে হয়[৯৭]।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় বলেন“

"خذوا عنى منا سككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا"

‘তোমরা তোমাদের হজ্জের বিধি-বিধান আমার নিকট হতে শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।’ রাসুলূল্লাহ (সা.) শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন-

“فيبلغ الشاهد الغاءب رب مبلغ اوعى من سامع

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই নির্দেশ পৌঁছায়ে দিবে। কেননা অনেক সময় বাহকের তুলনায় শ্রোতা অধিক স্মৃতিধর হয়ে থাকে।” [৯৮]

ইসলাম বলে জ্ঞানী ও মূর্খ সমান হতে পারে না। ইসলাম বলে জ্ঞানীর মর্যাদাই সমুন্নত । ইসলামে জ্ঞানীর কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয করেছে। ইসলামে মানবাধিকার সম্পকির্ত ঘোষণা “১৯৯০ কায়রো ঘোষণা(Cairo Declaration)” এখানে বলা হয়েছে -ধারা ঃ (৯ ক) জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র শিক্ষা অর্জনের সকল পদ্ধতিকে সহজলব্য এবং সমাজের স্বার্থে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বহুমুখী করার নিশ্চয়তা দিবে যেন তা মানবজাতির কল্যাণে লাগে এবং মানুষকে ইসলাম ও বিশ্বের প্রকৃত অবসস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। (খ) বিভিণ্ন শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, পরিবার, স্কুল , বিশ্ববিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি থেকে ধর্মীয় এবং দুনিয়াবী শিক্ষা লাভের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। এ শিক্ষালাভের অধিকার এমন হতে হবে। যে শিশুর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও সার্বিক প্রতিভার স্ফুরণে , স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় করণে এবং মানুষ হিসাবে তার অধিকার ও কর্তব্য বা দায়-দায়িত্বের (Obligation) প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির ফলে তার মানসিক স্থিতি ও উৎকর্ষ সাধন সহজতর হয়।[৯৯] শিক্ষার সার্বজনীন মানবাধিকারের বিষয়টি এসেছে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি“ অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights). এর ১৩ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৯৬ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা’আ ফী ফযলিল ইলমি, হাদীস নং ২৫৭০

৯৭ বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬১২

৯৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৫, পৃ.২৬৬; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৭; সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ. ১৯১। উদ্ধৃতি : *সীরাত বিশ্বকোষ*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খৃ.), খ. ১২, পৃ. ৫৩০

৯৯ মুহম্মদ মতিউর রহমান, *মানবধিকার ও ইসলাম*(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , ২০০২খৃ.), পৃ.৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরহ মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

সুশিল সমাজের জন্য সামাজিক নিরাপত্তালাভ মানবাধিকার বিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। প্রাক ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা চিল অত্যন্ত জঘন্য ও শোচনীয়। মদ্যপান, জুয়া খেলা, অত্যাচার , অনাচার, ব্যভিচার, লুট-তরাজ, চুরি, ডাকাতি, রাহাযানি, খুন খারাবি ইত্যাদি ছিল তখনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। শিশু হত্যা, নারী নির্যাতন, গোত্র কলহ, আইন শৃঙ্খরলার অভাবে অরাজকতা, পাপাচার ও কুসংস্কাররে গোটা বিশ্ব - বিশেষ করে আরব সমাজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। নীতিবোধ ও মানবাধিকারের অবর্তমানে আরবের সমাজ ব্যবস্থা অধঃপতনের চরম পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। আরবের মত বিশ্বে অন্যান্য জাতিগুলোর সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা ও চরম অধঃপতিত ছিল। এমনি এক মহা দুর্যোগময় যুগ সন্ধিক্ষণে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আর্বিভাব। তিনি সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন । আর তাইতো মহনবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাণী ,ভাষণ বিশেষ করে চুক্তিসমূহে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথ ভাবে ফুটে উঠেছে। রাসুলূল্লাহ (সা.) তাঁর বাণীতে বলেন- 'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার ফেতনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ নয় সে বেহেশতে যেতে পারবে না।[১০০] 'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে সে আমার প্রতি বিশ্বাসী নয়[১০১]।' মহানবী (সা.) হিলফুল ফুযুল চুক্তিতে উল্লেখ করেন-"আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করব। অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব। অত্যাচারিতকে সেবা করব। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করব,বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব।" মদিনার সনদে (১৫ ,১৬ এবং ৪২ নং ধারা হতে ৪৭ নং) সামাজিক নিরাপত্তার বিসয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

১৫ নং ধারা "আল্লাহর নিরাপত্তা সামগ্রিক। সম্প্রদায়ের একজন নগণ্য সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাও যুক্তভাবে সবার জন্য পালনীয়। অন্য মানুষের বিপক্ষে এক মুসলিম অন্য মুসলিমের মাওলা বা সহযোগী"।

১৬ নং ধারা 'যে সব ইয়াহুদী আমাদের অনুসারী হবে তারা আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে । এ সম্পর্কে ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন তারা মুসলিমদের ক্ষতি করবে না বা তাদের বিরুদ্দে অন্যদের সাহায্য করবে না'।

৪৪ নং ধারা 'ইয়াছরিব (মদিনা) কে আকস্মাৎ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সনদে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাহায্য (আল্লাহর তরফ হতে)।

৪৫ যখনই তাদেরকে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে আহবান করা হবে বা চুক্তি মেনে নিতে বলা হবে তারা তা সম্পাদন করবে। এবং মেনে নিবে যতক্ষন তারা এরুপ কোন কিছুর দিকে মুমিনদেরকে আহবান করবে তখন মুমিনরা তাদের সে আহবানে সাড়া দিবে। তবে যারা দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত তাদের কথা ভিন্ন।

৪৫ক. পূর্বের ন্যায় প্রত্যেকেই স্বীয় অংশ পাবে।

---

১০০ মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবু তাহরীমি ইযাইল জারি, হাদীস নং ৬৬

১০১ আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*(মওসূল : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ- ১৯৮৩),বাবু ওয়া আম্মা হাদীসু ওমারা, হাদীস নং ৭৫০

Dhaka University Institutional Repository

৪৬ আউস গোত্রের ইয়াহুদী ও তাদের মাওয়ালীসহ এই চুক্তিতে আবদ্ধঅন্যান্যদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হবে যদি তারা এ সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের সাথে ভাল আচরণ কর কল্যাণ, প্রতিজ্ঞাপালন ও ভাল কাজ সব গুনাহের প্রতিবন্দক। যদি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধ করে তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে। আল্লাহ অত্যন্ত ন্যায় ও সংগতভাবে এ দলিল পালন করবেন।

৪৭ নং ধারা "এ দলিল জালিম ও অপরাদীদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না্ যারা অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা ব্যতিরেকে যে বেরিয়ে যাবে সে নিরাপদ হবে আর যে মদীনায় অবস্থান করবে সেও নিরাপদে থাকবে। যে কল্যাণমূলক ও সম্মানজনক কাজ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ তার নিরাপত্তাবিধানকারী।" হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি এসেছে -

بسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو' اصطلحا على وضع الحرب

عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض'

"দয়াময় প্রভূর নামে। এ চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ও সুহাইল ইবনে আমর এর মধ্যে সম্পাদিত। উভয়ে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, তারা আগামী দশবছর যাবত কোন যুদ্ধ করবে না। এ সময়কালের মধ্যে মানুষ নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে ও একে অপরের উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বানু যামরার মৈত্রীচুক্তিতে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি স্থান দিয়েছেন এভাবে – "(১). তাদের প্রতি যে কোন বহিরাক্রমনের মুকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা হবে।
(২). আল্লাহর নবীর সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের জন্য জরুরী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর নবী যখনই তাদেরকে সাহায্যেও জন্য আহবান জানাবেন তখনই তারা সাহায্য দানে বাধিত ধাকবে তবে ধর্ম যুদ্ধে সাহায্য করা তাদের জন্য জরুরী হবে না।
(৩) তারা যতদিন চুক্তির উপর প্রতিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের সাহায্য সহোযোগিতা করা হবে।
বানূ আদিয়ার গোত্রের চুক্তিতেও সামাজিক নিরাপত্তার উপর জোর দেয়া হয়েছে এভাবে- " দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ দলীল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে বানু আদিয়া - এর সদস্যদের জন্য সম্পাদিত। তাদের পুরাপুরি নিরাপত্তা প্রদান করা হলো । তারা জিযইয়া প্রদান করবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।" সমাজে সদস্যদের স্বার্থ পরস্পর বিজড়িত। ইসলাম ঘোষণা করে যে, সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে রয়েছে প্রীতি-ভালোবাসা, দয়া, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ , সহযোগিতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক। ইসলাম সকলের জন্য সকলের উপর শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সকল ব্যক্তি গোষ্ঠী এবং সকল কর্তৃত্বের জন্য কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেয়, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বাত্নক শান্তি। ইসলামে সামমাজিক নিরাপত্তার চিন্তাধারাকে কার্যকর করে এভাবে (১) ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অনুভূতি,(২) দয়া ভালোবাসার অনুভূতি, (৩) সহযোগিতা এবং পারস্পারিক দায়িত্বানুভূতি, (৪) জীবনের উন্নত লক্ষ্য। ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম থাকলে আইনগত সুবিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাওয়া যায়। ইসলামি শাসন ব্যবস্থা শাসক শাসিতের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়নীতির সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তা মানবাধিকারের অন্যতম চালিকা শক্তি। অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে : যেমন- অনুচ্ছেদ ঃ১ 'সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা (Status) নির্ধারণ করবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অনুধাবন করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার প্রসঙ্গ

জাহেলী যুগে আরবের সর্বত্রই সুদের রমরমা ব্যবসা ছিল। চক্রবৃদ্ধি সুদের যাতাকলে নিষ্পেষিত হত দরিদ্র জনগণ। অনেক সময় সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে দরিদ্র জনগণ মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে প্রভুর সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনে নিজের জীবন জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য হত। বিদায় হজ্জের সে স্মরণীয় মুহূর্তে একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণ নির্যাতনের সে মহাদানবের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়। মানবতার মুক্তির কান্ডারী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) সুদের জাল ছিন্ন করে মানবতার মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করে মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন-" আজ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মদের ব্যবসা এবং সুদী কারবার চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিলেন"।[১০২] আর তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করলেন-"জাহেলী যুগের সকল সুদ বাতিল করা হল। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এর পাওনা সুদ রহিত করলাম। উহা সম্পূর্ণই রহিত করলাম।"[১০৩] মিনায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন "সাবধান! জাহিলিয়াতের সকল সুদ রহিত করা হল। তোমরা কেবল মূলধন ফেরত পাবে"।

উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদের কারবার করতেন। অনেক লোকের কাছে তাঁর সুদের টাকা পাওনা ছিল। রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম তাঁর সুদ বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[১০৪] রাসূল (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণের এই অংশ বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার উদ্ভাসিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে সুদ। সুদ মানুষকে সর্বহারা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না ঘটিয়ে পুঁজিকে অলস রাখতে উৎসাহ দেয়। বিশেষ করে সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদ বাতিল করার মাধ্যমে তদানিন্তন সমাজের অর্থনৈতিক অধিকারকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন।

রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে উদ্ভাসিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার প্রতিফলিত হয়েছে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২২ নং অনুচ্ছেদে । বলা হয়েছে- "সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে; প্রত্যেকেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধ ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ববান।"[১০৫]

---

[১০২] মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাবু হাজ্জাতুন নবী,হাদীস নং ২১৩৭

১০৩ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

১০৪ আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহ.) ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২

১০৫ গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

অর্থনৈতিক নিরপত্তার বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিরাপত্তার বিষয়টি এর অন্তর্ভূক্ত। জীবিকা অন্বেষণ, অর্জন, উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, বন্টন, বিনিয়োগ, লেন-দেন তথা ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়। মানুষের যদি জীবিকা অন্বেষণের স্বাধীনতা এবং অর্জনের উপায় না থাকে, ঋণ গ্রহণে সুদের শর্তারোপ থাকে, উৎপাদিত সম্পদে সকলের সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের সুবিধাও নিশ্চিত না থাকে, উৎপাদিত সম্পদে সকলের প্রাপ্য যদি যথার্থভাবে রক্ষিত না হয়, নিজের উপার্জন থেকে পরিমিত পরিমাণ ভোগের নিশ্চয়তা যদি না থাকে তাহলে যে অনিশ্চয়তা অস্থিরতা দেখা যায় সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতারই পরিচায়ক। তাই সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আবশ্যক। প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে যে, সে সামাজিক নিরাপত্তার হিসেবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করবে।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনীতি মানবজীবনের সে সব দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে যেগুলোর সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি ব্যক্তির যে সব অধিকারের সাথে অর্থের যোগ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অথনৈতিক অধিকার। নিম্নে সংক্ষেপে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

জীবিকার অধিকার

পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত, মানুষের প্রয়োজন অসীম। অসীম অভাব আর প্রয়োজনের মধ্যেই এমন কিছু আছে যেগুলো ছাড়া মানব জীবন অচল। জীবিকার প্রয়োজন এর মধ্যে অন্যতম। জীবনের নিম্নতম প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষকে জীবিকার খোঁজে বেরুতে হয়। জীবিকা অন্বেষণ এবং জীবিকা অর্জনের অধিকারটি মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেউ যদি কোন ব্যক্তির জীবিকার অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে ঐ ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকারটিই হরণ করা হলো। জীবিকার অধিকারের মধ্যে দুটি বিষয়- একটি হচ্ছে নিজের যোগ্যতা, সামর্থ ও রুচিমত নিজের জীবিকা বেছে নেয়ার ও নিজের ইচ্ছামত জীবিকা অন্বেষণ করার অধিকার। অপরটি জীবিকা অর্জনের অধিকার। জীবিকার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতিন সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এটা মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার। ব্যক্তি যে দেশে বাস করেন সে দেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে জীবিকা অন্বেষণ ও অর্জনের অধিকার সে ব্যক্তির রয়েছে। জীবিকার অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কোন ব্যক্তিকে কোন অজুহাতেই বঞ্চিত করা যাবে না। কারণ এটা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য মৌলিক অধিকার।[১০৬]

সঞ্চয়ের অধিকার

১০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি যা উপার্জন বা আয় করবেন তা থেকে প্রয়োজনমত ভোগ করে অথবা ভোগকে আপাত সংযত রেখে সঞ্চয় করতে পারেন। ভবিষ্যতেও সম্ভাব্য সংকট, দুর্যোগ ইত্যাদি মোকাবেলার জন্য এই সঞ্চয় প্রবণতা। প্রতিটি ব্যক্তির সঞ্চয় করবার অধিকার রয়েছে এবং অধিকার রয়েছে নিজের সঞ্চয়কে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত রাখবার। এই অধিকারটি অধিকারভুক্ত।[১০৭]

বিনিয়োগের অধিকার

কোন ব্যক্তি যা সঞ্চয় করলেন, তাকে মুনাফা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত বেশী। নিতান্ত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং ধ্বংসাত্মক কোন ক্ষেত্র ছাড়া বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় না। বিনিয়েগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

অর্থ মানব জীবনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অনেক দেশেরই নেই। তাই সেই সব দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অর্থনৈতিক দুরবস্থা একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। বিকাশমান দেশগুলোর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা রয়েছে, যা ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করছে।[১০৮]

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ঋণ এবং অনুদান। অন্য রাষ্ট্রকে ঋণ এবং অনুদান প্রদানের রীতি অনেক শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। বর্তমানে তা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ঋণ বা অনুদান প্রদানের বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করতে গিয়ে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ বা ঋণপত্র হস্তান্তর করে না বরং ঋণ হিসেবে পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করে। এরূপ ঋণপ্রদানকারী দেশ স্পষ্টতই তার নিজস্ব শিল্পের উন্নতি সাধন করতে পারে। এতে করে ঋণপ্রদানকারী রাষ্ট্রের সাথে ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে পারে। প্রায়শই ঋণের সুদের হার নগণ্য হয়। তাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার লাভের জন্য মহানবী (সা.) সুদকে হারাম করেছেন। সুদের কুফল অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। কেননা সুদ একটি যুলুম ও শোষণের হাতিয়ার। সুদের অনিষ্ট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নিম্নে সুদের অপকারিতার কিছু দিক তুলে ধরা হল:

---

১০৭ প্রাগুক্ত।

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১. সুদ কার্পণ্য ও অর্থলিপ্সা সৃষ্টি করে : সুদী কারবার মানুষকে অর্থ পিচাশে পরিণত করে। সুদ পাওয়ার লোভে সুদখোর সর্বদা স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য ও অর্থ পুজায় ব্যস্ত থাকে। তারা সমাজের অন্য লোকদের সাথে রক্তচোসার মত আচরণ করে। সুদী সমাজে আর্থিক লেন-দেন সুদই একমাত্র মানদন্ড। যারা সুদ দিতে পারে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ দিয়ে অপেক্ষা করে কিন্তু যারা সুদ দিতে পারে না, তারা শত চেষ্টা করেও এদের কাছে এক পয়সা পায় না।

২. সুদ মানুষকে সর্বহারা করে : দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আপদে বিপদে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নেয়, কিন্তু তারা তা পরিশোধ করতে পারে না। অনেক সময় এ সুদ বংশানুক্রমে চলতে থাকায় দাদার সুদ নাতিকেও পরিশোধ করতে হয়।

৩. সুদ সমাজে ঘৃণা ছড়ায়: সুদের মাধ্যমে মহাজন গরীবকে শোষণ অব্যাহত রাখে। ফলে সুদখোরদের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা জন্মে।

৪. সুদ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়: দেশে যারা সঞ্চয় করে তারা নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের পথ পরিহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে যেতে চায় না। তারা বিনা পরিশ্রমে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে সুদ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। ব্যাংকও ঝুঁকিমুক্ত ও নিশ্চিত আয়ের আশায় আমানতের মোটা অংশ সরকারী সিকিউরিটি ক্রয়, হুণ্ডি ভাঙ্গানো, ফটকা কারবার প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির অভাব দেখা যায়। এতে সুদের হার আরও বেড়ে যায়।

৫. সুদ পুঁজিকে অলস রাখতে উৎসাহিত করে : ঋণদাতাগণ বেশি সুদের আশায় সহসা ঋণ দেয় না। এজন্য বহু অংশ অলসভাবে পড়ে থাকতে পারে। যদি আগেই ঋণ দেয়া হয় আর পরে সুদের হার বেড়ে যায় তবে আর হার বাড়ানো যায় না বলে ঠকতে হবে। এই ভয়ে সুদী ঋণদাতাগণ ঋণদানে বিরত থাকে। এত বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

৬. সুদ অকল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেয় : সুদী ব্যবসায় ব্যাংক ঋণ সেসব খাতে প্রদত্ত হয় যেখানে মুনাফা সর্বাধিক। যে প্রকল্পে মুনাফা কম সে প্রকল্প জন কল্যাণমূলক হলেও তাতে ঋণ দেয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্যের গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্প দেশের জনগণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় হলেও অর্থ খাটান অনেক সময়েই হয় না, অথচ চলচ্চিত্র বা টিভিসেট সংক্রান্ত প্রকল্পে অতি সহজেই অর্থ পাওয়া যায়।

৭. সুদ সঞ্চয়ীদের অলস করে : সুদী ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখলে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়। এ কারণে সঞ্চয়ীগণ অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। উৎপাদন কার্যে ও ব্যবসায় যে পরিকল্পনা, চিন্তা-ভাবনা ও ঝুঁকির প্রয়োজন ব্যাংকের আমানতকারীগণ তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। এক কোটি টাকা ব্যাংকে আমানত রাখলে এবং ব্যাংক ১০% হারে সুদ দিলে বছরে ১০,০০,০০০.০০ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। যার এরূপ সুযোগ জুটে তার আর কিছু করা দরকার পড়ে না।

১০. সুদ দ্রব্যের দাম বাড়ায় : ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী যদি সুদে ঋণ গ্রহণ করে তবে সে ব্যাংকের প্রদত্ত সুদ উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করে। এতে পণ্যমূল্য বেড়ে যায় এবং এর ফলে সুদমুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বেশি হয়। সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য = খাজনা + মজুরী + সুদ + মুনাফা। সুদমুক্ত অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য = খাজনা + মজুরী + মুনাফা। একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে সুদী অর্থনীতিতে খাজনা বাবদ ৫ টাকা, মজুরী বাবদ ১০ টাকা, সুদ বাবদ ৩ টাকা এবং

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফা বাবদ ২ টাকা সর্বমোট ২০ টাকা প্রয়োজন হয় এবং দ্রব্যটি ২০ টাকায় বিক্রি করা হয়। কিন্তু সুদমুক্ত অর্থনীতিতে খাজনা বাবদ ৫ টাকা, মজুরী বাবদ ১০ টাকা এবং মুনাফা বাবদ ২ টাকা সর্বমোট ১৭ টাকা দ্রব্যটি উৎপাদন করতে প্রয়োজন এবং এই ১৭ টাকায়ই দ্রব্যটি বিক্রি করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য কম পড়ে।

১১. সুদ অর্থণৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে : সুদ ধনীদের আরও ধনী এবং গরীবদের আরও গরীব করে। ক্রমে ক্রমে ধনীর সংখ্যা কমে কয়েকজনে নেমে আসে। তাদের হাতেই দেশের অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়। অপরপক্ষে গরীবের সংখ্যা বেড়ে যেতে যেতে দেশের প্রায় সব মানুষ নিঃস্ব ভূমিহীনদের কাতারে দাড়ায়। যারা ধনী এবং অধিক ঋণ বহন করার ক্ষমতা আছে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়। অপরপক্ষে দরিদ্র, নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে চড়া হারে সুদের শর্তে ঋণ দেয়া হয় অথচ তাদের সুদ দেয়ার ক্ষমতা নেই। ফলে তারা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়।

সুদ যুলুমের উপর বিদ্যমান। ঋণদাতা কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে সুদে ঋণ দেয়। সুদ দিতে পারবে কি-না বা সে ঋণ ব্যবসায় বা উৎপাদনে খাটিয়ে ঋণগ্রহীতা লাভ বা লোকসান করল কি-না তা ঋণদাতা দেখার প্রয়োজন মনে করে না। তার নির্দিষ্ট হারে সুদ চাই-ই। এটা একটা অবিচার ও অন্যায় ব্যবস্থা। তাই সুদ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি বড় অন্তরায়।

ব্যক্তি কর্তৃক পারস্পারিক সহযোগিতায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান

কুর'আন মজীদে ত্রিশের অধিক স্থানে নামায কায়েমের নির্দেশ দানের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের উল্লেখ রয়েছে এবং সত্তরের অধিক স্থানে সম্পদ ব্যয়ের কথা রয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা কত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে সেই দিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ধনীদের মালের উপর গরীবদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন : وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার"।[১০৯]

সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ তা'আলা এই মাল খরচের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে মু'মিনদের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলাহয়েছে ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ،الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ "এতো আল্লাহর কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নাই, এটা মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশক। যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে,তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যায় করে।"[১১০] এই সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কিতাবের উপর এবং এতে অদৃশ্য বিষয়াদি, যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, তাকদীর. বিশ্বলোক সৃষ্টি, আদম, বেহেশত-দোযখ, পরকাল, জিন, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর ঈমান আনার সাথে সাথেই মানুষের উপর দু'টি অধিকার অনিবার্য হয়ে পড়ে।

"আল্লাহর এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের গণ্ডিতে সর্বপ্রথম অধিকার হচ্ছে, বান্দা তার মাথা শুধুমাত্র আল্লাহর সামনে অবনত করবে এবং নামায কায়েমের মাধ্যমে নিজের দাসত্ব ও আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়া নিজের অপরিহার্য দায়িত্বে পরিণত করে নিবে।

---

১০৯ আল-কুরআন, ৪৫: ১৯

১১০ আল-কুরআ, ২ : ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

নামাযের পরপরই ঈমানদারগণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে হক্কুল ইবাদত সম্পর্কিত অধিকার আদায়, যার নাম ইনফাক (ব্যয়) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দেয়া ধন-সম্পদ দ্বারা অভাবী ও দারিদ্র ক্লিষ্টদের লালন-পালন।"[১১১]

অধিকারের এই ক্রমবিন্যাসে শুধু এই একটি মাত্র আয়াতই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র কুর'আনে নামাযের পরপরই যাকাতের প্রসঙ্গ এসেছে। কুর'আন মজীদের কোন কোন স্থানে অভাবীদের অভাব মোচনে উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করলে নামাযীর নামায অর্থহীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ،فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ،الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ،وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ "তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।"[১১২]

বর্ণিত এই সূরা ইতিপূর্বে সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত সত্যকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। যে ব্যক্তি অদৃশ্যের উপর (পরকালে) ঈমান রাখে না তার দ্বারা না আল্লাহ তা'আলার হক নামায সঠিকভাবে আদায় হতে পারে, না সে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার ভাইদের অভাব-অনটন মোচন করে। নামায পড়লেও চরম শৈথিল্য ও উদাসিনতার সাথে এবং উহা কেবল লোক দেখানোর জন্যই। আর আল্লাহ তা'আলার দেয়া সম্পদের উপর অবৈধ কবজা জমিয়ে রাখে। অনাথ, অসহায় ইয়াতীমকে ঘাড় ধরে বিতাড়িত করে দেয়। অভাবীদের নিজেরা তো পানাহার করায়ই না, এমনকি অন্যদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান হতে বিরত রাখে। কোন অভাবী ব্যক্তি যদি সামান্য কোন জিনিস চায় তবে তা প্রদানেও অস্বীকার করে। এই প্রকারের কর্মপন্থা অবলম্বনকারীদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের এই নামায কোন কাজে আসবে না, উহা তোমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার আদায় না করার অপরাধে তোমরা যে ধ্বংসের মুখামুখি হবে, এই নামায তোমাদেরকে ইহা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আলাহ তা'আলা ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এবং এই প্রসংগে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর কি কি দায়িত্ব আরোপিত হয়, সম্পদ ব্যয়ের বিধানসমূহ এবং এই সম্পর্কে অনুপ্রেরণাদান সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا " সালাত কায়েম কর,যাকাত প্রদান কর, এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ ।"[১১৩]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ [redacted]
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [redacted]
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ " পূর্ব এবং [redacted]
পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ

---

১১১ মুহা. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
১১২ আল-কুরআন, ১০৭ : ১-৭
১১৩ আল-কুরআন, ৭৩: ২০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ,পরকাল,ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব, এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্নীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রতিষ্ঠা করলে।" [১১৪]

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের যে সকল শর্ত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রিয় সম্পদ খরচের কথা নামায কায়েমের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কুর'আন মজীদ আমাদেরকে বলে যে, ধন-সম্পদ ব্যয় (দান) করলে কমে না, বরং বাড়ে। এটি ক্ষতির নয়, বরং সম্পূর্ণ লাভের পণ্য। এটি গ্রহণকারীর প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং দাতার নিজের উপর অনুগ্রহ। কেননা চক্রবৃদ্ধি হারে এটির লাভ তার নিকটেই ফিরে আসবে। আর আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজের সৌভাগ্যের উপায় হয়ে চিরস্থায়ী শান্তির সেই মহা পুরস্কারের যোগ্য করে দেবে যা অর্জন করাই প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে সম্পদ খরচ না করে পুঞ্জীভূত করে রাখলে উহা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে ধ্বংস ও বরবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ সম্পর্কে কুর'আনুল-কারীম এর কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ،إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম, ও বন্দীকে আহার্য দান করে , এবং 'বলে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না,কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের'। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদের কে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।"[১১৫]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " লোকেরা কি ব্যয় করবে সে সর্ম্পকে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।"[১১৬]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ,যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত করে শস্যদানা । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন । আল্লাহ প্রাচূর্যময়,সর্বজ্ঞ।"[১১৭]

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নীতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট,পার্শ্বদেশ,পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে সেদিন বলা হবে, এতো সেই স্বর্ণ-রৌপ্য যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিল।"[১১৮]

---

১১৪ আল-কুরআন, ২ :১৭৭

১১৫ আল-কুরআন, ৭৬: ৮-১১

১১৬ আল-কুরআন, ২ : ২১৫

১১৭ আল-কুরআন, ২:২৬১

১১৮ আল-কুরআন, ৯: ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত আল-কুর'আনের আয়াতসমূহে বিধৃত নির্দেশাবলী যেমন নৈতিক অধিকার তেমনি রাষ্ট্রের অধিকার। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ধনীর মালের মধ্যে দরিদ্রের অংশ রয়েছে তখন কোন দরিদ্রের সেই অংশ নির্ধারণ করে এবং আদায় করে দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। যখন আল্লাহ তা'আলা অসহায় অক্ষম মানব মণ্ডলীকে নানাভাগে বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার নির্দেশ দেন তখন সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বভাবত রাষ্ট্রের উপর এসে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য ইসলাম যে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল

১। সমাজের প্রতিটি সদস্যকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ণভাবে ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে সে অপরের গলগ্রহ না হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১১৯]

২। হালাল পন্থায় রিযিকের সন্ধানে বাহির হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " মানুষ তাই পায় যার জন্য সে শ্রমসাধনা করে।"[১২০] অর্থাৎ মানুষ তার চেষ্টার বিনিময় পাবেই।

৩। হালাল-হারাম ও জায়েজ নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করে, চেষ্টা-সাধনা ও কর্মের ক্ষেত্র বা গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সুদ-ঘুষ, শরাব, জুয়া, চুরি, ছিনতাই ও চরিত্র বিধ্বংসী জিনিসপত্রের আমদানী, নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির ব্যবসা, অন্যান্য ভেজাল, ওজনে কম দেয়া, চোরাচালান মজুতদারী এবং এই জাতীয় অন্যান্য তৎপরতার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে সমাজ ধেকে নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক শোষণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৪। অর্জিত সম্পদ শরী'আতের নিষিদ্ধ খাতসমূহে ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা, অপব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা, বিলাসবহুল ভোগবিলাসিতার নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ ধ্বংস করার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে উহা ভুল পথে ব্যয়িত হওয়া রুদ্ধ করা হয়েছে। তার সঠিক গতি ও প্রকৃত হকদারের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে।[১২১]

৫। প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনে অপরের অংশ নির্ধারণ করে একে সমষ্টিগতভাবে লালন-পালন ব্যবস্থার সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নোলিখিত ভাবে উল্লেখ করতে পারি ঃ

(ক) **অত্যাবশ্যকীয় ভরণপোষণ** : পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নাতী-নাতনী, পৌ-পৌত্রী, ভাই-বোন, ফুফু, ভাইঝি এবং রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ।

---

১১৯ আল-কুরআন, ৬২ : ১০

১২০ আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯

১২১ মুহা. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **অধিক সম্পদ :** নিকট আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে যাকাত আদায়ের পরও বিত্তবানদের দায়িত্ব রয়েছে। তারা দুস্থ ও অভাবীদের সাহায্যার্থে দান-খয়রাত করবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন

"যাকাত ছাড়াও তোমাদের সম্পদে আরও অধিকার রয়েছে"।[১২২]

(গ) করযে হাসানা দেওয়া : বিত্তশীলদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ এই যে, তারা যেন প্রয়োজনের সময় খোলা মনে অভাবীদের ঋণ প্রদান করে এবং কোন জিনিস ধার চাইলে তা প্রদানে যেন অসম্মত না হয়। কোন মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, তার নিকট ঋণ চাইতে আসলে ঋণ প্রদানের সামর্থ্য থাকা সত্বেও সে তাকে তা দিতে অস্বীকার করে।[১২৩]

(ঘ) উত্তরাধিকারের মাধ্যমে, ওসিয়াতের মাধ্যমে, মোহরানার মাধমে, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভরণপোষণের মাধ্যমে সম্পত্তি অন্যের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যম রয়েছে।[১২৪]

সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান

জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।যেমন-

(ক) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্রাহ (সা.) বলেছেন : "যার অভিভাবক নেই আমি তার অভিভাবক"।[১২৫] অন্যত্র বলা হয়েছে "যার অভিভাবক নেই রাষ্ট্রই তার অভিভাবক"।[১২৬] এইভাবে তিনি মৃত্যু ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ এবং তার রেখে যাওয়া অসহায় সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে মুসলমান ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ"।[১২৭]

(খ) যাকাতের বিধান কায়েম করে যাকাত দাতাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করে প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেয়া কিংবা তাদের কল্যাণে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা।

(গ) রাষ্ট্র জনগণকে আল্লাহর নির্দেশিত অধিকারসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। পুত্র তার পিতা-মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করলে রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে তাকে এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। কোন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ, তার মোহরানা কিংবা সন্তানদের প্রাপ্য আদায়ে অস্বীকৃত হলে তাকে এই সকল অধিকার আদায়ে বাধ্য করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র যার যে অধিকার রয়েছে তা আদায়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

(ঘ) সমাজে অবৈধ উপার্জনের সকল উৎস রাষ্ট্র বন্ধ করে দিবে, হালাল উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত করবে এবং অর্থনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে হালাল উপার্জনের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের যোগ্য করে তুলবে।

---

১২২ উদ্ধৃতি, মুহা. সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, পৃ.২৮০

১২৩ আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইব্ন হুসামুদ্দীন আল হিন্দী আল-বুরহানপুরী,*কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফওয়াল*(আলেপ্পো : ১ম সংস্ক.,১৩৭৯ হি./১৯৬৯ খৃ.), খ.৩য়, হা.৩৫৮১, পৃ.৩০২

১২৪ সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ.৮০৬

১২৫ মুসনাদু আহমাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৫৬৮

১২৬ আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবুন ফিল ওলি, হাদীস নং ১৭৮৪

১২৭ আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ- ১ম সংস্করণ- ১৯৯১ খ্রি.),বাবুস সালাতি 'আলা মান আলাইহি দাইনুন, হাদীস নং১৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এই অধিকার শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং অমুসলিম নাগরিকগণও এতে সমানভাবে অংশীদার। হযরত উমার (রা.) এক ইয়াহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে নিজ বাড়ীতে ডেকে আনলেন। প্রথমে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু দান করেন, অতঃপর বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষকে ডেকে এনে তার এবং তার মত অন্যান্য অভাবীদের দৈনিক ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন 'আল্লাহর শপথ! আমরা তাদের যৌবনকালে (অর্থাৎ কর্মক্ষম থাকাকালে) তাদের থেকে কর আদায় করে ভোগ করবো এবং তাদের বার্ধক্যে তাদেরকে অসহায় ছেড়ে দিব এটা কখনো সুবিচার হতে পারে না।"[১২৮]

হযরত উমার (রা.) তাঁর খিলাফতকালে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রসংগে নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলি পূরণের দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেন।

(ক) ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী,

(খ) শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পোষাক এবং

(গ) হজ্জে গমন এবং যুদ্ধের বাহন।[১২৯]

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (র.)-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সানআর পার্বত্য অঞ্চলে মেষ চালকও স্বস্থানে বসে তার অংশ পেয়ে যাবে তার চেহারায় বিষন্নতার ছাপ ব্যতিরেকে।"[১৩০]

হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (র.) ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন "জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও। এর জবাবে আবদুল হামীদ লিখেছিলেন, আমি জনগণের নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং এর পরও বাইতুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে। এর জবাবে আবদুল আযীয (র.) লিখেছিলেন, এখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালাশ কর। তারা কোন অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্য ঐ ঋণ গ্রহণ না করে থাকলে, বাইতুল মালের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর"-এর জবাবে আবদুল হামীদ খলীফাকে আবার লিখে জানালেন, আমি এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছি। অথচ এখনও বায়তুল মালে যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট রয়েছে। জবাবে উমার ইবন আবদুল আযীয (র.) লিখেন, এখন এমন অবিবাহিত যুবকের তালাশ কর যারা নিঃসম্বল এবং তারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও তাহলে তুমি তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদের দায়িত্বে "অবশ্য দেনমোহর" আদায় করে দাও। জবাবে আবদুল হামীদ লিখেছিলেন, আমি তালাশ করে যত অবিবাহিত যুবক পেয়েছি তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেছি। এর পরও বায়তুল মালে প্রচুর অর্থ মজুদ রয়েছে। জবাবে উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) লিখলেন, এখন এমন সকল লোক তালাশ কর যাদের উপর কর ধার্য করা হয়েছে এবং তারা তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এই সকল যিম্মীদেরকে এত পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের জমি ভালভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই বৎসরের নয়।[১৩১]

---

১২৮ ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, *ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে মিলকিয়াত*(লাহর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স,১৯৭১ খৃ.), পৃ.৩৬

১২৯ হামেদ আল- আনসারী, *ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত*(দিল্লী :১৯৫৬ খৃ.), পৃ.৩৯৮

১৩০ কিতাবুল খারাজ, উদ্ধৃতি, মুহা. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬

১৩১ কিতাবুল আমওয়াল। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে মহানবী (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সুদকে হারাম করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Convention on Economic, Social and Cultural Rights) এর ১নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে-(১) "সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিন্ত্রনের অধিকার আছে। সে অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অনুধাবন করবে।"[১৩২]

(২) "সকল জনগোষ্ঠী, পারস্পারিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক আইন হতে উদ্ভূত দায়িত্বসমূহ ক্ষুন্ন না করে, নিজেদের স্বার্থে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংস্থান স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবে। কোনক্রমেই কোন জনগোষ্ঠীকে তার জীবিকার উপায় (Means of subsistence) হতে বঞ্চিত করা যাবে না।"[১৩৩]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

ইসলাম পূর্ব দুনিয়াতে অনেক ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল ধর্মমতের বুনিয়াদ শরী'আত প্রদানকারী কোন লিখিত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বিধায় এক সময় তা বিকৃত হয়ে বিলোপ হতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিবেক, বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব ধর্মের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে ইসলামের মূলনীতিসমূহ লক্ষাধিক উম্মতের সামনে তুলে ধরেন যা মানবাধিকারকে নিশ্চিত করেছে এবং ধর্ম চর্চার ব্যাপারে পথ বাতলে দিয়েছে কেননা ইসলাম প্রত্যেক মানুষের বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুতার যুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণে ধর্মীয় স্বাধীনতার লাভে অধিকারের কথা বলেন। " যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধকরে বসে থাকে , তাদেরকে আক্রমণ করবে না। এবং যারা উপাশনালয়ে বসে আছে , তাদেরকে কোন ভাবে বিরক্ত করবে না"। মদিনার সনদে অনুচ্ছেদ ২৫ এ বলা হয়েছে " বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীরা মুসলমানদের সাথে এক

১৩২ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪

১৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪-৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। এ বিধান তাদের ও তাদের মাওয়ালীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধু সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে"। আবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকারকে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন: "হে মানবজাতি! আমার কথা ভাল করে বুঝে নাও। আমি আমার তাবলীগী দায়িত্ব পালন করেছি। তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পরিহার করবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাড়াবাড়ির ফলে ধ্বংস হয়েছে।"[১৩৪] ভাষণের এ অংশে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- ' ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।'

রাসূল (সা.) বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহ : মহানবী এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হচ্ছে– যেমন, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় অনুচ্ছেদ ১৮ এর মধ্যে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা বিবেক, ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে; এই অধিকারের মধ্যে তার ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা এবং এক বা অন্যান্যের সহিত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে এবং প্রকাশ্যে অথবা, গোপনে শিক্ষাদান (Teaching), অনুশীলন (Practice), ধর্ম-অনুষ্ঠান (Worship) পালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম এবং বিশ্বাস অভিব্যক্তি করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।[১৩৫]

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ধর্মের শাব্দিক অর্থ : সাধারণভাবে ধর্মের সমার্থক হিসেবে 'আরবীতে' দীন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'দীন ' শব্দটি আরবী دان (*দানা*) হতে নির্গত। শব্দটির অর্থের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়[১৩৬] যেমন-

১. পরাক্রমশীলতা, কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া।
২. আধিপত্য, রাজত্ব, বাদশাহী।
৩. পুরস্কার, প্রতিদান।
৪. বিচার, হিসাব-নিকাশ, গণনা।
৫. অভ্যাস, আচার-আচরণ।
৬. আনুগত্য, বাধ্যগত, অনুগত।

---

১৩৪ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪১-৪২

[১৩৫] আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬

[১৩৬] ইবন্ মান্‌যুর, মুহাম্মদ ইবনে মুকাররাম, *লিসানুল আরব*(বৈরুত : দারু এহইয়ায়িত্তুররাসিল আরবী, তা.বি), খ. ৪,পৃ. ৪৫৮-৪৬২; আল-ফিরোযাবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব, *আল-কামূসুল মুহীত*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা.বি), পৃ. ১৫৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৭. দাসত্ব, লাঞ্ছনা, নিয়ন্ত্রণ।

৮. সম্মান, সম্ভ্রম।

৯. সেবা, পরিচর্যা, কতৃত্ব।

১০. শাসন, অবস্থা।

১১. নিয়ম-নীতি, মাযহাব, পথ বা পন্থা।

মূলত উপরোল্লেখিত অর্থগুলোর মাঝে নিবির সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই এর অর্থের মধ্যে 'আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার' কথাটি বোঝা যায়[১৩৭]। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দীন শব্দটিতে পরস্পর-মর্যাদাবোধ ও আনুগত্য এ দু'টি দিকের সমন্বয় রয়েছে। যাতে এক পক্ষ থেকে আনুগত্য পাওয়া যায় এবং অন্য পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়[১৩৮]।

পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত 'দীন' শব্দের অর্থ :

১. আনুগত্য ; মহান আল্লাহ্ বলেন : وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيل " তার চেয়ে দীনের আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ন হয়ে আল্লাহর নিকট আত্নসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে[১৩৯]।" মহান আল্লাহ্ আরও বলেন: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين " বলুন, ' আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে"[১৪০]

২. প্রতিবেদন ও হিসাব-নিকাস; মহান আল্লাহ বলেন; أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ " আপনি কি দেখেছেন তাকে , যে দীনকে অস্বীকার করে? [১৪১]

৩. জীবন-ব্যকস্থা; মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ " কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত"।[১৪২] তিনি আরো বলেন; إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ " নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন(জবিন ব্যবস্থা) "[১৪৩]।

৪. পথ ও পন্থা; মহান আল্লাহ বলেন, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين " তোমাদের দীন (পথ ও পন্থা) তোমাদের , আমার দীন (পথ ও পন্থা) আমার"[১৪৪]

৫. আইন ও বিধান ; মহান আল্লাহ্ বলেন وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ " আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে"।[১৪৫] আরো এসছে

---

[১৩৭] ইবনে ফারেস, *মু'জামু মাকায়িসিল্লুগাহ,* খ. ২, পৃ.৩১৯

[১৩৮] ড. আব্দুল্লাহ দারায, *আদ-দীন*(কুয়েত : দারুল কলম, ১৪১০ হি.), পৃ.৩১

[১৩৯] আল-কুরআন, ৪: ১২৫

[১৪০] আল-কুরআন, ৩৯ : ১১

[১৪১] আল-কুরআন, ১০৭ : ১

[১৪২] আল-কুরআন, ৩ : ৮৫

[১৪৩] আল-কুরআন, ৩ : ১৯

[১৪৪] আল-কুরআন, ১০৯ : ৬

[১৪৫] আল-কুরআন, ২৪: ২

Dhaka University Institutional Repository

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " রাজার আইনে তাঁর সহোদরকে তিনি আটক করতে পারতেন না, আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে" ।[১৪৬]

৬. কিয়ামত; মহান আল্লাহ্ বলেন إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ , وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ " তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আর নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী" ।[১৪৭]

দীনের পারিভাষিক অর্থ :

পারিভাষিক দিক থেকে دين দীন শব্দটিকে আমরা দু'ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি

এক : বিশেষ অর্থে ।

دين শব্দটি যখন ال আল- দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তা দ্বারা শুধু মাত্র ইসলামকেই নির্দেশ করা হয়। কেননা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ال আল অব্যয় কোন শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । সে লক্ষেই পবিত্র কুর'আন ও সুন্নায় এ ين د দীন কে নির্দিষ্ট অব্যয় দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। আর তার উদ্দেশ্য হল: ইসলাম। যেহেতু ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম, এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় সমস্যার সঠিক ও সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক সমাধান রয়েছে। যার বাস্তব আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) । তাই তো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হওয়ার গৌরব তিনি অর্জন করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুর'আন মজীদে এসেছে إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

" নিশ্চই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবল মাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) সমূহ অস্বীকার করলে আল্লাহ তো দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[১৪৮] শুধু তাই নয় বরং ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বের বুকে সমাদৃত আছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেন الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম"[১৪৯]

এছাড়াও সকল নবী ও রাসূলের দীন হল ইসলাম । হযরত আদম (আ.) হতে মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সকলেই একই দীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন । কুর'আনে এসেছে: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

" জেনে রাখুন, অবিমিশ্র দীন (আনুগত্য) আল্লাহরই প্রাপ্য।[১৫০]

অনেক মুসলিম মনীষীগণ দীনকে বিশেষ অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা নিম্নরূপ :

---

[১৪৬] আল-কুরআন, ১২ : ৭৬
[১৪৭] আল-কুরআন, ৫১ : ৫-৬
[১৪৮] আল-কুরআন, ৩ : ১৯
[১৪৯] আল-কুরআন, ৫: ৩
[১৫০] আল-কুরআন, ৩৯ : ৩

Dhaka University Institutional Repository

১. ড. সাউদ ইবন্ আব্দুল আযীয বলেন با نه الشرع الا لهي المتلقي عن طريق الوحي
অর্থাৎ 'দীন' হল ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী বিধান।[১৫১]

২. ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষায় ; "الدين وضع الهي ساءِق لذوي العقول باختيارهم اياه الي الصلاح في الحال' والفلاح في المال" অর্থাৎ দীন হল ঐশী এক চালিকা-শক্তি যার মাধ্যমে জ্ঞানীগণ বর্তমানের সৌভাগ্য এবং ভবিষ্যতের কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে[১৫২]।

৩. ইমাম আলী ইবন্ মুহাম্মাদ আল-জুরজানী বলেন- الد ين وضع الهي يد عو اصحاب العقول الئ قبول ما عند الرسول অর্থাৎ দীন হল ঐশী বিধান, যা বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে[১৫৩]।"

৪. রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন: الد ين اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتو صلوا إلى جوار الله" অর্থাৎ দীন হল বান্দাদের জন্য নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি বিধানের নাম , যাতে করে বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে[১৫৪]।

দুই: ব্যাপক অর্থে

দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে ব্যাপকভাবে দীন-এর পরিচয় নিরূপণেও পার্থক্য ঘটেছে; যেমন- অমুসলিম মনীষী ও তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামত:

১. ঐশী নির্দেশের উপর ভিত্তি করে আমাদের কর্তব্যসমূহ অনুধাবণ করা[১৫৫]

২. দীন হল এমন সম্পর্ক যা মানুষকে আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়[১৫৬]।

ব্যাপক অর্থে দীন এর সজ্ঞা নিরূপণে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামত:

১. ড. মুহাম্মাদ কামাল জা'ফর বলেন : ان الدين بمعناه العام هو الايمان بذات الهية جديرة بالطاعة و العبادة والتصرف والسلوك بناءأ على مقتضبات هذا الآيمان فردياً واجتماعياً
অর্থাৎ দীন হলো আনুগত্য ও ইবাদতের উপযুক্ত ঐশী সত্তার উপর বিশ্বাসের নাম, ব্যক্তি ও সমষ্টি যে বিশ্বাসের চাহিদানুসারে তাদের যাবতীয় আচার আচরণ নির্ধারণ করে।[১৫৭]

২. ড. আব্দুল্লাহ দারায বলেন : ان الدين : تعتقاد قداسة ذات' ومجموعة السلوك' الذى يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا حباً' رغبة ورهبة" অর্থাৎ দীন হলো, এক সত্বার পবিত্রতায় বিশ্বাস

---

[১৫১] ড. সা'উদ ইবন্ আব্দুল আযীয আল-খালাফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১৫২] সম্পাদনা পরিষদ, দায়েরাতুল মা'আরিফুল ইসলামিয়্যাহ্, খ. ৯, প্রাগুক্ত, ৩৬৮; মুহাম্মাদ আলী আত-থানাভী, *কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন* (কায়রো: আন-নাহদাতুল মিশরিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৫০৩

[১৫৩] দায়েরাতুল মা'রিফুল ইসলামিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ৯,পৃ. ৩৬৮; মুহাম্মাদ আলী আত-থানাভী, কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন (কায়রো: আন-নাহদাতুল মিশরিয়্যাহ, তা.বি), পৃ.৫০৩

[১৫৪] দায়েরাতুল মা'রিফুল ইসলামিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, খ. ৯, ৩৬৮; মুহাম্মাদ আলী আত-থানাভী, কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন (কায়রো: *আন-নাহদাতুল মিশরিয়্যাহ*, তা.বি), পৃ.৫০৩

[১৫৫] ড. আব্দুল্লাহ দারায, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

[১৫৬] স্লাইর মাখার " *মাকালাতুন আনিদ দিয়ানাহ্*" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, A Feeling of Absolute dependence. দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আশ্‌শারকাহয়ী, *বুহূসুন ফী মুকারানাতিল আদইয়ান*(মিশর: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৮১০ হি.), পৃ.১৪

[১৫৭] ড. মুহাম্মদ কামার জাফর , *আল-ইনসানু ওয়াল আদইয়ান*(কাতার : দারুছ ছাকাফাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

এবং এমন কতগুলো আচার-আচরণের নাম, যা দ্বারা ঐ সত্তার প্রতি ভালবাসা, বিনয় ও আশা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়।[১৫৮]

৩. ড.সা'উদ ইবন্ আব্দুল অযীয আল-খালাফ বলেন:

اعتقاد إلهية ذات أو ذوات' ومجموعة السلوك الذى يدل على الخضوع لتلك الذات أو الذوات ذلاً وحباً ورغبة ورهبة অর্থাৎ দীন হল, এক বা একাধিক সত্ত্বার পবিত্রতায় বিশ্বাস এবং এমন কতগুলো আচার-আচরণের নাম যা দ্বারা ঐ সত্ত্বার প্রতি ভালোবাসা, বিনয় ও আশা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়[১৫৯]।" এ শেষোক্ত সংজ্ঞাটি আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ দীন বলতে দুটি বিষয়ের সমন্বয়কে বুঝায়। এক কোনো ঐশী সত্ত্বায় বিশ্বাস স্থাপন। দুই ব্যক্তি ও সমষ্টির যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন।

দীন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ধর্মের ব্যবহার লক্ষনীয়।[১৬০]

ধর্ম শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু এর কোন সুসির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। অভিধানে ধর্ম শব্দের অর্থ ভক্তিপূর্ণ আনুগত্য, অদৃশ নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষতঃ ঈমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ধর্মের শাব্দিক অর্থে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন ধর্ম বলতে বোঝায় সেই জিনিসকে যা মানুষ ধারণ বা পোষণ করে। ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' শব্দটিও উৎপন্ন মূল 'রিলিজিও' থেকে। 'রিলিজিও' অর্থ যুক্ত করা। আর এই বুৎবত্তিগত অর্থে রিলিজিয়ন বলতে বোঝায় মানুষকে সত্য ও কল্যানের সঙ্গে যুক্ত করাকে। অন্য কথায় ধর্মই বলি আর রিলিজিয়নই বলি মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা , মানুষকে ন্যায়, সত্য ,সুন্দর ও কল্যাণের, তথা পরমসত্তার সন্ধান দেয়াই এর কাজ।"[১৬১]

ধর্মের পরিভাষিক সংজ্ঞা

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার যে- উপায় বা পথ তাই ধর্ম।

Religion বা ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয় Belief in a higher unseen controlling power especially in a personal God any system of faith and worship, rites or worship, devoted fidelity, an action that one is bound to do. অর্থাৎ অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির বিশেষত ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ভক্তিপূর্ণ বা নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য;, ধর্মাচারণের মত অবশ্য করণীয় কর্ম[১৬২]।

সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি ধর্ম হলো স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের সব মূল অনুভূতি এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দীন ও ধর্ম

---

[১৫৮] ড. আব্দুল্লাহ দারায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[১৫৯] ড. সা'উদ ইবন্ আব্দুল আযীয আল-খালাফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১৬০] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত, *আল-কাওসার আদুনিক বাংলা আরবী অভিধান*(ঢাকা: কাওসার পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৪০০ হি.), পৃ.৩৩২

[১৬১] ড. আমিনুল ইসলাম, *ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৫খৃ.), পৃ. ১

[১৬২] Sailendra Biswas, Edited by Sri Birendramohan Dasgupta *Samasad English-Bengali Dictionary*(Calcutta: Sahitya Samsad, 5th edition, 32nd Impression, August-1997), p.946

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে ধর্মের সমার্থক হিসেবে আরবীতে 'দীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় অভিব্যক্তি মানবকে স্রষ্টার প্রতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে আর দীন হল সেই অপরিহার্য বিধি বিধান যা স্রষ্টা তাঁর বিবেকবান সৃষ্টির উপর আরোপ করেছেন। যে জন্য 'দীন' হল, আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্য করণীয় নির্দেশাবলী, যার প্রতি প্রত্যেককে আত্নসমর্পণ করতে হয়[১৬৩]। ধর্ম মূলত কিছু বিধি বিধানের সমষ্টি, যাতে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা বিবৃত হয়। এ হিসেবে বলতে পারি যে, দীন শব্দটি সবচেয়ে ব্যাপক যা বিশ্বাস, কর্ম ও সার্বিক জীবনপদ্ধতির নাম।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ–

ক) ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা :

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের নিজের উপলব্ধির পরিবর্তন হতে পারে। মানুষের বিশ্বাস ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষের যেহেতু চিন্তা ও বিবেকের মত গুণ রয়েছে সেহেতু সে সর্বদাই সত্য অনুসন্ধানী হবে। এই অনুসন্ধান তার বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পশুর নিজের কোন বিশ্বাস নেই। তার বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে অবলম্বন করে এবং তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস পরিবর্তনশীল, সেহেতু ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতার অধিকার মানবিক অধিকার। ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেমনি একটি অমানবিক কাজ, ধর্ম বর্জন বা পরিবর্তনে বাধ্য করাও একটি অমানবিক কাজ।

খ) **ধর্ম বিশ্বাস অভিব্যাক্ত করার স্বাধীনতা**

একা বা অন্যের সঙ্গে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।এর জন্য প্রয়োজন :

১. ধর্ম শিক্ষাদানের অধিকার।

২. ধর্ম অনুশীলনের অধিকার।

৩. ধর্ম অনুষ্ঠানের অধিকার।

৪. ধর্ম পালনের অধিকার।

ধর্ম শিক্ষা দানের অধিকার

যে যে ধর্মে বিশ্বাস করে বা ধর্ম মেনে চলে অন্যদেরকে সেই ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস, সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করতে পারে। তবে কাউকে জোর জুলুম বা জবরদস্তিমূলকভাবে কিছু শিক্ষা দেয়া যাবে না। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি একক বা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ্যে বা গোপনে হতে পারে। ধর্মপালনের জন্য ধর্মশিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ধর্ম পালনে বাধা প্রদানের নামান্তর।

---

[১৬৩] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ(ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯২), খ. ১৩,পৃ. ৪৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতা

যে যে ধর্ম বিশ্বাস করে সেই ধর্ম অনুশীলন ও চর্চার স্বাধীনতা তার মৌলিক অধিকার। শুধু বিশ্বাস পোষণের অধিকার দিয়ে সেই বিশ্বাসকে বাস্তবে চর্চার অধিকার না দিলে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ধর্ম অনুশীলন করা, ধর্ম চর্চা করা এবং ধর্মকে অভ্যাসে রপ্ত করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের মৌলিক মানবিক অধিকার। ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আর ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা একই কথা।

ধর্ম অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা

অধিকাংশ ধর্মেরই কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে, যা সেই ধর্মবিশ্বাসের অংশ। ধর্মবিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সেই সব অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম শুধু বিশ্বাসের উপর চলে না, কিছু আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতে হয়। এই সব ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা– যেমন পূজা, উপাসনা ইত্যাদি প্রতিপালনের আর ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা একই বিষয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা না থাকলে ধর্মের স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না।

পশু পাখির, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দরকার পড়ে না। মানুষই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার অধিকারটি মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম পালনের স্বাধীনতা :

এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, ধর্মীয় ব্রতাদি পালন, ধর্মীয় উৎসব পালন ইত্যাদির কথা উলেণ্টখ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ্যে, গোপনে ধর্ম পালনের অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার্ এই অধিকার হরণ করার অর্থ হচ্ছে তার মানবিক অধিকার হরণ করা।

ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে গাজী শামছুর রহমান বলেন, "বস্তুত মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান, অনুশীলন, অনুষ্ঠান ও পালন পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি অধিকার হরণ করলে অন্যগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি অত্যন্ত ব্যাপক।"[১৬৪]

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলাম

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলাম স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেছে। কেননা–মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জীবনবিধান হিসেবে কেবল 'ইসলাম'ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই জীবনবিধান অনুসরণ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে, যা শুধু মুসলিম মনীষীগণই নয়, বড় বড় অমুসলিম পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন। কেবল এই পার্থিব জীবনেই নয়; মানুষের পরকালীন জীবনেও নাজাত এবং সুখ-শান্তির একমাত্র গ্যারান্টিই হল ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবনবিধানের অনুসরণ। বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর আইন-কানুন কার্যকর

---

[১৬৪] গাজী শামছুর রহমান,মানবাধিকার ভাষ্য, পৃ.৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। মানুষের জীবনে তা নিজেই কার্যকর না করে এর দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষের ওপর। তিনি চান মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর দেয়া জীবনবিধান মেনে নিক এবং ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করুক। তাঁর দেয়া জীবনবিধান অনুসরণ করা বা না করার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে দিয়ে তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছে করলে তাঁর দেয়া জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চিরশান্তির পথে এগুতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে চিরশান্তির পথ বেছে নিতে পারে। জীবনাদর্শ ইখতিয়ার করার ক্ষেত্রে মানুষ কোন ধরনের বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন নয়। এ কথাটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এভাবে বলেছেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا "আমি মানুষকে জীবন-পথ দেখিয়েছি। এখন সে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবেও জীবনযাপন করতে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবেও।"[১৬৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "জীবন ব্যবস্থা (দীন) গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই। কেননা হিদায়াত বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক শক্ত অবলম্বন ধারণ করবে যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।"[১৬৬]

কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান মেনে চলবে, না কাফির বা মুশরিক হিসেবে জীবন যাপন করবে এটা তার নিজের ব্যাপার। তবে ইসলামী জীবনবিধানকে মেনে নেয়ার পর এর নির্দেশাবলি অবজ্ঞা বা অবহেলা করার অধিকার তার নেই। একবার ইসলামকে বেছে নিলে এর অনুশাসনগুলো তাকে মেনেই চলতে হবে। এখানে ইসলামী শরী'আহ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। ইসলামী সরকার যথারীতি শরী'আহ কার্যকর করবেন। কিন্তু দেশের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাকে জোর করে মুসলিম বানাবার কোন অধিকার কোন ব্যক্তি বা সরকারের নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাইতেন তবে পৃথিবীর সবাই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসত। তুমি কি মানুষদেরকে মু'মিন হওয়ার জন্যে জরবদস্তি করবে।"[১৬৭] এভাবে আল্লাহ তা'আলা সংখ্যালঘুর ধর্মানুভূতিতেও আঘাত দেয়ার অধিকার কোন মুসলিম ব্যক্তি বা সরকারকে দেননি। তিনি বলেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "তারা আল্লাহকে ছেড়ে যে সকল উপাস্যকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। তা হলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।"[১৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের শিক্ষার আলোকে এমন এক অনাবিল সমাজ গড়ে তোলেন যাতে প্রত্যেকেই নিজের দীন (জীবনদর্শন) বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। এ ক্ষেত্রে কেউ কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ চাপের সম্মুখীন হতো না। বর্ণিত আছে যে, "একবার জনৈক সাহাবী স্নেহের বশবর্তী হয়ে স্বীয় পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান এবং কুরআনের উপযুক্ত বাণী– 'দীন

---

[১৬৫] আল-কুরআন, ৭৬ : ৩
[১৬৬] আল-কুরআন, ২ : ২৫৬
[১৬৭] আল-কুরআন, ১০ : ৯৯
[১৬৮] আল-কুরআন, ৬ : ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই' পড়ে শোনান। তাঁর এ মহান শিক্ষার প্রতিফলন পরবর্তী খলীফাদের আমলে আমরা দেখতে পাই। একবার হযরত উমর (রা.) একজন বৃদ্ধা খ্রিস্টান মহিলাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে মহিলা বলল: আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে কেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করব? হযরত উমর (রা.) এ কথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করনে নি; বরং পড়ে শুনালেন– 'দীন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন বাধ্য বাধকতা নেই।"[১৬৯]

ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা কতোখানি উদারনৈতিক ছিল তা হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) এর আমলে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়। বর্ণিত রয়েছে, "দামিশকে দীর্ঘদিন থেকে একটি মুসলিম পরিবার একটি গির্জা জবরদখল করে রাখে। খ্রিস্টানরা যখন জানতে পারল উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) খলীফা হয়েছে এবং উমাইয়া বংশের শাসনের পরিবর্তে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে, তখন তারা আমীরুল মু'মিনীনের নিকট গির্জা ফেরত পাওয়ার আবেদন করে। খলীফা সেই মুসলমানদের ডেকে পাঠান। তারা এলে খলিফা তাদের নিকট প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলল: 'দীর্ঘদিন থেকে এ গির্জা আমাদের অধিকারে রয়েছে।' একথা শুনে খলীফা বললেন: 'কিন্তু ইসলামী শরী'আত তোমাদের অমুসলিমদের উপাসনালয় দখল করে রাখার অনুমতি দেয় না। গির্জা খ্রিস্টানদের ফেরত দিয়ে দাও।' অবশেষে খ্রিস্টানরা দীর্ঘদিন পরে তাদের গির্জা ফিরে পেলো। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান শিক্ষা– 'পর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা' পুনরায় জীবন লাভ করল।"[১৭০]

শুধু তাই নয় কুর'আনুল কারিমের সিদ্ধান্ত হচ্ছে– لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ

"দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"[১৭১]

অর্থাৎ সত্য পথ তো তাই যার দিকে ইসলাম মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে ছাটাই করে পৃথক করে দিয়েছে। এখন আল্লাহর অভিপ্রায় ও মুসলিমদের প্রচেষ্টা তো এটাই যে, সারা বিশ্ব যেন ইসলামের সত্যের আহ্বানকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এই ব্যাপারে কারও উপর বল প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। যার মনে চায় তা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহন করবে এবং যার মন চাইবে না তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। অন্য স্থানে রসূলে করীমের সত্যের দাওয়াত প্রসংগে তাঁর যিম্মাদারী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ "অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশতাদা। তুমি তো ওদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।"[১৭২]

মানুষের হেদায়াত ও সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন তাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যথারীতি সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা স্বয়ং তাদের মিশন সম্পর্ক বলেছেন– وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ "স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব"[১৭৩]

---

[১৬৯] কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.), *তাফসীরে মাযহারী*, অনু. মাও. মোহাম্মদ মহসীন(নারায়ণগঞ্জ : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১৯৯৭ খৃ.), খ.২য়, পৃ. ৩১

[১৭০] উদ্ধৃত, মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৮

[১৭১] আল-কুরআন, ২: ২৫৬

[১৭২] আল-কুরআন, ৮৮ : ২১-২২

[১৭৩] আল-কুরআন, ৩৬ : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সা.) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ "অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেওয়া।"[১৭৪]

সূরা শূরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন দীনের প্রতি মিথ্যারোপকারী কাফের-মুশরিকদের জানিয়ে দেন:

اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ "আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদেরও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই।"[১৭৫]

সূরা কাফেরূনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই একই বিষয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "বল, হে কাফেরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। আর আমি তার ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"[১৭৬]

এই পর্যায়ে হযতর উমার (রা.) এর গোলাম ওসাক রুমীর ঘটনাটি সহিষ্ণুতার উত্তম উদাহরণ হয়ে আছে। সে নিজেই বর্ণনা করছে, "আমি হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, মুসলমান হয়ে যাও। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমার উপর মুসলমানদের আমানতের কোন দায়িত্ব অর্পণ করব। কেননা অমুসলমানকে মুসলমানের আমানতের কার্যে নিয়োগ করা আমার জন্য সংগত নয়। কিন্তু আমি ইসলাম কবুল করি নাই। এরপরে তিনি বলতেন– (দীনে কোন জবরদস্তি নেই)। পরিশেষে তাঁর ওফাতের পূর্বাহ্নে তিনি আমাকে মুক্ত করে দেন। এ সময় তিনি বলেন, 'যেখানে মন চায় চলে যাও।"[১৭৭]

অপর এটি ঘটনা "হযরত উমার (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের গির্জার এক কোণে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি ভাবলেন, মুসলমানরা আমার নামাযকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে ঈসায়ীদের (খ্রিস্টান) হয়ত বহিষ্কার করে দিতে পারে। তাই তিনি একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞালিপি লিখে দূত মারফত পাঠিয়ে দেন। এই অংগীকারনামার আলোকে গির্জা খৃস্টানদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হল। আর এই নিয়ম প্রবর্তন করা হল যে, এক সময়ে শুধুমাত্র একজন মুসলমান গির্জায় প্রবেশ করতে পারবে; তার বেশী নয়।"[১৭৮]

ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলাম শুধুমাত্র এতটুকু নির্দেশই দেয়নি যে, তোমরা কারো উপর বল প্রয়োগ করবে না, বরং এ নির্দেশও দিয়েছে যে, কারো মনে কষ্ট দিও না, তাদের উপাস্য

[১৭৪] আল-কুরআন, ১৬ : ৮২

[১৭৫] আল-কুরআন, ৪২: ১৫

[১৭৬] আল-কুরআন, ১০৯ : ১-৬

[১৭৭] উদ্ধৃতি: মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

[১৭৮] ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *উমার ফারুক*, *উর্দু অনুবাদ*(লাহোর: ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি.,১৯৭২ খৃ.), পৃ.৩০২

Dhaka University Institutional Repository

দেব-দেবীকে গালমন্দ কর না। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের পূজা করে তাদের গালমন্দ কর না।"[১৭৯]

ধর্মীয় তর্কবিতর্কে অধিকাংশ লোক সাবধানতার আচল হাতছাড়া করে ফেলে, নিজেদের প্রতিপক্ষের আকীদা-বিশ্বাসকে তিরস্কারের লক্ষবস্তু বানায়। তাদের উপাস্যদের এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত ব্যক্তিদের গালমন্দ করে। এই বিষয়ে মুসলমানদের কঠোরভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবধারীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হবে না।"[১৮০]

এই একটি মাত্র শব্দ 'আহসান' (উত্তম) এর মধ্যে শরাফত, ভদ্রতা, নম্রতা, শালীনতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত। এই নির্দেশ শুধুমাত্র আহলে কিতাবের জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত ধর্মাবিশ্বাসীদের বেলায় প্রযোজ্য।

ইসলামে মানবাধিকারে সম্পর্কিত ঘোষণা 'কায়রো ঘোষণা ১৯৯০ এর ১০ নং অনুচ্ছদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে এভাবে-" ইসলাম স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একমাত্র পূণাঙ্গ ও অবিকৃত জীবন বিধান। কোন কোন রকম বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি অথবা কারো দারিদ্র বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করা বা নাস্তিকে পরিনত করা অবৈধ।"[১৮১]

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলসমূহে ধর্মীয় অধিকার

মহানবী (সা.) এর বাণী,ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেক বিশ্বাস এবং ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের অধিকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা বর্তমানে 'পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Convention on Civil and political Rights) মধ্যে আমরা দেখতে পাই। যেমন অনুচ্ছেদ নং ১৮ তে বলা হয়েছে-

১. প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে এককভাবে অথবা অন্যের সহিত সম্প্রদায়গতভাবে নিজের পছন্দমত কোন ধর্ম অথবা বিশ্বাস রাখার বা গ্রহণ করার অধিকার এবং প্রকাশ্যে (inpublic) অথবা গোপনে (private) ধর্ম-চর্চা, পালন, অনুশীলন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাহার ধর্ম অথবা বিশ্বাস প্রকাশ (manifest) করার অীধকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. কোন ব্যক্তিকে এমন কোন বাধ্যতার অধীন করা যাবে না যার ফলে তার নিজের পছন্দমত ধর্ম বা বিশ্বাস রাখার বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

৩. কোন ব্যক্তির ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কেবল আইনের দ্বারা নির্ধারিত এমন সব বাধা নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে যেগুলো জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যান্যের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবশ্যক।

---

১৭৯ আল-কুরআন, ৬ : ১০৮

১৮০ আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬

১৮১ মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *মানবাধিকার ও ইসলাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খৃ,), পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৪. বর্তমান চুক্তির পক্ষরাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকার করছে যে, উহারা পিতামাতা এবং প্রয়োজনমত আইনসঙ্গত অভিবাকদের স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।[১৮২]

মহানবী (সা.) বাণী ,ভাষণ ও চুক্তিসমুহে বিবেক, বিশ্বাস এবং ধর্মের ক্ষেত্রে যে অধিকার ঘোষণা করেছেন এর প্রতিফল ঘটেছে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের ৯ নং অনুচ্ছেদে। প্রাসঙ্গিক বিধায় আমরা অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করতে পারি।

অনুচ্ছেদ : ৯

১. প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে। এই অধিকারের মধ্যে তাঁহার ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা, এবং এককভাবে বা অন্যান্যের সহিত সমষ্টিগতভাবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্চা, শিক্ষাদান, অনুশীলন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস ব্যক্ত করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

২. কোন ব্যক্তির নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস ব্যক্ত করার স্বাধীনতা কেবল আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয় সেরূপ এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জননিরাপত্তার স্বার্থে, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা সংরক্ষণ অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সীমাবদ্ধতার অধীন হবে।[১৮৩]

বিবেক, বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারের প্রতিফল ঘটেছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে। বাংলাদেশের সংবিধানে এগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ৩৯ ও ৪১ অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হলঃ

৩৯/(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হল।[১৮৪]

৪১. (১) আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে

ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।[১৮৫]

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মের কারণে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৯ অনুচ্ছেদে সরকারী কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্মের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ

---

[১৮২] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩

[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

[১৮৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়– ২০০৩ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংশোধিত), পৃ. ১১

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

সকল অনুচ্ছেদের সাথে ৪১ অনুচ্ছেদ মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার সকল প্রকার নিশ্চয়তা বিদ্যমান রয়েছে।[১৮৬]

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন

ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারা নং ২৯৫ এ বলা হয়েছে,

"কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা উহা অপবিত্র করা। যে ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে বা এইরূপ অবগতি সহকারে জনগণের যে কোন শ্রেণীর উপাসনালয় বা উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পবিত্র বলে বিবেচিত কোন বস্তু ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্রকরণকে তাহাদের ধর্মের প্রতি অবমাননা বলিয়া বিবেচনা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে– যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।"[১৮৭]

বিভিন্ন দেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়েছে, যেমন–আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে-

Article 25. (1) Subject to public, morality and health and to the other provisions of his part, all persons are equally entitled of freedom of conscience and the freely to profess, practice and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall effect the operation of any existing law or prevent the State from making any law-

(a) Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice.

(b) Providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে,

The first Amendment to the constitution (1791) says-

'Congress shall make no law respecting an establishment of religion or .... prohibiting the free exercise thereof.'

অস্ট্রেলিয়ার সংবধিানে বলা হয়েছে,

S.116.

'The commonwealth shall not make any law for establishing or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise of

[১৮৬] গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৬
[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth.'

সোভিতে ইউনিয়নের সংবিধানে (অধুনালুপ্ত)

Article 124. (1936)

'Freedom of religious worship and freedom of anti-religious propaganda is recognized for all citizens.'

ফ্রান্সের সংবিধানে

'No one ought to be disturbed on account of his opinion. Even religious. Provided their manifestation does not derange the public order established by law.'

Freedom of religion is guaranteed to all.... No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration. Rite or practice.

পশ্চিম জার্মানির সংবিধানে

1. Freedom of faith and conscience and freedom of religious and ideological (weltanschauliche) profession shall be inviolable.
2. Undisturbed practice of religiolt shall be guaranteed.
3. No one may be compelled against his conscience to perform war service as a combatant. Details shall be regulated by a federal law.[১৮৮]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিতে বাসস্থানের অধিকার প্রসঙ্গ

মৌলিক চাহিদার তালিকায় খাদ্য বস্ত্রের পরই আশ্রয় বা বাসস্থানের অবস্থিতি। বাসস্থান ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সমকালিন বিশ্ব আবাসনকে অসীম গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আবাসনের সাথে সাংবিধনিক অঙ্গিকার জরিত। উন্নয়নের উদ্যোগকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আবাসনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বাসস্থানকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। কুরাইশদের বাসস্থান তথা মক্কাশহর পবিত্র ও সম্মান করে বলেছেন " তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন হারাম তোমাদের জন্য এ মাস এবং এ শহর" । রাসূলুল্লাহ (সা.) বানি গাদিয়ারের সাথে চুক্তি করার সময় বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তাদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন' তাদেরকে তাদের বাড়িতে

[১৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৬-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।' বানু আদিয়ারের সথে চুক্তি পত্রে আছে "তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। এবং তাদের বসতবাড়ি হতে উৎখাতও করা হবে না।"

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৫(১) অনুচ্ছেদে বাসস্থানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে -

অনুচ্ছেদ : ২৫

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তাঁহার পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা (social services) সহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে, এবং বেকারত্ব ,রোগ, অসামর্থ্য, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা তার আয়ত্তাতীত অন্য কোন কারণে জীবিকার অভাব ঘটিলে তাঁর নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি মানবাধিকারের অন্যতম মৌলিক অধিকার বাসস্থানের অধিকার রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ভাষণ ও চুক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ
রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গ

জাহেলী যুগে ব্যক্তি স্বাধিনতা ছিল না। জাহেলিয়াতের যুগে অবিচার-অত্যাচারের যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল তার সুদীর্ঘ তালিকার অন্যতম ছিল যে, কোন পরিবার এমনকি গোত্রের কোন এক ব্যক্তি অপরাধ করলে গোটা পরিবার বা গোত্রকেই সে অপরাধে অপরাধী মনে করা হত। প্রকৃত দোষী ব্যক্তি আত্মগোপন করলে পরিবারের যাকেই পাওয়া যেত তাকেই শাস্তি দেয়া হত। ভাইয়ের অপরাধে ভাইকে এবং পিতার অপরাধে পুত্রকে পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে মোটেই দ্বিধাবোধ ছিল না। তখন এমন একটি অমানবিক প্রথাও অনেক দেশে আইন হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং স্বাধীনতা আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। কোন ধরনের জোর জবরদস্তির সম্ভাবনা ইসলামী রাষ্ট্রে নেই। একজনের অপরাধের জন্য অপরজন দায়ী নয়, তাইতো মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন– "একজনের অপরাধে, অন্যজন দায়ী হবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে আর পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।[১৮৯] ভাষণের এ অংশে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- 'ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।' রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা সনদের ৩০ নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে " বানূ আউফ গোত্রে ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধুমাত্র সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।

১৮৯ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), *আস-সাহীহ*(রিয়াদ : দারস সালাম, তা.বি.), পৃ. ২৩৪-২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিদায় হজ্জের ভাষণ ও মদিনার সনদে মহানবী (সা.) উপরোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের তৃতীয় ও নবম অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষিত করা হয়েছে ইসলামে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং স্বাধীনতা আল্লাহ প্রদত্ত।

ইসলামে এ রকম নীতি অবলম্বন করা হয়েছে যে, কোন উচ্চ আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কারাদণ্ড দেয়া যায় না। কোন ব্যক্তিকে কেবল সন্দেহের বশে কারাদণ্ড দেয়া, বিনা বিচারে, ছলচাতুরির মাধ্যমে, নিরাপত্তাবন্দী করে রাখা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামী নীতি অনুযায়ী কোন উপযুক্ত আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোন নাগরিকের অপরাধ প্রকাশ্য আদলতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা যাবে না। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বা দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে। রুদ্ধদ্বার করে বন্দীর বিচার করার ধারণা ইসলামে নেই বরং সব ধরণের বিচার কর্মই অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনসহ পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সুবিধার সংরক্ষণ সাপেক্ষে প্রকাশ্য আদালতেই হতে হবে।[১৯০] প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে যে, অন্যের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে গ্রেফতার করা, আটক করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে অর্জন করে তা তার নিজের জন্যই। কেহ কারো বোঝা বহন করবে না।"[১৯১]

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: প্রত্যেক জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার। (Article 3. Everyone has the right plife; liberty and securety of Person) এই অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে 'স্বাধীনতার অধিকার।' মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন সত্তা নিয়ে। কিন্তু যুগে যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বাধীন মানুষের ঘাড়ে জুড়ে দেয় পরাধীনতার নির্মম যোয়াল। এই পরাধীনতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে করেছে বাধাগ্রস্থ।[১৯২]

আদিম যুগে মানুষ যখন জঙ্গলে বাস করত তখন সে ছিল নিতান্তই স্বাধীন। কিন্তু ক্রমেই মানুষ যখন বাড়তে থাকলো তখন সবল আধিপত্য দুর্বলের উপর যখন মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করলো মানুষ নামের কতিপয় সুবিধাভোগী উৎপীড়ক লোক, তখন শুরু হল স্বাধীনতা পূনরুদ্ধারের সংগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়। তাই এই অধিকার মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্রথমত, স্বাধীন ব্যক্তির অর্থ স্বাধীন দেশের মানুষ। যে ব্যক্তি স্বাধীন দেশের অধিবাসী নয় সে আপন দেশে পরবাসী; পরের ইচ্ছায় তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীন

---

১৯০ আবদুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

১৯১ সম্পাদনা পরিষদ,*বিধিদ্ধ ইসলামী আইন*, পৃ. ৭৮৪

১৯২ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মানুষ হলেই যে সে স্বাধীন হবে এমন গ্যারান্টি নেই। সুতরাং দ্বিতীয় স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয় অন্য সকল প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তিকে বুঝায়। এই অধীনতাগুলো হচ্ছে ঃ

ক) অর্থনৈতিক অধীনতা ঃ অর্থনৈতিক অধীনতা এমন একটি বন্ধন যা মানুষকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশের অর্থবিষয়ক নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। আর আর্থিক কারণে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না।

খ) সামাজিক স্বাধীনতা: সমাজের এমন অনেক আদেশ নিষেধ থাকতে পারে যেগুলোর উৎস হয়ত কল্যাণকর কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অন্ধ সংস্কার। এই অন্ধ সংস্কারের অধীনতাও একটি বড় অভিশাপ। যারা এর বশ্য তারা স্বাধীনতার স্বাদ পায় না।

গ) সাংস্কৃতিক অধীনতা : তথাকথিত উন্নত সভ্যতার আগ্রাসনে অনেক লোকজ ঐতিহ্য আজ দেশে দেশে অপসৃয়মান। যে দেশের যে সংস্কৃতি সে দেশের মানুষ অন্য সংস্কৃতির অধীন হলে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়।[১৯৩]

এখন আসা যাক মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণায় নবম অনুচ্ছেদ । এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

"কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে (arbitrarily) গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।"[১৯৪]

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে বিধিবহির্ভূতভাবে গ্রেফতার আটক ও নির্বাসন করা যাবে না। কথাটি একটু ঘুরিয়ে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে কোন ব্যক্তিকে বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে গ্রেফতার আটক ও নির্বাসন করা যাবে।[১৯৫]

এখানে আমরা দেখতে পাই মানবকে তিনটি বিশেষ অবস্থা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন–

১. গ্রেফতার (Arrest)

২. আটক (Detention)

৩. নির্বাসন (Exile)

গ্রেফতার (Arrest)

গ্রেফতার শব্দের অর্থ ধরা বা পাকড়াও করা। গ্রেফতার বলতে সাধারণত: আইন বলে আটক করা বুঝায়। বিভিন্ন দেশের আইনে বিভিন্নভাবে এর পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন ও সীমা নির্দেশ করা হয়েছে।

আটক (Detention)

আটক শব্দের অর্থ হচ্ছে অবরুদ্ধ, আবদ্ধ, অমুক্ত ইত্যাদি। এই উপমহাদেশে (detention) বলতে বুঝায় রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দিত্ব, আটক তথা নিবর্তনমূলক আটক। নির্বতনমূলক আটকের বিধান যে আইনে করা হয় তাকে প্রতিরোধ মূলক আইন বলে। বস্তুত, এই ব্যবস্থা প্রতিরোধের জন্য গৃহীত হয়, প্রতিশোধ বা শাস্তির জন্য নয়।

১৯৩ গাজী শামছুল রহমান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩৮

১৯৪ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

১৯৫ গাজী শামছুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

আইনে যা নিষিদ্ধ তাই অপরাধ। চোরাকারবার, ছিনতাই, দেশদ্রোহিতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো অপরাধ। সরকার যদি মনে করেন কোন ব্যক্তি এই সব অপরাধমূলক কাজের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাহলে অনিবার্য দুর্দিনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বতনমূলক আটক আদেশ দিয়ে তাকে আটক রাখতে পারেন।

নির্বাসন (Exile)

নির্বাসন বলতে সাধারণত স্বদেশভূমি থেকে বহিষ্কার বা কোন শাস্তি যোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া বুঝায়। শাস্তির বিধান হিসেবে এটা খুবই প্রাচীন। প্রাচীনকালে অপরাধীকে নির্বাসন দেয়ার প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। এই ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল অপরাধীদের মৃত্যু না ঘটিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, কোন ব্যক্তিকেই বিধি বহির্ভূতভাবে নির্বাসনে পাঠানো যাবে না। একটি অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এই অনুচ্ছেদ বিদ্রোহ করছে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাসন প্রথা প্রতিরোধের আহ্বান জানাচ্ছে। নির্বাসনে না যাওয়া মানুষের অধিকার।[১৯৬]

গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন যদি বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে হয় তাহলে এ বিষয়ে কোন আপত্তি কারো থাকে না, থাকা সঙ্গতও নয়। কিন্তু যখনই খেয়াল খুশিমত কাউকে গ্রেফতার করা হয়, আটক অথবা নির্বাসন করা হয়; তখনই তা হয় মানবাধিকার পরিপন্থি। সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এই স্বেচ্ছাচারী ঘটনা ঘটে। বিশেষত সামরিক, স্বৈরাচারী সরকার, ক্ষমতাসীন দল তাদের রাজনৈতিক শত্রু বা প্রতিশোধে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার করে জেলে পুরে রাখে। এতে নিরাপরাধ মানুষও অন্যায় শাস্তি ভোগ করে। অপরাধের জন্য শাস্তি হতে পারে; কিন্তু অপরাধ না করেও শুধু রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেয়া মানবাধিকারের পরিপন্থি। মানুষকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার আটক অথবা নির্বাসন করতে নিষেধ করা হয়েছে। জন্মগতভাবে মানুষ স্বাধীন। প্রত্যেক মানুষের তাই অধিকার আছে গ্রেফতার বা আটক না হওয়ার এবং নির্বাসনে না যাবার। শক্তিমানের দ্বারা দুর্বল আটক হয়, হতে পারে। দলীয় কারণে মানুষ গ্রেফতার হতে পারে তবে এই পরিস্থিতি যাতে না হয় সে জন্যই মানবাধিকারের এই ঘোষণা।[১৯৭]

ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সংরক্ষিত করা হয়েছে ইসলামে। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক করা যায় না। শুধুমাত্র সন্দেহ ও অনুমানবশত লোকদের গ্রেফতার করা কিংবা আদালতের বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে কারারুদ্ধ করা ইসলামে আইনসিদ্ধ নয়। বর্তমানে নজরবন্দী শিরোনামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যা কিছু হচ্ছে, ইসলামী আইনে কস্মিনকালেও তার কোন অবকাশ নেই। কুর'আনুল কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোন সাধারণ শাসক তো

---

১৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
১৯৭ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

দূরের কথা খোদ আল্লাহর রাসূল (সা.) তা খর্ব করতে পারেন না। ইরশাদ হচ্ছে– “আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে কিতাব, হিকমত (বিচক্ষনতা) ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে: ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও।” এরূপ বলা তার পক্ষে অশোভণীয় বরং সে বলবে তোমরা রাব্বানী বা খোদার গোলাম হয়ে যাও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যায়ন কর।[১৯৮] অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কোন শাসকের চাপিয়ে দেয়া হুকুম বা বিচারকে নয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণে প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রমাণ মেলে মদীনা সনদে। এই সনদ প্রণীত হয়েছিল মদীনার মধ্যকার নানান ধর্ম ও গোত্রের লোকদের মধ্যে। মুসলিমরা মদীনায় বিজয় অর্জন করে মদীনা রাষ্ট্র গঠন করার পর তা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার জন্য মদীনার অন্যান্য ধর্ম গোত্রের লোকদের সাথে এই সনদ (যাকে একটি চুক্তিনামাও বলা যায়) প্রণয়ন করেন। সনদের অধীনে মুসলিমদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম গোত্রের লোকেরা মদীনায় বসবাস করার অধিকার পায়। সনদে বলা হয় “মদীনা যদি কখনো বহি:শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে মদীনাস্থ মুসলিম অমুসলিম সবাই মিলে তা প্রতিহত করবে এবং যুদ্ধ করবে (মদীনা সনদ: অনুচ্ছেদ–৪৮)। কিছুদিন পর ইয়াহুদী ধর্মীয় উপজাতির কিছু লোক ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে সাহ্য করতে না পেরে[১৯৯] মদীনার বাইরের কিছু অমুসলিমের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনা আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণের ফলে “মদীনা সনদ” একটি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, একটি উপজাতির লোকেরা সনদ লঙ্ঘন করেছে, কাজেই তাদের যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বা স্বগোত্রীয় লোক মদীনায় তখনও ছিল তাদের উপর হামলা হবার সম্ভাবনার কথাই অনেকে ধরে নিবে। কিন্তু তাহলে মুসলমানদের দ্বারাও মদীনা সনদ লঙ্ঘিত হয়ে যেতনা কি? দ্বিতীয়ত, যদি মদিনা সনদ লঙ্ঘন করে তাদের উপর অত্যাচার করা হতো তাহলে তাদের মানবাধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বিত হতো না কি? অতএব, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়নি। যারা বহিরাগতদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনা আক্রমণ করেছে তারা সনদ লঙ্ঘনকারী হলেও যারা মদীনার মধ্যে বসাবস করে ব্যক্তিগতভাবে সদাচারণের অধিকারী ছিল তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ উক্ত সনদে কিংবা ইসলামে নেই। কাজেই তাদের সাথে মুসলমানরা সুন্দর আরচণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহনের জন্য চাপ দেননি। ইসলাম এভাবে শিখিয়েছে প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে।[২০০]

ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামী বিধান হলো আইনের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া কাউকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, আটক বা বল প্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম মালিক লিখেছেন– "In Islam no man be imprisoned without justice"[২০১] সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বা দোষী করা যাবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের এই অধিকারও রয়েছে যে, তাকে অন্যের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে পাকড়াও করা যায় না।

---

১৯৮ আল-কুরআন, ৩ : ৭৯

১৯৯ M.M. Ahsan Khan, *Human Rights in Islamic Pers Pective -A comprative Approach,* (Dahka: The Dhaka University studies, Part –F, Vol (iii), Jun-1992), p. 30

২০০ রেজা মণ্ডল ও মোঃ শাহজাহান মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২০১ ড.এ.বি.এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদ অলংঘনীয় বিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তার নিজের জন্যই কেউ কারো বোঝা বহন করে না।[২০২] অন্য জায়গায় বলা হয়েছে– فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ "জালেমদের ব্যতীত অপর কারো উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না।"[২০৩]

এই সমুদয় বিধিমালা থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রের অপরাধীর পরিবর্তে তার পিতা-পুত্র, মা-বোন অথবা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের গ্রেফতার করা যায় না। এমন ধরনের উদাহরণ বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিশ্বের নামমাত্র গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করতে এমনটি করা হচ্ছে। তবে উপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার মুসলিম ইতিহাস তা থেকে পুরোপুরি শূন্য। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন অত্যন্ত জালেম ও নির্দয় শাসক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তার সমস্ত খারাবি সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের আত্মীয় স্বজনদের প্রাণনাশের অপরাধ সংঘটিত হয়নি। তার রাজত্বকালের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হল, "তিনি কাতারী ইবনে ফুজাআহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন এবং বলেন, আমি তোকে হত্যা করেই ছাড়ব। কাতারী জিজ্ঞেস করল, কোন অপরাধে? হাজ্জাজ বললেন, তোমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কাতারী বলল, 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের লিখিত ফরমান আছে। আমার ভাইয়ের অপরাধে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না।' হাজ্জাজ বললেন, সেই ফরমান কোথায়? আমাকে দেখাও। কাতারী বলল, আমর নিকট তো এর চাইতেও অবশ্য পালনীয় পত্র রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'একজন অন্যজনের বোঝা বহন করবে না' এই জবাব হাজ্জাজের মনপুত হল এবং সাহাস্য বদনে তাকে রেহাই দিলেন।[২০৪]

রাসূলে করীম (সা.) এর ভাষ্য হচ্ছে– 'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক) কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুলবশত ক্ষমা করে দেয়া ভুলবশত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে উত্তম'[২০৫] অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেছেন– 'বাঁচানোর কোন পথ পাওয়া গেলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও'।[২০৬]

হযরত মায়েয ইবনে মালিকের ঘটনায় মহানবী (সা.) এর চিন্তাধারার উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। একবার সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর খোদ মহানবী (সা.) এর খিদমতে হাজির হল। সে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন (যথাযোগ্য শাস্তি দিন)'। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– কিভাবে রাসূল (সা.) তাকে রেহাই দেওয়ার পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রথমে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, 'যাও এখান থেকে, তওবা-ইসতিগফার কর'। সে সামনে ঘুরে এসে পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারে সে ঐ একই কথা পুনরুক্তি করল। এবারেও মহানবী (সা.) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত আবু বাকর (রা.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন। দেখ চতুর্থবার স্বীকার করলে মহানবী (সা.) তোমাকে প্রস্তরাঘাতে শাস্তি দিবেন। কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত না করে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করল।

---

২০২ আল-কুরআন, ৬ : ১৬৪

২০৩ আল-কুরআন, ২ : ১৯৩

২০৪ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

২০৫ আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.), অনু.ও সম্পা. মুহাম্মদ মূসা, *জামেআত-তিরমিযী*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.), পৃ.৬৮

২০৬. উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এবারে মহানবী (সা.) তার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, 'সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে অথবা আলিঙ্গন করেছিলে অথবা তোমার উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছিল।' সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি তার উপর উপগত হয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে যৌন সম্ভোগ করেছ? সে বলল, জি হ্যাঁ, অতঃপর তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, এভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান যেনা কাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ, আমি তার সাথে হারাম উপায়ে সে কর্মটি করেছি যা একজন স্বামী হালাল উপায়ে তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তুমি সুরা পান করনি তো? সে বলল, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখের ঘ্রাণ নিল এবং মদ্যপান না করার সত্যতা প্রমাণ করল। অতঃপর তিনি তার গ্রামবাসীদের থেকে জবানবন্দী নিলেন, এ লোকটি পাগল নয়তো? তারা বলল, আমরা তার মন-মগজে কোন বৈকল্য লক্ষ্য করিনি। মহানবী (সা.) হাযযাল ইবনে নুআইম (রা.)কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তো মায়েয ইবনে মালিকের লালন-পালন করেছিলে এবং আমার এখানে মাগাফিরাতের দু'আর পরামর্শ দিতে। হায়! যদি তার গোপনীয়তাকে ঢেকে দিতে পারতে তাহলে তোমার জন্য অতিশয় মঙ্গল হত।'

অতঃপর মহানবী (সা.) মায়েযের মৃত্যুদণ্ডের চূড়ান্ত রায় দিলেন। তাকে শহরের বাইরে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল। প্রস্তর নিক্ষেপণ শুরু হলে মায়েয পলায়ন করতে উদ্যত হয় এবং বলে, লোকজন! তোমরা আমাকে রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট নিয়ে চল। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে প্রতারিত করেছে। তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল এই বলে যে, রাসূলে করীম (সা.) আমাকে হত্যার আদেশ দিবেন না। কিন্তু প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা তাকে হত্যা করেই ফেললো। ব্যাপারটি মহানবী (সা.) কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? আমার নিকট নিয়ে আসলে হয়ত সে তওবা করত এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন।[২০৭]

এই ঘটনায় প্রতিটি প্রশ্ন থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহানবী (সা.) মায়েযকে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করেছেন। তার জবানবন্দী ও তার গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদানের বেলায় তিনি এমন কোন কারণ অনুসন্ধান করছিলেন যার দরুন তার জীবন বাঁচানো যেতে পারে। তিনি সরাব পানের নেশা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণও অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পেয়ে চূড়ান্ত রায় দেন। অতঃপর তা কার্যকর হওয়াতে তিনি ব্যথিত হন। এই ঘটনা থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিচার মীমাংসা করার সময়, বিশেষ করে কাউকে শাস্তি দেয়ার প্রাক্কালে বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়ার জন্যে কত বেশী পরিমাণে গভীর অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন।[২০৮]

হযরত উমর (রা.) এর জামানায় ইরাক থেকে এক ব্যক্তি তার খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কি? সে বলল, আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের বেসাতি চলছে। হযরত উমার (রা.) অবাক বিস্ময়ে বললেন, 'কি বল, এই জিনিস

২০৭ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫
২০৮ মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আরম্ভ হয়ে গিয়েছে!’ সে বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক, আল্লাহর শপথ! ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকে বিনা বিচারে আটক করা যায় না।’[২০৯]

হযরত উমার (রা.) এর সময়কার ঘটনা “হযরত উমার (রা.) মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে মদীনায় তলব করে জনতার সামনেই মোকদ্দমার বিবরণ শ্রবণ করেন। তিনি নির্যাতিত মিসরীর হাতে মুহাম্মাদ ইবনে আমরকে চাবুক লাগিয়েছেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)কেও অপমান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা তিনি গভর্নর হওয়াতে তাঁর ছেলে একজন নাগরিককে প্রহার করার দুঃসাহস পেয়েছিল। কিন্তু ফরিয়াদী আরজ করল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার প্রতিশোধ প্রত্যাহার করলাম। আমার অন্তর শীতল হয়েছে। আমাকে যে প্রহার করেছিল তাকে আমি প্রহার করেছি।’ সে সময় হযরত উমার (রা.) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কে সম্বোধন করে এই ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেন, ‘হে আমর! তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাস বানিয়ে নিলে? তাদের জননীরা তো তাদেরকে স্বাধীন প্রসব করেছে।”[২১০]

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামে উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর পারে না তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। কুর’আনুল করীমের পরিষ্কার নির্দেশ– وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ “তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।”[২১১]

মুসলমানের জন্য এই সাধারণ নির্দেশের সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কর্ণধার (রাষ্ট্রপতি) নবী করীম (সা.) কে বিশেষভাবে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুর’আনে ইরশাদ হচ্ছে- وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ “তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।”[২১২]

প্রথমোক্ত আয়াতের শব্দাবলী স্পষ্টই ঘোষণা দিচ্ছে যে, মনগড়া কোন সিদ্ধান্তের নাম ইনসাফ নয়। এর নিজস্ব একটা মাপকাঠি, একটি সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি সুনির্দিষ্ট আইন বিধান রয়েছে। তাই বিচারের রায় অবশ্যই ‘আইনের সুপ্রসিদ্ধ কার্যক্রমের (Due Process of Law) যাবতীয় শর্তের উপর পরিপূর্ণভাবে উৎরে যেতে হবে। এই ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের আদলতের বিধিবিধান স্বয়ং মহানবী (সা.) এর একটি বিচারকার্য থেকে প্রতিভাত হচ্ছে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ঘটনা। মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই অভিযানে বিজয়লাভের জন্য তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল- ঠিক সময়ের পূর্বে কাফিররা যেন এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে না পারে। এই পর্বে হাতিব ইবনে আবু বালতাআ নামে একজন সাহাবী তার পরিবার–পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য এক বৃদ্ধা মহিলার হাতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কাছে গোপনে একটি চিঠি পাঠান। এতে রাসূলে করীম (সা.) এর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা উল্লেখ ছিল। মহানবী (সা.) বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত যুবায়র (রা.)

---

২০৯ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রা.), অনু. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*(ঢাকা : ই. ফা.বা. ১৯৯৫ হি./ ১৪১৬ খৃ.), খ. ১, পৃ.১০৬

২১০ আল্লামা তানতাবী, *উমার ইবনুল খাত্তাব*, পৃ. ১৮৭। উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

২১১ আল-কুরআন, ৪: ৫৮

২১২ আল-কুরআন, ২৬ : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

কে সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠান। তাঁরা পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তা খুলে পাঠ করা হল। এতে কুরায়শদের জন্য এই গোপন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল যে, রাসূলে করীম (সা.) তাদের আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। হাতিবকে তলব করে প্রকাশ্য আদলতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হল। সে অত্যন্ত লজ্জানম্রভাবে বিনীত কণ্ঠে আরজ করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি কাফির ও মুরতাদ কোনটাই হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করিনি। আমার সন্তানেরা মক্কায় রয়েছে। সেখানে আমার সহায়তাকারী কোন গোত্র নেই। পত্রটি আমি কেবলমাত্র এজন্যেই লিখেছি যে, কুরায়শরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার করে অন্ততঃ আমার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না।

স্পষ্টত এটা ছিল প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার। এই পত্র কুরায়শদের হস্তগত হলে মুসলমানদের এই যুদ্ধের গোটা পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে যেত। সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে ফারুকে আযম হযরত উমার (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দেই।' কিন্তু রাহমাতুললিল আলামীন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক মহানবী (সা.) বড়ই কোমল কণ্ঠে বললেন, 'উমর! হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং সে তার কৃতকর্মের যে কারণ বর্ণনা করেছে তা ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ সত্য।' হযরত উমর (রা.) এই জবাব শুনে তপ্তহৃদয়ে কেঁদে ফেলেন এবং এই বলে বসে পড়লেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

হাতিবের এই মুক্তির একদিকে মানব প্রাণের মর্যাদা, অপরদিকে মারাত্মক অপরাধের প্রকাশ্য আদালতে শুনানী ও অপরাধীর সাফাই-এর সুযোগদানের নজীরবিহীন উদাহরণ। পৃথিবীর কোন সরকার না এই ধরনের অপরাধীকে কখনো প্রকাশ্য আদলতে হাজির করত আর না কোন আদালত এরূপ মারাত্মক অপরাধে অপরাধীকে তার নিজের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর পর মৃত্যুদণ্ডের চাইতে কম শাস্তি দিত। কিন্তু মহানবী (সা.) হাতিবের অতীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তার বর্ণনার সত্যতা বিবেচনা করে মৃতুদণ্ড তো দূরের কথা কোন সাধারণ শাস্তিও দেননি। তার পদস্খলনের কারণে সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে তার যে অপমান হল তাকেই তিনি যথেষ্ট শাস্তি মনে করলেন। কুর'আনুল করীমের সূরা আল-মুমতাহিনায় এই ঘটনার বর্ণনা এসেছে।[২১৩]

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতকালে খারিজীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কখনো তাঁর বিরোধিতা করার অপরাধে কোন খারিজীকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আবদ্ধ করেননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন এবং এই নীতির উপর অবিচল থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

আলী ইবনে আরতাতা নামে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) এর একজন কর্মচারী ছিল। একবার তিনি খলীফার কাছে লিখেন, 'আমাদের এখানে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে কিছুটা শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত অবশ্যদেয় খারাজ (কর) পরিশোধ করে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। তিনি জবাবে লিখেন, 'আমি হতবাক হয়েছি যে, তুমি মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ। মনে হয় যেন আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারব, কিংবা

২১৩ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

আমার সম্মতি তোমাকে আল্লাহর গযব থেকে রেহাই দেবে। আমার পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে এই নীতি অবলম্বন করবে যে, যে ব্যক্তি তার উপর ধার্যকৃত কর সহজে দিয়ে দেবে তার থেকে তা গ্রহণ কর এবং যে দিতে চায় না তার থেকে হলফ (শপথ) নিয়ে ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! মানুষের নিজের পাপের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া; কাউকে শাস্তি দেয়ার অপরাধ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়'[২১৪]

আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাযী আবু ইউসুফ (রা.) আটকাদেশ (Detention) সম্পর্কে বলেন, 'কেউ কোন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল-হাজতে চালান দেওয়া জায়েয নয় এবং জায়েয হওয়ার কোন অবকাশও নেই। রাসূলে করীম (সা.) শুধুমাত্র অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করতেন না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে বাদী-বিবাদী উভয়কে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। বাদীর কাছে কোন সংগত প্রমাণ থাকলে তার পক্ষে রায় দিতে হবে নতুবা বিবাদীর নিকট থেকে জামানত নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হেব। যদি এরপরে বাদী কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তো বেশ; অন্যথায় বিবাদীর সাথে বিরূপ ব্যবহার করা যাবে না।[২১৫]

ইসলামের এই বিধান অবস্থা ও পরিস্থিতির বাধ্যগত নয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এগুলো স্থগিত করা যায় না। তা সর্বাবস্থায় কার্যকর থাকবে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যায়ভাবে নাগরিকগণ আটক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

UDHR -এর-১ অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নীতি সমর্থণ করে বলা হয়েছে, 'সকল মানুষ স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সম-মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন।' তারা বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরষ্পরের সাথে আচরণ করা।'[২১৬]

UDHR -এর অনুচ্ছেদ : ৩ এ বলা হয়েছে– প্রত্যেকের জীবনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়োছে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ : ৫ -এ ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে,

অনুচ্ছেদ : ৫ (১)-এ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা (Liberty) এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার আছে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত কার্য পদ্ধতি ব্যতীত কাহাকেও তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর কোন ব্যক্তির আইন সম্মত আটক

২১৪ *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৩৭৭। উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
২১৫ আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২১৬ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

খ) কোন আদালতের আইন সম্মত নির্দেশ অমান্য করার কারণে অথবা আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোন দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য, কোন ব্যক্তির আইন সম্মত গ্রেফতার অথবা আটক।

গ) কোন ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে যুক্তি সংগত সন্দেহ থাকলে তাকে আইন সম্মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির করার উদ্দেশ্যে, অথবা যখন তাকে কোন অপরাধ সংঘঠন করা হতে বিরত রাখা কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনের পর পলায়ন করতে না দেওয়ার জন্য যুক্তি সংগতভাবে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় তখন তার আইন সম্মত গ্রেফতার বা আটক।

ঘ) সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির আইন সম্মত আটক অথবা অপ্রকৃতিস্থ, মাদকাসক্ত বা নেশাগ্রস্ত অথবা ভবঘুরে ব্যক্তিদের আইন সম্মত আটক;

ঙ) কোন ব্যক্তিকে দেশে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করা হতে বিরত করার জন্য, অথবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্বীপান্তর অথবা বহিঃসমর্পণের (Extradition) উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে ব্যক্তির আইন সম্মত গ্রেফতার অথবা আটক।[২১৭]

২. গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে যে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় গ্রেফতারের কারণ এবং তার বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩. এই অনুচ্ছেদ (১) গ. পরিচ্ছেদ এর বিধানবলী অনুসারে গ্রেফতার কৃত বা আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্বর কোন বিচারক অথবা, আইনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করাতে হবে এবং তার যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিচার পাওয়ার অথবা বিচার সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে মুক্তি লাভের অধিকার থাকবে। অনুরূপ মুক্তিলাভের অধিকার বিচারের জন্য হাজির হওয়ার নিশ্চয়তার শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে।

৪. গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হলে তিনি (আইনগত) কর্ম ধারা গ্রহণ করতে পারেন, এই কর্মধারার মাধ্যমে কোন আদালত কর্তৃক তার আটকের বৈধতা সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং যদি আটকাদেশ আইন সম্মত না হয় তবে তার মুক্তির আদেশ দেওয়া হবে।

৫. অনুচ্ছেদের বিধানাবলী লজ্মন করে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ফলে তিনি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে তার ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎযোগ্য অধিকার থাকবে।[২১৮]

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন অনুচ্ছেদ ঃ ৬ (২) -এ বলা হয়েছে।

ফৌজদারী অপরাধে (Criminal Offence) অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুসারে দোষী প্রমাণিত না হন ততক্ষণ তিনি নির্দোষ বলে গণ্য হবেন।

অনুচ্ছেদ : ৬ (৩)-এ ফৌজাদারী অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নলিখিত ন্যূনতম অধিকারসমূহ আছে–

ক) তিনি যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় এবং সবিস্তারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে অবিলম্বে অবগত হওয়া।

খ) তার আত্নপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধাদি লাভ।

---

২১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪-৪২৫

২১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫-৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

গ) ব্যক্তিগতভাবে নিজেই অথবা আইনগত সাহায্যের (Legal asistance) মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা, যদি আইনগত সাহায্য লাভের জন্য ব্যয় করার মত যথেষ্ট সম্বল তার না থাকে তবে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে বিনা খরচে (Free) অনুরূপ সাহায্য লাভ

ঘ) যদি তিনি আদালতের ব্যবহৃত ভাষা না বুঝেন তবে বিনা খরচে একজন দোভাষীর (Interpreter) সাহায্য লাভ করবে।[২১৯]

দশম পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও ভাষণে জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গ

কোন ভূখণ্ডের মানুষ যখন অধিকতর গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য জনগণ থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে। তদানিন্তন পৃথিবীতে জাতীয়তা ও জাতিভেদ বিশেষ করে বর্ণবাদ ও শ্রেণী বৈষম্য বিশ্ব শান্তির জন্য ছিল একটা বিরাট সমস্যা। উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, সভ্য-অসভ্য, প্রভৃতি জাত্যাভিমান বিদ্যমান ছিল। যা ছিল ইসলামী সাম্যনীতির প্রধান অন্তরায় । বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল জাতীয়তার প্রশ্নে বিভেদ, বৈষম্য, ও কল্পিত মর্যাদার মানদণ্ড এং অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করে জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন "হে মানব! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ এক, তোমাদের পিতা এক।"[২২০]

ভাষণের এ অংশে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- জাতীয়তার অধিকার। মানুষের মৌলিক এবং প্রধান পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয়তা। মানুষ বিশ্বমানব সম্প্রদায়ের অংশ। বিশ্ব সভায় মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয়তার মাধ্যম। জাতীয় পরিচয়েই মানুষ আবির্ভুত হয় বিশ্বের দরবারে। এই পরিচয় হরণ করা হলে মানুষের একটি প্রধান সত্তাকে হরণ করা হয়।[২২১] জাতীয়তা সম্পর্ক পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً "সমস্ত মানুষ ছিল এক উম্মত।"[২২২]

জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক। জাতীয়তার অধিকারকে ইসলাম সম্মান প্রদর্শন করে। জাতীয়তার অধিকার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে, বিশেষ করে জানতে হবে জাতীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত মানবাধিকার দলীলগুলোতে কি বলা হয়েছে এবং জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য কি?

নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল-

জাতির সংজ্ঞা

ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus থেকে জাতি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Natio বা Natus এর অর্থ হচ্ছে জন্ম। সেদিকে থেকে বিচার করলে জাতি হচ্ছে একই বংশোদ্ভুত জনসমষ্টি। কিন্তু আধুনিককালে জাতি বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কতকগুলো সাধারণ ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত। ম্যাকইভারের মতে, "জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট, আধ্যাত্ম চেতনা দ্বারা সমর্থিত,

---

২১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

২২০ আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, খ.২, পৃ. ৪৪৯

২২১ সম্পাদনা পরিষদ,*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, খ.৩, পৃ.৮২১

২২২ আল-কুরআন, ২: ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

একত্রে বসবাস করার সংকল্পবদ্ধ, সম্প্রদায়গত মনোভাবসম্পন্ন জনসমাজ, যারা নিজেদের জন্য সাধারণ শাসনতন্ত্র রচনা করতে চায়।"[২২৩]

জাতি স্বাধীন হতে পারে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত কোন পরাধীন জনগোষ্ঠীও জাতি হতে পারে। পৃথিবীতে এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে।

জাতিয়তা

একই ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম বংশ, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ও লালিত হয়ে যখন কোন জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা মনে করে তখন সেই জনসমষ্টি জাতীয়তায় পরিণত হয়। ফরাসি চিন্তাবিদ বেনান বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এবং এটা এক প্রকার সজীব মানসিকতা। একটি জাতীয় সমাজ যখন পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে তখনই তা জাতিতে পরিণত হয়। জাতি জাতীয়তার ধারণার বাস্তব রূপ মাত্র। জাতীয়তার ধারণা যেখানে নেই সেখানে জাতি গড়ে উঠতে পারে না।"[২২৪]

জাতীয়তার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা

জাতীয়তা একটি চেতনার নাম, একটি প্রেরণার নাম। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সহযোগিতা করে। এই চেতনা মানুষকে কতিপয় সাধারণ ও অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে সম্মিলিতভাবে কাজ করে,এক জাতির মানুষ তাদের সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ মনে করে। জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মুক্তি লাভ, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ লাভ এবং সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ।

"রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে ঐক্যসূত্র দরকার সেটি হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্য, ভুখণ্ড ইত্যাদি যে সব উপাদান জাতি গঠনে মানুষকে উৎসাহিত করে সে সবের এক বা একাধিক উপাদানের ভিত্তিতে মানুষ জাতি গঠন করে। এই জাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সমন্বয় সমঝোতা, বন্ধুত্ব, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, একাত্মতা ও অভেদ রক্ষার জন্য যে বিষয়টি ভিতর থেকে মানুষকে প্রেরণা দান করে তা হচ্ছে জাতীয়তা।[২২৫]"

জাতীয়তাবোধই মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা দান করে, মানুষকে উদ্দীপিত করে। যেমন– একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ ত্যাগ দরকার হয়, অগণিত জীবন আর শুধু কি স্বাধীনতা অর্জন, একে রক্ষা করার জন্যও কম ত্যাগের দরকার হয় না। জাতীয়তাবোধই মানুষের এই যে ত্যাগ, উৎসর্গ, কুরবানি, বিসর্জন বা সমর্পণ এসবের জন্য কে মানুষকে উদ্যম ও উদ্দীপনা জোগায়।

জাতীয়তা হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের অন্যতম সূত্র, যে সূত্রের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরকে পরস্পরের সামনে তুলে ধরে। এটা যেমন ঐক্যের সূত্র তেমনি এটা পার্থক্যেরও সূত্র। জাতীয়তা একদল

---

২২৩ উদ্ধৃতি, গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯
[২২৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০
[২২৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করে আবার এক জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ইতহাস, ঐতিহ্য ও ভূখণ্ডের মানুষ যেমন একজন অন্যজনকে একেবারে আপনার করে নিতে পারে না তেমনি অভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্যের অধিকারী মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তাদের ঐক্যের জন্য একটি অবলম্বন চাই। জাতীয়তা হচ্ছে সেই অবলম্বন।

জাতীয়তার অধিকার হরণ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রত্যেকের জাতীয়তার অধিকার স্বীকার করে এবং কাউকেই জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

জাতীয়তা পরিবর্তন

জাতীয়তা ধারণের অধিকার যেমন মানুষের রয়েছে, তেমনি জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকারও রয়েছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষের জাতীয়তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেছে, "কাউকেও যথেচ্ছভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং কেউ যদি নিজের জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে এতে অস্বীকার করা যাবে না।"

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে, তাকে বলে জাতীয়তাবাদ। জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব বা আর্দশকে বলে জাতীয়ভাব বা জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রসার ঘটে। এরফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

জাতীয়তার অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিলসমূহ নিম্নরূপ

১. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৪৮ (Universal Declaration of Human Righst-1948) এর ১৫ নং অনুচ্ছেদে জাতীয়তার অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, এভাবে

"১. প্রত্যেকের জাতীয়তালাভের অধিকার (Right to Nationality) রয়েছে, ২. কোন ব্যক্তিকে তাঁহার জাতীয়তা হইতে স্বেচ্চাচারিতভাবে বঞ্চিত করা যাইবে না কিংবা তাহার জাতীয়তা পরিবর্তন করার অধিকারকেও অস্বীকার করা যাইবে না(Article : 15.1.Everyone has theright to a nationality, 2.No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right the right to change his nationality.)[226]।"

সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International Convention on the Elimination of all from of Racial Discrimnation) এর

[226] আবুল ফজল হক, আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ৫/(ঘ) ১. জাতীয়তার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে,"অন্যান্য পৌর অধিকার বিশেষত: জাতীয়তার অধিকার[২২৭]।"

জাতীয়তা ধারণের, জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার এবং জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকারটি মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মানুষের একটি জাতিগত পরিচয় অবশ্যম্ভাবী যে পরিচয়ে সে আবির্ভুত হবে বিশ্ব মানচিত্র। কারো জাতিগত পরিচয় হরণ মানবাধিকারের পরিপন্থী।

জাতীয়তাবাদ প্রেক্ষিত বর্তমান বিশ্ব

জাতি বা নেশন বলতে মানুষের একটি সমষ্টিকে বুঝায়; বংশ, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার উপর সাধারণত জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

"জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে, তাকে বলে জাতীয়তাবাদ। দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে এক একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ সম্প্রদায়গত যে জীবনে এসে পৌঁছায় তাকে বলা হয় জাতীয় সম্প্রদায়। এই জাতীয় সম্প্রদায়ের দুটি দিক আছে– সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। সামাজিক দিক থেকে জাতীয় সম্প্রদায়কে বলে জাতীয় সমাজ আর রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে তা হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা জাতীয় রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত[২২৮]।"

জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব বা আদর্শকে বলে জাতীয় ভাব বা জাতীয়বাদ। আবার কোন পরাধীন জাতি বা জনসমাজ যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে তবে তাকেও জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করা হয়।

জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভবের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ কলহ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। দেশে দেশে সীমান্ত বিরোধ, যুদ্ধবিগ্রহ লেগে আছে। এই কলহ, বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিপরাত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিকতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব, তার লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রের স্থলে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণাকে অতিসাম্প্রতিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রিসে নগর হেলেনেস্টিক রাষ্ট্র চিন্তায় এর আভাস পাওয়া যায়। যেমন, "তৎকালীন গ্রিক চিন্তাবিদগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিশ্বনগরীর (World City) আদর্শ বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা করেন। মধ্যযুগীয় অন্যতম দার্শনিক চিন্তাবিদ দান্তেও (Dante) তার সময়কালের ইতালির অভ্যন্তরীণ দুরাবস্থা অবলোকন করে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন[২২৯]।" কেননা আধুনিককালের

---

[২২৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৩
[২২৮] গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
[২২৯] গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থসংঘাত, আদর্শিক দ্বন্দ্ব, সীমান্ত বিরোধ, অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বার্থকতা ও সফলতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং বাস্তব-অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে জাতীয়তার এই ভিত্তির মূলগত ভ্রান্তি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতীয়তাবোধ যখন সামগ্রিকভাবে একটি সক্রিয় আন্দোলনে রূপায়িত হয় তখন তা অত্যন্ত মারাত্মক (Agressive) হয়ে পড়ে।

বিগত দুইশ, আড়াইশ বৎসর কাল ধরে এ জাতীয়তাবাদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে সভ্য দুনিয়ায় তা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ ও সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করার জন্য জাতীয় উপায় উপকরণ নিযুক্ত করা নীতি অনুসারে অপরিহার্য কর্তব্য। জাতির পক্ষে যা উপকারী, তাই মঙ্গল, তাই পূণ্যের কাজ। পক্ষান্তরে জাতির পক্ষে যা উপকারী নয় কিংবা যা ক্ষতিকর তাই পাপ, তাই অন্যায়, অতএব তাই পরিত্যাজ্য। এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

সামগ্রিকভাবে মানবজগত অন্ধ জাতীয়তাবাদের (Nationalism) অবস্থাও ঠিক তাই। রাষ্ট্র গঠন করে জাতি, জাতিই নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের লক্ষ্যও উদ্দেশ্যে। জাতির সমষ্টিগত উদ্দেশ্য লাভ করবার জন্যই একান্তভাবে নিয়োজিত হয় রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায়-উপকরণ। যে জাতি নিজের লাভ ও স্বার্থকেই একমাত্র পূণ্য ও কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, সে জাতির নিকট চরিত্র বা নৈতিক আদর্শ বলতে কিছুই থাকতে পারে না। থাকতে পারে না কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ। ধর্মহীনতাই তাকে একেবারে বল্গাহারা করে নৈতিক অধঃপতনের চরমসীমায় পৌঁছে দেয়। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি জাতি চরিত্রের মূল্য এবং ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছামত রচনা করতে শুরু করে।

বস্তুত ধর্মহীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র এই তিনটি মৌলিক মতাদর্শের ভিত্তিতে যদি কোন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তবে তা সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী তথা বিশ্ব মানবের পক্ষে মোটেই শান্তিদায়ক ও কল্যাণবিধায়ক হতে পারে না। বরং তা দুনিয়াব্যাপী সৃষ্টি করবে ফেতনা-ফাসাদ এবং অশান্তি ও বিপর্যয়েন তান্ডব নৃত্য।

জাতীয়তাবাদের এই মারাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার ‘শিক্ষা ও সমাজে’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, “জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজা এ যুগে মদ্যপান, ব্যবসার ক্ষেত্রে বেঈমানী অথবা অন্য কোন নৈতিকতা বিরোধী পাপ অপেক্ষা অনেক বেশী মারাত্মক। জাতি পূজা খতম না হলে সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে না। জাতি পূজা নীতিগতভাবেই এক পৈশাচিক ব্যপার, আযাদীযুদ্ধে লিপ্ত জাতি সমূহের মধ্যেও উহা প্রচার হওয়া উচিত নয়।”

বর্তমান দুনিয়ায় এই যে অশান্তি, জুলুম, শোষণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিই এর মূল কারণ। আর তাইতো Right is Might (সত্যই শক্তি) এর পরিবর্তে Might is Right (শক্তিই সত্য) এই মত চরম সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্রের এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করবার পরও যদি বর্তমান দুনিয়ায় মানুষ এ মতে তথা জাতীয়তাবাদে আকৃষ্ট হয়ে ইহা গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে নিত্য নতুন রাষ্ট্র কায়েম করে, তবে তাতে দুনিয়ায় ফাসাদকারী রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাই উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে মাত্র নতুবা দুনিয়ার কোন কল্যাণই তাতে সাধিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, এ ধর্মহীন গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ হিসেবে একবার স্বীকার করে নিলে পর অনন্তকাল পর্যন্ত সেখানে ধর্মভিত্তিক মতাদর্শের কোন কথাই উঠতে পারে না। আর সেই জালেমও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের অধীনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বা আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের বিন্দুমাত্র সুযোগ লাভ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই ধরনের মতাবলম্বীদের সম্পর্কই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ،أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ، أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ،إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ "তোমরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারলে তোমরা পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং মানবতার সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে ইহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। এইরূপ যারা করে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত তাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অপহৃত হয়েছে কি? তারা কি কুর'আন পড়ে চিন্তা ও গবেষণা করে না? কিংবা এদের অন্তর কি তালা বদ্ধ হয়ে আছে। যে তারা কুর'আন পাঠ করে ও তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না?[২৩০]"

জাতীয়তার অধিকার সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

মানুষের কিছু পরিচয় আছে, যেগুলো লাভ করার ব্যাপারে নিজস্ব কোন অধিকার বা দায়িত্ব নেই। যে পরিবারে এবং যে দেশে এবং যে পিতার ঔরষে এবং মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পরিবার দেশ এবং পিতা মাতা তার পরিচয়। এই পরিচয় এতই স্বাভাবিক যে, এগুলো থেকে অধিকার বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

জাতীয়তার অধিকারকে ইসলাম সম্মান প্রদর্শন করে। ইসলাম মানুষকে অভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী মনে করে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। কুর'আনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, انَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ "শুরুতে সকল মানুষ একজাতিভুক্ত ছিল, আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হসিাবে নবীগণকে পাঠালেন তাদের সাথে সঠিকভাবে কিতাবও নাযিল করলেন, যাতে লোকে যে বিষয়ে বিবাদ করতে ছিল, সে বিষয়ে তারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারবে[২৩১]।" সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "মানুষ প্রথমে এক জাতি ছিল, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে। যদি তোমার প্রভুর তরফ হতে আগেই দণ্ড না দেয়ার ওয়াদা না হত তবে তারা যে বিষয়ে দলাদলি করছে তার শেষ মীমাংসা করহেই দেয়া হত।"[২৩২]

ইসলাম সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন জাতি অর্থাৎ মানব জাতি মনে করলেও মানুষের জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করেনি। কুর'আনের সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ হে

---

[২৩০] আল-কুরআন, ৪৭ : ২২-২৫
[২৩১] আল-কুরআন, ২ : ২১৩
[২৩২] আল-কুরআন, ১০ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

লোকসকল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃজন করেছি এবং আমি তোমাদেরকে নানা উপজাতি ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সবচেয়ে নেককার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন সবকিছুর খবর রাখেন[২৩৩]।" অর্থাৎ কুর'আনুল কারীমের এই আলোচ্য আয়াত সমূহে ফুটে উঠেছে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই হিসেবে পরিচিতি দিয়েছেন কিন্তু তিনি তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্ত করণ সহজ হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতি এক, তবে তাদের মধ্যে পরিচয় নির্দেশ করার জন্য বর্ণ গোত্র ও জাতিগত বিভিন্নতা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, এটি যেমন সত্য; আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এটিও তেমনি সত্যি। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা বাংলাদেশী হয়েছি। এই জাতীয়তাকে আমরা গৌরব মনে করি।

জাতীয়তাবাদের একটি অহংকার আছে। সেই অহংকার কিছু আবেগের জন্ম দেয়। সেই আবেগ মহামূল্যবান। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ তার জাতীয়তা রক্ষার জন্য বহু কিছু বিসর্জন দিতে পারে এমনকি জীবনও। জাতীয়তা লাভের অধিকার তাই একটি মানবাধিকার।

যার যা জাতীয়তা, তার অধিকার আছে সেই জাতীয়তা সংরক্ষণের। এই অধিকার হরণ করা যায় না কোন কারণে। তবে কেউ যদি পরিবর্তন করতে চায়, সে অধিকার তার আছে। সে একজন বিশ্ব নাগরিক। তাই এই অধিকার তার মৌলিক।

ইসলাম এসছে মানবতার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করতে তাকে স্বদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার শৃংঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে। বস্তুত বর্ণ, বংশ, দেশ ও গোত্রভিত্তিক জাতয়ীতা অত্যন্ত নিকৃষ্টতা ও চরম অন্ধতা বই কিছু নয়। পৃথিবীতে এখনও জাতিভেদ একটা বড় সমস্যা। উচুঁ-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, সভ্য-অসভ্য প্রভৃতি জাত্যাভিমান বিদ্যমান। তাই আমরা বলতে পারি, মহানবী (সা.) বাণী, চুক্তি ও ভাষণে সকল বিভেদ,বৈষম্য ও কল্পিত মর্যদার মানদন্ড, বংশগত , দেশগত , ভাষাগত সকল অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করে উপস্থিত জনমন্ডলী ও অনাগত পৃথিবীবাসীর জন্য দীপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেছিলেন-'জাতীয়তার অধিকার'।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্যের পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার

ইসলামে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা , যা বৈষম্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ভাষণে ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষম্যে পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকারকে নিশ্চিত করে ঘোষণা করেন, يايها الناس الا ان ربكم واحد

[২৩৩] আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لجعمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى "হে মানব সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু এক, সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের, কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নেই তাকওয়া ব্যতীত। অর্থাৎ জাতি, ভাষা ও বর্ণভেদ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়, বরং শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মাপকাঠি হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।"[২৩৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতি এক, তবে তাদের মধ্যে পরিচয় নির্দেশ করার জন্য বর্ণ, গোত্র, ও জাতিগত বিভিন্নতা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক, জাতীয়তার এই অধিকার সংরক্ষণের অধিকার সকলেরই রয়েছে। কেউ তা হরণ করতে পারে না।

পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে, তা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই পার্থক্যও নিতান্তই বাহ্যিক, এই পার্থক্য মানুষে মানুষে কোন মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কুর'আনে এই পার্থক্যকে আল্লাহর কুরদত এবং তাঁর অস্তিত্বের বাস্তব নিদর্শন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের গাত্র বর্ণের পার্থক্যেও। বস্তুত এই ব্যাপারে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে বিপুল নিদর্শন রয়েছে[২৩৫]।"

আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত মানুষের বাক-শক্তি একই রূপ, ও জিহ্বার গঠন প্রকৃতিতে কোনই পার্থক্য নেই। মগজের মাত্রা ও গঠনেও নেই কোন পার্থক্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ভাষা এক নয়, বিভিন্ন। একই ভাষাভাষী অঞ্চলের শহর, গ্রাম ও বস্তির বুলিও এক নয়। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ ও বাকরীতি পরস্পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক একত্বে কোন পার্থক্য নেই।

অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টির উপাদান, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেহ ও অঙ্গসৌষ্ঠব এক হওয়া সত্ত্বেও সব মানুষের বর্ণ এতই বিভিন্ন যে, জাতিতে জাতিতে তো দূরের কথা, একই পিতা-মাতার দুই পুত্রের বর্ণও সব দিক দিয়ে একই রকমের নয়। মূলত একই স্রষ্টার সৃষ্টিতে বৈচিত্র বিরাজমান। মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ অন্যান্য জিনিসের যে- কোন প্রজাতির মধ্যে মৌলিক ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য দিক দিয়ে বিরোধ ও পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম এই রুঢ় বাস্তবতাকে অকপটে স্বীকার করেও বলেছে, এই পার্থক্য যত দিক দিয়েই হোক না কেন, তা মৌলিক নয়, একান্তই বাহ্যিক।

"মৌলিক অভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে বাহ্যিক বৈচিত্রকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে মর্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য সৃষ্টি করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। অতএব ভাষা নিয়ে, বর্ণ নিয়ে গৌরব করা, ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন গোত্র বর্ণ ধারকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি করার, এক ভাষাভাষীদের কর্তৃক অন্য ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে, এক বর্ণের লোকদের পক্ষে অন্য বর্ণের লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করা, তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চরম অমানুষিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২৩৬]

---

২৩৪ আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
[২৩৫] আল কুরআন, ৩০ : ২২
২৩৬ মাও.মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর সব মানুষ আদি পিতা এক আদমের বংশধর। সব মানুষের দেহে এক অভিন্ন পিতা-মাতা-আদম ও হাওয়ার রক্ত প্রবহমান। অতএব সব মানুষ অভিন্ন বংশজাত। মানুষের মধ্যে বংশ রক্ত বর্ণ স্থান ও ভাষার দিক দিয়ে যত পার্থক্যই থাক-না কেন তার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে মৌলিক মানবতার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য করা চলবে না। মানুষের এই মৌলিক অভিন্নতাই মানুষে-মানুষে সব বৈসম্যের ও ভেদাভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। মানুষের পরস্পরে যেমন নীচ ও অভিজাতের কোন পার্থক্য থাকতে পারে না, তেমনি থাকতে পারে না ধনী-গরীব বা মালিক শ্রমিকের মধ্যে মান-মর্যাদা বা কৌলিন্যের দিক দিয়ে এক বিন্দু ভেদাভেদ। চলতে পারে না কোনরূপ শ্রেণীগত পার্থক্য বা শ্রেণী-সংগ্রাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।'[২৩৭]

যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনিই মানুষের রব্ব– সার্বভৌম– নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তাই মানুষ ভয় করবে কেবল মাত্র সেই রব্বকেই, আত্মসমর্পণ করবে কেবলমাত্র সেই রব্ব-এর নিকটই। সমস্ত মানুষকে তার বংশগত রক্তগত ভাই মনে করা সব মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে মাও. আব্দুর রহীম বলেন- "এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা, আল্লাহ ছাড়াও অন্য কাউকে ভয় করতে, অন্য কারোর সামনে আত্মসমর্পণ করতে, অন্য কারোর আনুগত্য করতে বাধ্য করা এবং একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁরই অনুমতিক্রমে কেবল তার রাসূলের আনুগত্য করতে না দেয়া মানবাধিকার হরণ করারই শামিল।"[২৩৮]

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলসমূহে ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্যের পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায়– (Universal Diclaration of Human Rights) যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে ভাষা, রেস তথা বর্ণ ভিত্তিতে পার্থক্যের কারণে এতে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। বৈষম্যহীনতা মানুষের অধিকার।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

"জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ জাতীয় বা সামাজিক , সম্পত্তি অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোন রূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।"[২৩৯]

অর্থনৈতিক সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, (International Convention on Economic. Social and Cultural Rights) এর ২নং অনুচ্ছেদে আছে–"বর্তমান চুক্তির পক্ষরাষ্ট্রসমূহ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, জাত, বর্ণ, নারী বা পুরুষ, ভাষা, ধর্ম,

---

২৩৭ আলকুর-আন, ৪ : ১

[২৩৮] মাও.মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২৩৯] আবূল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক বা অন্য মতামত, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎপত্তি (Origin), জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোনরূপ ভেদাভেদ না করে, এই চুক্তিতে বর্ণিত অধিকার– সমূহ ভোগের নিশ্চয়তা দান করবে।"[২৪০]

আবার পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক চুক্তি (International Convention on Civil and Political Rights) -এর দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে-

অনুচ্ছেদ: ২/(১)"বর্তমান চুক্তির প্রতিটি পক্ষরাষ্ট্র এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, উহা এই চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারসমূহকে সম্মান করবে এবং জাত, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অথবা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় অথবা-সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে, উহার রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এবং উহার এখতিয়ারাধীন সকল ব্যক্তির জন্য উক্ত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে।"[২৪১]

জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ

জাতিগত বৈষম্য পৃথিবীতে নতুন নয়। এ বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টাও কম হয়নি। ১৯৬৩ সালের 'জাতিসংঘের সর্ব প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ ঘোষণা' এবং ১৯৬৫ সালের 'আন্তর্জাতিক সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কনভেনশন' এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈষম্য (Discrimination) বলতে সহজ কথায় বোঝায় কোন ব্যক্তিকে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিতকরণ।[২৪২] আর জাতিগত বৈষম্য (Recical Discrimination) কী তা বলা হয়েছে ১৯৬৫ সালের (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination এর ১ (১) নং অনুচ্ছেদে "জাত, বর্ণ, বংশ এবং দেশ বা জাতিগত বা কৃষ্টিগত উদ্ভবের ভিত্তিতে যে সকল স্বতন্ত্র (distinction), বা বহিষ্কার (exclusion),বাধানিষেধ অথবা অগ্রাধিকার, যার উদ্দেশ্য বা ফলাফল হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা গণজীবনের (public life) অন্য যে কোন ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ বা প্রয়োগ নাকচ বা খর্ব করা।"[২৪৩]

আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, জাতিগত বৈষম্য মানবতা-বিরোধী একটি প্রবঞ্চনা। একে দূর করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা বলতে পারি । যেমন:-

১. ইসলাম (Islam) : ইসলাম এখন থেকে প্রায় ১৫শত বছর পূর্বে জাতিগত বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মানব আমি তোমাদের এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো।"[২৪৪] এখানে দেখানো হয়েছে, মানুষ বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বর্ণে বিভক্ত

---

[২৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫
[২৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
[২৪২] M.Zamir, Human Rights Issuse and International Law, UPL, Dhaka, p.66.
[২৪৩] আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৯
[২৪৪] . আল-কুর'আন, ৪৯ :১৩

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও তাদের উৎস একই পুরুষ-নারী। কাজেই তারা আলাদা কেউ নয়, একে অপরের আত্মীয়। তাতেই মানুষেরা যেন সকলে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে থাকে, একে অন্যের উপর বৈষম্য বা অসমীচীন প্রাধান্য বিস্তার না করে, অন্যকে অধিকার বঞ্চিত না করে। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে বা যে কোন স্থানে নামায পড়ার সময় সকল মুসলমান কাতারবন্দী হয়; কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকে না ছোট-বড় বা আমীর-ফকিরের মধ্যে। বংশগত বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এটি একটি মহৎ প্রচেষ্টা।

২. জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) : জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনার ২য় প্যারার মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনগণ এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে, তারা সকল নারী-পুরুষের মৌলিক মানবাধিকার মর্যাদা, মূল্য এবং সমান অধিকারের প্রতি পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে।

সনদের ১৩ (১)খ, অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদ জাতি, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধ্যয়ন ও সুপারিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া জাতিসংঘ পৃথিবীময় স্থিরতা ও মঙ্গলজনক অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতি, নারী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন করবে। সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ এরূপ উন্নয়ন সাধন করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে সনদের ৫৬ নং অনুচ্ছেদে। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক Trustesehip System এর অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো জাতি, নারী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবর্দ্ধন, একথা বিদ্ধৃত হয়েছে জাতিসংঘ সনদের ৭৬ নং অনুচ্ছেদে।

৩. সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR) : মানবাধিকার ঘোষণার তিনটি অনুচ্ছেদে (১,২ও ৭) বৈষম্য বিরোধী বিধান রয়েছে। ১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল মানুষ স্বাধীন প্রানীরূপে এবং সমর্যদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহন করেছে।"[২৪৫] UDHR এ বর্ণিত অধিকারগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয় ও সামাজিক মৌলিকত্ব নির্বিশেষে সবার জন্য তৈরী হয়েছে এবং একটি মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন , হোক তা যে কোন রাষ্ট্র কিংবা ভূখন্ড স্বাধীন, অছিভূক্ত অপর রাষ্ট্র কর্তৃক শাসিত বা সীমিত সার্বভৌমত্বধারী- এরূপ বাসস্থানগত, রাজনীতিগত বা এখতিয়ারগত কারণে মানুষটির প্রতি কোনরূপ বৈষম্য দেখানো হবে না-অনু: ২। UDHR এর ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং UDHR পরিপন্থী কোন বৈষম্য করার প্রয়াস করা হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত protection পাবার ক্ষেত্রেও সমান।

৪. নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি, ১৯৬৬ (ICCPR, 1966) : অত্র চুক্তির ২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তির পক্ষ-রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ দেশে কোন রকম বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুক্তিবর্ণিত অধিকারগুলো উপভোগের নিশ্চয়তা দেবে। অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী আদালত এবং ট্রাইবন্যুলের চোখে সকলে সমান এবং সকলেই একটি উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে (Fair and public hearing)এর সুযোগ পাবে। আবার অনুচ্ছেদ ২৬ নিশ্চিত করেছে, সকলেই কোন রকম বৈষম্য ছাড়া equal protection of law পাবে। অনুচ্ছেদ ২৬ এ বলা হয়েছে, " সকল ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই ক্ষেত্রে জাত, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা,ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনরূপ মত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি,

---

[২৪৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হবে এবং অনুরূপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন সকল ব্যক্তিকে সমান ও কার্যকারী সংরক্ষনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।"[২৪৬]

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি (ICESCR) : অত্র চুক্তির ২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তির পক্ষ-রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ দেশে কোন রকম বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুক্তিবর্ণিত অধিকারগুলো উপভোগের নিশ্চয়তা দেবে।

৬. সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ ঘোষণা (UN Declaration on the Elemination of All Forms of Racial Discrimination of 20 November. 1963) ঃ এই ঘোষণাটি (UNDEAFORD) জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত হবার পূর্বের একটা ইতিহাস আছে। সাধারণ পরিষদে মিশরের প্রতিনিধি ১৯৪৬ সালের ২রা নভেম্বর একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রটি পরিষদ তার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বিবেচনা করেন। পত্রটির প্রতিপাদ্য ছিল 'ধর্মীয় এবং তথাকথিত জাতিগত নির্যাতন ও বৈষম্য (Religious and so called racial persecution and discrimination) মূলতঃ এই পত্রটি ছিল উক্ত বিষয়ের একটি খসড়া সিদ্ধান্ত (draft resolution)।[২৪৭] উক্ত খসড়া সিদ্ধান্তে মিশরের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, মধ্য ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে- যার মধ্যে কিছু ছিল জাতিসংঘের সদস্য এবং কিছু অসদস্য-সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে যে, এসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হলেও এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের বিধান নিশ্চিত থাকলেও যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু তারা নির্যাতন এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এতে করে একদিকে ক্ষুণ্ন হচ্ছে মানবাধিকার মূল বাণী, অন্যদিকে বিঘ্নিত হচ্ছে জাতিসংঘের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এসব নির্যাতন ও বৈষম্য দূর করার জন্য সাধারণ পরিষদ সংশ্লিষ্ট সরকার ও কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানায়। সাধারণ পরিষদের 'জেনারেল কমিটি' উক্ত পত্র প্রাপ্তির তিনদিন পর (৬ই নভেম্বর ১৯৪৬) তার ২৫ তম বৈঠকে প্রস্তাবনাটি উত্থাপন করলে কিছু সদস্য 'মধ্য ইউরোপে' কথাটি নিয়ে অভিযোগ তুলেন। তাঁদের কথা হলো, শুধু মধ্য ইউরোপে নয় গোটা পৃথিবীতেই এসব নির্যাতন ও বৈষম্য ঘটছে। ফলতঃ মিশরের প্রতিনিধি 'মধ্য ইউরোপ' কথাটি প্রত্যাহর করে তাদের কথা মেনে নেন। অতঃপর সাধারণ পরিষদের ৪৮তম পালন্যারী মিটিং এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, যাতে বলা হয়,"সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করছে যে, মানবিকতার বৃহত্তর স্বার্থে ধর্মীয় ও তথাকথিত জাতিগত নির্যাতন ও বৈষম্যের অবসান হওয়া উচিত এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে পরিষদ আহ্বান করছে জাতিসংঘ সনদের আক্ষরিক অন্তর্নিহিত গুণকে সমুন্নত রাখতে এবং এ বিষয়ে দ্রুত ও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে[২৪৮]।"

অতঃপর ১৯৬২ সালে নতুন নতুন রাষ্ট্র যোগ দেয়ার ফলে জাতিসংঘের সদস্য-সংখ্যা যখন অনেক বেড়ে যায় তখন সাধারণ পরিষদ সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের একটি 'ঘোষণা' ও একটি 'কনভেনশন' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে প্রণীত ও গৃহিত হয় The United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

---

[২৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬-৩৬৭

[২৪৭] M.Zamir, *Human Rights Issuse and International Law*, UPL, Dhaka, p.67.

[২৪৮] রেবা মন্ডল ও শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

(২০শে নভেম্বর ১৯৬৩)[২৪৯] এবং The International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination (২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৫)। এই আন্তর্জাতিক কনভেনশন কার্যকর হয় ৪ জানুয়ারী ১৯৬৯।

জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ ঘোষণার ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতি, বর্ণ বা কৃষ্টিগত উৎসের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য করা হলে তা' হবে ঃ "মানব মর্যাদার বিরুদ্ধে কৃত একটি অপরাধ,UN Charter এর নীতিসমূহের অস্বীকৃতি হিসবে নিন্দনীয়,UDHR-এর বর্ণিত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের লংঘন,বিশ্বের জাতিসমূহের বন্ধুসুলভ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পথে বাধা এবং জনগোষ্ঠিসমূহের মধ্যকার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী একটি উপাদান[২৫০]।"

আলোচ্য ঘোষণার ২ অনুচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। তাহলো কোন রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে আচরণের ক্ষেত্রে অপর কোন রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সাথে জাতি, বর্ণ বা জাতীয় মৌলিকত্বের ভিত্তিতে কোন রকম বৈষম্য করবে না। ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী জাতিসংঘ নিজে, বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ, রাষ্ট্রসমূহ আইনগত ও অন্যান্য ব্যাবহারিক পদক্ষেপ থাকবে এবং এ বিষযে তারা অধ্যয়ন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন বৈষম্যহীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অনুচ্ছেদ : ১৪ "নারী-পুরুষ, জাত বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন প্রকারমত, জাতীয় অথবা সামাজিক উদ্ভব জাতীয় সংখ্যা লঘু অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোনরূপ ভেদাভেদ না করে এই কনভেনশনের বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের উপভোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করতে হবে[২৫১]।"

বৈষম্য শব্দের অর্থ আচরনের অসমতা। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ, অণ্য কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ নহে[২৫২] ।**গোষ্ঠী** ঃ গোষ্ঠী বলতে সেই মানবগুলীকে বোঝায় যারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারী সূত্রে একটি বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি বহন করেন। পণ্ডিতগণের মতে চুলের রং, গাত্রবর্ণ, মাথার আকৃতি, শরীরের গঠন এবং মুখাবয়ব প্রভৃতি দ্বারা গোত্র নির্ণীত হয়।

বর্ণ : বর্ণ শব্দটি এখানে সাধারণভাবে আমরা যাকে জাতি বলি, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুসমাজে পূর্বে চতুবর্ণ বিভাগ বিদ্যমান ছিল, যথা- ব্রাহ্মণ ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। বর্ণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে,ইহা যুগ যুগ ধরে একই অপরিবর্তিত রূপ বহন করে। বর্ণভেদের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

---

[২৪৯] GA Resolution 1904 (XVIII)
[২৫০] রেবা মন্ডল ও শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ .৬১
[২৫১] আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩০
[২৫২] (১৯৫২) ৫৪ বোম্বাই এল.আর ৬২৬, সি. ডব্লিউ, এন ৮০১, ৫৫ বোম্বাই এল.আর. ৩২৩। উদ্ধৃতি, গাজী শামছুর রহমান মানবাধিকার ভাষ্য, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীগত (Race) পার্থক্য বা বৈষম্য :

ইংরেজি শব্দ Race-এর অর্থ নরগোষ্ঠী বা নরবংশ বা গোত্র। race দ্বারা জাতি বুঝানো হয় না কারণ ইংরেজি nation শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে জাতি। জাতি গঠনের যে সব উপাদান কাজ করে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে race যেমন বাঙ্গালি বা বাংলাদেশী হচ্ছে একটি জাতি আর মঙ্গোলিয়া এবং অস্ট্রেলীয় হচ্ছে এক একটি নরগোষ্ঠী। এই নরগোষ্ঠী বা race হচ্ছে মানবজাতির এমন একটি উপরিভাগ যার সদস্যদের মধ্যে উত্তরাধিকাসূত্রে প্রাপ্ত কতগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। মানুষ মূলত একই উৎস থেকে সৃষ্টি হলেও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব, আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উপাদনের প্রভাব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যৌন সম্পর্ক, জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর বেশ কিছু নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ত্ব বিদ্যমান। যথা– শ্বেতকায়, মঙ্গোলীয়, কৃষ্ণকায় এবং অষ্ট্রেলীয় ইত্যাদি। এই সব নরগোষ্ঠীর মধ্যে মাথার আকৃতি, মুখাকৃতি, নাক, চোখ, ঠোঁট, কান, গায়ের রং, চুল, লোমকূপ, উচ্চতা, দৈহিক গড়ন ইত্যাদিতে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

গোষ্ঠীগত বৈষম্য মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে উগ্র জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকে জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইউরোপে এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের অভিযান। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলন ইউরোপীয় জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দমন করে। সমগ্র ইউরোপকে কয়েকটি বৃহৎশক্তির পদতলে নিক্ষেপ করে। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ইউরোপীয় জনগণকে সংগ্রাম করতে হয় ভিয়েনা সম্মেলনের ধারাগুলোকে বাতিল করার জন্য। এর ফলে বেলজিয়াম হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নরওয়ে বিচ্ছিন্ন হয় সুইডেন থেকে। অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয় গ্রিস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া। অস্ট্রিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ইতালি ইউরোপের মানচিত্রে আবির্ভূত হয় একটি স্বাধীন দেশরূপে।

"উগ্র জাতীয়তাবাদ জার্মানিতে বিশ্ব রাজনীতির ধারণা বিস্তার করে। এর অবশ্যাম্ভাবী ফলরূপে জার্মানি একটি সমরবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মানি একত্রীকরণের মধ্যে দিয়ে জার্মান জাতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন হয়ে উঠে। গোষ্ঠীতগত বৈষম্য এবং বিশ্বে আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় সে বেপরোয়া হয়ে উঠে। গোষ্ঠীগত বৈষম্য এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় জার্মানি নিজেকে অতৃপ্ত রাষ্ট্ররূপে প্রকাশ করে এবং প্রবল বাসনা তৃপ্তির জন্য যুদ্ধকে মহান কাজ বলে বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমরনায়ক, রাষ্ট্রনায়করা ঐকমত্যের অধিকারী ছিলেন[২৫৩]।"

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে সকল অধিকার ও স্বাধীতার কথা বলা হয়েছে রেস তথা গোষ্ঠী বা গোত্রগত পার্থক্যের কারণে এত বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। বৈষম্যহীনতা মানুষের অধিকার।

"প্রাক ইসলামি যুগের আরবেও রেসের বা গোত্রের কারণে মানুষের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সা.) গোত্র ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করেন। গোত্রীয় বৈষম্য ইসলামে অস্বীকৃত

[২৫৩] গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ইসলামপূর্ব আরবে যে গোত্রীয় বৈষম্য ছিল ইসলামী বিধান তাকে প্রত্যাখ্যান করে সকল মানুষকে একই আদমের সন্তান হিসেবে সমমর্যাদার বলে ঘোষণা করে।"[২৫৪]

বর্ণ (colour) বৈষম্য :

বর্ণ ইংরেজি colour শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। বর্ণ race বা নরগোষ্ঠী গঠনের অন্যতম উপাদান। কোন নরগোষ্ঠীর অনেকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে তাদের রং[২৫৫]। যেমন, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী প্রধানত বাদামি বর্ণের। বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে এর নাম বর্ণবৈষম্যবাদ।

বর্ণবৈষম্যবাদ বলতে একটি ধারণাকে বুঝায় যেখানে মনে করা হয় যে, মানুষের যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, মেধা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মূলে দৈহিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যই মূলত একই কারণে সাংস্কৃতিক দিক থেকে কেউ কারো তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী। এই ধারণাই বর্ণ বৈষম্যবাদের প্রেরণা।

উনবিংশ শতাব্দীতে মানবেতিহাসের বর্ণবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এতে বলা হয় যে, ককেশীয় নগরোষ্ঠীই উচ্চ ও উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী। অন্য সকলেই নিকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর। বর্ণবাদীরা বলেন, সভ্যতার বিকাশে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর অবদানই বেশি। কারণ তারা দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে উন্নত। নিকৃষ্টরা দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে অনুন্নত তেমনি সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদানও কম।

কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণবৈষম্যবাদ যুক্তির মানদণ্ডে টেকে না। কারণ শুধু বর্ণের পার্থক্যের কারণে কোন মানুষ উচু বা নীচু, মেধাসম্পন্ন বা মেধাহীন এমন হতে পারে না। অথাপি আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, রোডেশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষ্ণকায়দের উপর বর্ণবাদী নির্যাতন চলছে সুপরিকল্পিতভাবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে[২৫৬]।

বর্ণভেদ শুধু সাদাকালো বৈষম্যই নয়। ভারতবর্ষের সমাজে এক ধরনের বর্ণ বৈষম্য চালু আছে, এটা রং এর পার্থক্য নয় বরং জন্ম বা বংশের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে চতুবর্ণ ভেদ বিদ্যমান ছিল। কিছুটা আজও আছে। যেমন– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের ছেলে সর্বদা ব্রাহ্মণ হবে, অন্যদিকে শূদ্রের ঘরে চিরকাল শূদ্রই জন্ম নেবে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে দিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। আজো ভারতে নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তাদের সামাজিকভাবে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখা হয় এরা যেন সমাজের উচ্ছিষ্ট বা গর্হিত কিছু। সকল বর্ণের মানুষের একত্রে বসে খাওয়াই শুধু অবৈধ নয় নিম্ন বর্ণের কেউ কিছু স্পর্শ করলে সেটা অপবিত্র, অশূচি, অশুদ্ধ হয়ে যায়। এমনিভাবে আমাদের এই উপমহাদেশে বর্ণবৈষম্যের মাধ্যমে মানুষকে নিপীড়ন করা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে।

মুসলমানদের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে বর্ণবৈষম্যের কোন স্থান নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। সকলে একই মানব পিতা– আদমের সন্তান। সেই সুবাদে সকলে ভাই ভাই।

---

[২৫৪] প্রাগুক্ত।
[২৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
[২৫৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণবৈষম্যের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে বর্ণবাদ, 'এ্যাপারথেড' বা 'পৃথকীকরণ' নামে সরকারিভাবে গৃহীত। এই নীতির ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাফেরা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছে[২৫৭]। দক্ষিণ আফ্রিকার মোট জনগোষ্ঠীর এক পঞ্চমাংশেরও কম শ্বেতাঙ্গ। তা সত্ত্বেও এ্যাপারথেড নীতির বলে শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখছে।

১৯৪৮ সালে আইন করে বলা হলো আফ্রিকানদের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং থাকবেই। আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো কৃষ্ণাঙ্গরা কোথায় থাকবে, কোথায় কাজকর্ম করবে, কোথায় লেখাপড়া ও চলাফেরা করবে। শ্বেতাঙ্গদের জন্য তাদের কর্মস্থল এবং আবাসভূমি বেশি উন্নত। শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বিবাহ, প্রেম, যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কখনো তেমন বিবাহ, প্রেম বা বন্ধুত্ব হলে তা জোরপূর্বক ভেঙে দেয়া হয়। উভয় বর্ণের লোকদের বসার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্কে পৃথক আসনের ব্যবস্থা, যাতায়াতের জন্য পৃথক পরিবহণ, রেলের পৃথক টিকেট কাউন্টার, ইত্যাদি দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল বর্ণের মানুষের জন্য এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ৩০শে মার্চ এ.এন.সি নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় এবং ১৫ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়[২৫৮]। এখন মৌলিক বিভাজন 'গ্রাণ্ড এ্যাপর্থেড' আজো বলবৎ আছে। জাতিসংঘ মানবাধিকারে সর্বজনীন ঘোষণার বর্ণবাদবিরোধী বাণী দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

বর্ণবৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থায়ও একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে আছে। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী শুধু কালো বর্ণের কারণে অন্য সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে দেশে সর্বত্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত।

বর্ণের ভিন্নতার কারণে বৈষম্যের শিকার না হওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। মানুষ সে যে বর্ণেরই হোকনা কেন, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত প্রতিটি অধিকার ও স্বাধীনতায় তার সমান হক রয়েছে, এটা তার অধিকার। কোন অজুহাতেই এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ভাষাভিত্তিক (language) বৈষম্যঃ

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। মানুষ মননশীল। সে ভাবে এবং তার ভাবনাকে অন্যের কাছে জানাতে চায়। মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশের জন্যই মানুষ যে আওয়াজের সৃষ্টি করে, তাই ভাষা। এ ধ্বনি এক এক জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে এক একটা বিশেষ বৈশেষ্ট্যে বিশিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও সব মানুষ একই বাক প্রত্যঙ্গের। যদিও সব মানুষ একই বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনির সৃষ্টি করে তবুও এক এক গোষ্ঠীর ভাষা শৃঙ্খলা ও ভাষা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়। দেশ, কাল ও পরিবেশ ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সে সব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক

[২৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬
[২৫৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। বর্তমান পৃথিবীতে আড়াই হাজারেরও উপর ভাষা আছে।

ভাষার এই যে পার্থক্য এর জন্য মানুষের অধিকারে কোন পার্থক্য হতে পারে না। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, ভাষার পার্থক্যের কারণে এর মধ্যে কোন অসমতা করা যাবে না। যে ভাষাভাষী মানুষই হোক না কেন প্রত্যেকেরই এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে সকল ভাষা সমভাবে সমৃদ্ধ নয়, আবার সকল ভাষা সকল সময় সকল স্থানে সমভাবে সমৃদ্ধ থাকবে না, থাকে না। তাই ভাষার সমৃদ্ধির অজুহাতে অন্য ভাষাভাষীকে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মানবাধিকারের অনুচ্ছেদে ভাষাভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টি থেকে বারণ করা হয়েছে।

বৈষম্যহীনতা বলতে, অধিকার বণ্টনের ও সীমায়নের ব্যাপারে একজনের সঙ্গে একরকম আর একজনের সঙ্গে অন্যরকম না করাকে বোঝায়। অধিকার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, তা সে আইনের দ্বারাই হোক আর নির্বাহী নির্দেশের দ্বারাই হোক, মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ।

ধর্মের কারণে পৃথিবীতে বৈষম্যের শিকার, বিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসেও, অনিঃশেষিত। ইসরাঈল, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, সেইসব দেশে রাষ্ট্রধর্ম বহির্ভূত ব্যক্তিদের উপর বৈষম্য প্রদর্শন অস্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের কারণে এক সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ লাঞ্ছিত হওয়ার উদাহরণও বিরল নয়। গোষ্ঠী ও বর্ণের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা রক্তাক্ত। লিঙ্গভেদের বৈষম্য প্রশমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এই বৈষম্য আজো জগৎজোড়া। এইসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সোচ্চার এবং উচ্চকণ্ঠ।

বৈষম্য এবং পার্থক্য এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য এসেছে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিপ্রদত্ত সে পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়। (equal but not identical) শিশু এবং যুবক অধিকারে সমান কিন্তু শক্তিতে ভিন্ন। বার্ট্রান্ড রাসেল এবং গোবিন্দচন্দ্র দেব দার্শনিক কিন্তু তাদের স্তরভেদ আছে। এই স্তরভেদের স্বীকৃতি বৈষম্য নয়।

মানুষ মানুষই। স্বাধীন দেশের মানুষের সাথে পরাধীন দেশের মানুষের কোন তফাৎ নেই। কোন স্থানে মানুষ জন্মাবে তার উপরে মানুষের হাত নেই। বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশে, হংকং-এর মতো বৃটিশ উপনিবেশে কিংবা ইসরাঈল অধিকৃত গাজায় যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা নিজের ইচ্ছায় ঐ সব দেশে জন্মায় নি। ঐ সব স্থানে জন্মগ্রহণের জন্য তাদের কোন বৈষম্যের শিকার হওয়া উচিত নয়। ঐসব স্থানে জন্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ার মতো কোন অপরাধ হওয়া উচিত নয়। ঐসব স্থানে জন্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ার মতো কোন অপরাধ তারা করেনি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন তাই কোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য স্রষ্টার মর্যাদার প্রতি অবমাননা করা।

পরাধীন দেশে যাদের জন্ম, পরাধীনতার কারণেই সেখানকার মানুষ মানবাধিকার ভোগ করতে পারে না। মানবাধিকারের এই ঘোষণা পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষের এই কলংককে ধিক্কার দেয়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে যে বৈষম্যহীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে তা বিশ্বের প্রায় সকল দেশের লিখিত সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বৈষম্যহীনতা যেমন একটি

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার তেমনি সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারও বটে। এ প্রসংঙ্গে গাজী শামছুর রহমান বলেন-

"মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা যেহেতু বিশ্বের প্রায় সকল দেশ অনুমোদন করেছে তাই দাবি করা যায় এই ঘোষণাগুলি আন্তর্জাতিক আইনের সুত্ররূপ আবশ্যিকভাবে গৃহীত ও প্রতিপালিত হবে। তবুও মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থেকেই যায়। মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়, কিন্তু মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার যেগুলো দেশের মৌলিক অধিকারের সদৃশ যা তুল্য নয়, সেগুলো ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় দুর্লভ[২৫৯] ।"

ইসলাম ও বৈষম্যহীনতা

ইসলাম একটি সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন ধর্ম প্রচার শুররু করেন তখন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে চরম বৈষম্য প্রদর্শন করা হতো।

অবস্থান, জন্মস্থান, বংশগত বৈষম্য ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, জেনে রাখ, সমস্ত মুসলমান পরস্পরের ভাই এবং দুনিয়ার সমুদয় মুসলিম এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। বাসভূমি ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য বিলুপ্ত হল। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলিন, যে স্বীয় কাজের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

ইসলামের নবী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। তিনি আভিজাত্যের গৌরব ও বংশমর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেন, মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন এবং শুধু মানবতার ভিত্তিতে সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। খুনখারাবি, মদ্যপান, শিশুকন্যা হত্যা ও নারীর অপমানকর সকল প্রকার কাজকে তিনি দৃঢ়হস্তে বন্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানবের সর্বাধিক কল্যাণকারী।"

বস্তুত, ইসলামে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা, যা বৈষম্যের সম্পূর্ন বিপরীত।

কুর'আন শরীফ এবং রাসূল (সা.) এর বাণীর ভিত্তিতে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তার অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল মানুষ আইনের চোখে সমান মর্যাদা লাভ করেন। সামাজিক জীবনেও তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের কোন মাপকাঠি নেই, একমাত্র তাকওয়া ছাড়া। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে এক সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ঈমান ও সর্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই[২৬০] ।"রাসূলে

[২৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
[২৬০] আল- ৪৯ : ১০

Dhaka University Institutional Repository

করিম (সা.) শুধু মুসলিমদরই নয়, দুনিয়ার সকল মানুষকে পরস্পরের ভাই বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই[২৬১] ।”

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে ধনী-গরীব, শাসক-শাসিত, আমির-ফকির, মনিব-গোলাম,সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের বেলায় ইনসাফের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এইজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তরা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যার মুঠোয় আমার জীবন! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত তবে আমি তাঁরও হাত কাটতাম।” এ থেকেই বুঝা যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম কতটুকু সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে, প্রয়াস পেয়েছে বৈষম্য দূরিকরণের। ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা ‘(কায়রো ঘেষণা ১৯৯০) এর অনুচ্ছেদ ২১(ঘ) এ বলা হয়েছে- ‘জাতীয়তাবাদ বা এমন কোন মতবাদ (doctrin) যা পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ায় বা বর্ণগত ও গোত্রীয় বিভেদ সৃষ্টি করে-এমন কোন বাদ বা ধারণা ইসলাম অনুমোদিত নয়।’

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চুক্তিসমূহে জলাধার, সামুদ্র ও মহীসোপান আইনে মানবাধিকার লাভ প্রসঙ্গ

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহের মধ্যে পানি অন্যতম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলাধার তথা পানির উৎসসমূহ যেমন নদী,সমুদ্র এবং মহীসোপান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল, উন্মুক্ত সমুদ্র, উন্মুক্ত সমুদ্রে মৎস শিকার ও প্রাণী-সম্পদ সংরক্ষণ জনপদের জল ও স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং পথিমধ্যে ভ্রমণরত সকল মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সকল অধিকার তাঁর চুক্তিসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল সমূহে স্থান পেয়েছে । যেমন আইলার চুক্তিপত্রে রাসুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেন।

“পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে । এ নিরাপত্তাপত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মদ এর পক্ষ হতে ইউহান্না ইবন রু‘বাহ এবং আইলা-এর জনগণের জল,স্থল, জাহাজ, ও পথিমধ্যে অবস্থানরত সবার জন্য সম্পাদিত। তাদের সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ এর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। সিরিয়া, ইয়ামান ও সাগরে অবস্থানরত জনগণের মধ্যে পথ আক্রমণকারী হিসেবে যারা তাদের সাথে অবস্থান করবে তাদের জন্যও এই নিরাপত্তা বিবেচিত। যে কেউ এই চুক্তি নামার বরখেলাপ করবে, তার জন্য কোন নিরাপত্তা থাকবে না। যে জলাধারের পাদদেশে তারা অবস্থান করবে সে জলাধারের পানি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে না। এবং জল ও স্থলের কোন পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা হবে না”।[২৬২] বাহরাইনের এক গোত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে

---

[২৬১] *বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাবু লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল মুসলিমা, হাদীস নং ২২৬২

২৬২ সীরাতে ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৫২৫-৫২৬; জামহারাতুল রাসাইলিল-‘আরাব, খ.১, পৃ. ৫১; মাজমু‘আতুল-ওয়াছাইক্ব,পৃ. ৮৯, ত্বাবাক্বাত, খ. ১, পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

জলাধারের অধিকার লাভে কথা বিধৃত হয়েছে এভাবে "বৃষ্টি থেকে পানি ব্যাবহারের তাদের পূর্ণ আধিকার থাকবে"[২৬৩]।

জলাধার, সমুদ্র ও মহীসোপান সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের দলিলসমূহ

আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল, উন্মুক্ত সমুদ্র, মহীসোপান, উন্মুক্ত সমুদ্রে মৎস শিকার ও প্রাণী-সম্পদ সংরক্ষণ স্পর্কিত দলিলসমূহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

"উন্মুক্ত সমুদ্রে মৎস শিকার ও প্রাণী-সম্পদ সংরক্ষণ" বিষয়ক কন-ভেনশনটি ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ বলবৎ হয় এবং ১৯৭১ সাল নাগাদ প্রায় ৩০টি রাষ্ট্র কনভেনশনের পক্ষ হয়।[২৬৪]

১৯৫৮ সালের জেনেভা কনভেনশনসমূহের আঞ্চলিক সমুদ্র ও সংলগ্ন অঞ্চল (The Territorial Sea and Contiguous Zone) এ বলা হয়েছে । অনুচ্ছেদঃ ১ (১) সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তার স্থলভাগ (Land Territory) ও আভ্যন্তরীণ জলরাশির (Internal Waters) বাহিরে ' আঞ্চলিক সমুদ্র' বলে অভিহিত এবং সমুদ্র-বেষ্টনী (Belt of sea) পযর্ন্ত বিস্তৃত। অনুচ্ছেদঃ ২- 'সমুদ্র-উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক সমুদ্রেরউপরস্থ বায়ুমণ্ডল (air spase) এবং আঞ্চলিক সমুদ্রের তলদেশ (Sea-bed) ও অন্তভূমির (subsoil) উপরও প্রসারিত।

অনুচ্ছেদ : ৫(১) আঞ্চলিক সমুদ্রের ভিত্তিরেখা ও স্থলভাগের মধ্যবর্তী জলরাশি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলরাশির (Internal Waters) অংশভূক্ত। ১৯৫৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী জেনেভা সম্মেলনে উন্মুক্ত সমুদ্র (The High Sea) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলে অনুচ্ছেদ : 'উন্মুক্ত সমুদ্র' বলতে কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অথবা আভ্যন্তরীণ জলরাশির অন্তর্ভূক্ত নয় , সমুদ্রের সকল অংশকে বুঝায়। অনুচ্ছেদ : ২ ' যেহেতু উন্মুক্ত সমুদ্র সকল রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত সেহেতু কোন রাষ্ট্র সমুদ্রের কোন অংশকে আইনত:(validly) নিজ সার্বভৌমত্বের অধিনে আনতে পারে না। এই অনুচ্ছেদসমুহ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যন্য নিয়ম-কানুণ অনুসারে আরোপিত শর্তাবলীর অধিনে উন্মুক্ত সমুদ্রে স্বাধীনতা (freedom of the high seas) ভোগ করা যাবে। উপকূলীয় এবং অনুপকূলীয় (non -coastal) উভয় প্রকার রাষ্ট্রে উন্মুক্ত সমুদ্রে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত স্বাধীনতাগুলো ভোগ করবে :

(১) নৌচালনের স্বাধীনতা (freedom of navigation) ;

(২) মৎস শিকারের স্বাধীনতা (Freedom of fishing);

(৩) অন্তঃসাগরীয় যোগাযোগ তার ও পাইপ-লাইন স্থাপনের স্বাধীনতা(freedom to lay submarine cable and pipeline)

(৪) উন্মুক্ত সমুদ্রের উপর দিয়া বিদ্যমান চলাচলের স্বাধীনতা(freedom to fly over the high seas)।

এই স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নীতিসমূহ অনুসারে স্বীকৃত অন্যন্য স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে , সকল রাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগের প্রতি যুক্তিসঙ্গত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

---

[২৬৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দ খ. ৩, পৃ. ২১, মাকতুবাতে নববী, সাইয়েদ রিযভী, পৃ. ১৮৮-১৮৯

[২৬৪] Brownlie – *Basic Documents in International Law* (London : Oxford University Press, 1972), p.78

Dhaka University Institutional Repository

মহীসোপান (Continental Shelf) এর অনুচ্ছেদ : ১ এ বলা হয়েছে– “(ক) উপকূল সংলগ্ন কিন্তু আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকার বাহিরে, ২০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতাবিশিষ্ট সামুদ্রিক এলাকার তলদেশে (seabed) এবং অন্তর্ভূমি (sub-soil) অথবা ২০০ মিটারের অধিক গভীরতাবিশিষ্ট সামুদ্রিক এলাকার তলদেশ ও অন্তর্ভূমি যেখানে উপরস্থ জলরাশির এই গভীরতা সত্ত্বেও প্রাকৃতিকসম্পদের সদ্ব্যবহার (exploitation) সম্ভবপর; (খ) দ্বীপের উপকূল সংলগ্ন অনুরূপ সামুদ্রিক এলাকার তলদেশ ও অন্তর্ভূমি।

অনুচ্ছেদঃ ২(১) উপকূলীয় রাষ্ট্র মহীসোপানে পরিচালনা(explore) এবং প্রাকৃতিকসম্পদ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মহীসোপানের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করবে। (২) উপকূলীয় রাষ্ট্র যদি মহীসোপানে অনুসন্ধান পরিচালনা অথবা এর প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহার নাও করে, তথাপি অন্য কোন রাষ্ট্র উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত অনুরূপ কাজে হাত দিতে (undertake) পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিসমূহে আন্তঃযোগাযোগ ও স্থানান্তর গমনের অধিকার প্রসঙ্গ

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাহিরে যে কোন অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা রয়েছে। অনুরূপভাবে বাসস্থান ত্যাগ ও স্থানান্তর গমননের স্বাধীনতা ও আল্লাহ তার বান্দাদের দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- “ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا “ আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে পারতে”।[২৬৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বানী ও চুক্তিতে সমুদ্রবন্দ্রর, স্থলবন্দর এবং পথিমধ্যে ভ্রমণরত সকল মানুষের আন্তঃযোগাযোগ ও মাইগ্রেশন বা স্থানান্তর গমনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে । আইলার শাসন কর্তা ইউহান্না ইবনে রু‘বা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে- لسفنهم و لسياراتهم، ولبحر هم ولبرهم، ذمة الله و ذمة

محمد النبي و لمن كسان معهم من كل مار من الناس ولا طريقا يردنها من بر أو بحر

‘জল, স্থল, জাহাজ, ও পথিমধ্যে অবস্থানরত জনগণের জন্য সম্পাদিত। তাদের সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ এর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। জল ও স্থলের কোন পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা হবে না।”[২৬৬] স্থানান্তর একটি মানবাধিকার। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন “ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً “যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করতে পারবে।”[২৬৭]

---

[২৬৫] আল-কুরআন, ৪ : ৯৭

২৬৬ সীরাত ইবন হিশাম, খ.২, পৃ. ৫২৫-৫২৬; জামহারাতুল রাসাইলিল-‘আরাব, খ.১, পৃ. ৫১; মাজমু‘আতুল-ওয়াছাইক্ব,পৃ. ৮৯, ত্বাবাক্বাত, খ.১-২, পৃ.৩৭

[২৬৭] আল-কুরআন, ৪:১০০

Dhaka University Institutional Repository

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ : ১২ এতে বলা হয়েছে (১)" কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে আইনসম্মতভাবে অবস্থানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সেই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাফেরা করা এবং বসবাসের স্থান নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকবে।(২) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশসহ যে-কোন দেশ ত্যাগ করার স্বাধীনতা থাকবে।(৪) কোন ব্যক্তিকে তাঁর নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার হতে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর একটি যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণের সময় সিপাহসালাহ সকল সৈনিকদের উদ্দেশ্য ভাষণ দেন যেখানে " আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের আগে তিনি সর্বদা চুক্তিতে আহবান করতেন। " দেখ তোমরা প্রথমে শত্রুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই । আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে যুদ্ধ করবে। সাবধান ! অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, খেয়ানত করবে না, যুলুম করবে না।"[২৬৮]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও চুক্তিতে বিশ্বপরিবেশ রক্ষার অধিকার প্রসঙ্গ

বিশ্ব পরিবেশ; এই পৃথিবীতে মানুষ এবং মানুষের চারপাশে যা কিছু আছে বিশেষ করে আবহাওয়া, জলবায়ু, মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি নিয়েই বিশ্ব পরিবেশ। মানুষ হচ্ছে , এই পৃথিবীর প্রধান আকর্ষণ তাই মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ চায় মানুষ। তাই এটি মানবাধিকার। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশ্বপরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন।

"বিনা কারণে গাছ কাটবে না, কোন শস্যক্ষেত্র নষ্ট করবে না, কোন গরু, বকরী কিংবা উট অন্যায়ভাবে যবাই করবে না"।

"খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ কাটবে না এবং কোন ঘরবাড়ীও ধ্বংস করবে না।"[২৬৯]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ , পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। জনসংখ্যা যার বাড়ছে ততই ভূমি আসছে ক্রমশ চাষের আওতায় , বনজঙ্গল কেটে তৈরী হচ্ছে লোকালয়ের বসতবাড়ি, আসবাসপত্রের জন্য অথবা ঘরবাড়ি ও জ্বালানির জন্য নিধন করা হচ্ছে পাছগালি। এমনিভাবে দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বনভূমি ধ্বংস, কৃষি জমির সম্প্রসারণ , মরুময়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নানা কারণে, এখন পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ সংকটের মুখে পতিত। এছাড়া গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পরিবেশের বর্তমান অনুকূল অবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। বস্তুত বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন মানব জাতির জন্য বিরাট বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

---

[২৬৮] আবদুল কাইয়ুম নদভী, অনু. আবদুল মতীন জালাবাদী, *মহানবীর ভাষণ*(ঢাকা : ইসলাকি ফাউন্ডেশন, ২০১০ খৃ.), খ. ২, পৃ. ১৪৬

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ এবং অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের জন্য তার আশেপাশের প্রাণী , উদ্ভিদ, অণুজীব, মাটি, পানি বাতাস , আলো , তাপ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান। তাই মানুষকে টিকে থাকতে হলে তার আশে পাশে যত জীব ও উদ্ভিদ আছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেই বাঁচতে হবে। কেননা জীব ও উদ্ভিদের জীবন চক্রই পরিবেশকে ভারসম্যপূর্ণ করে রাখে।

মানুষের জন্য পৃথিবী। সৌরজগতে পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যার গঠনপ্রণালী এবং অবস্থান জীবজগতের বেচেঁ থাকার পক্ষে অনুকুল। জলবেষ্টিত এবং বায়ুমন্ডলে ঢাকা নীলাভ পৃথিবী সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। মানুষের অপতৎপরতার কারণেই বায়ুমন্ডল, পানি, মাটি সবই ক্রমশ সাংঘাতিক ভাবে দুষিত হয়ে পরেছে। মানুষের প্রভূত্বকামিতা, আত্মম্ভবিবতা, অহমবোধ, দুর্দান্ত অর্থলিপ্সা, তার আর্থিক তৎপরতাকে সীমাহীনভাবে জোরদার করেছে। এতে আরো আগ্রাসী হাত বিস্তৃত হচ্ছে সুসজ্জিত প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি হচ্ছে ছাড়খার। ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা বন বনাঞ্চল, নদ-নদী। পরিবেশ হচ্ছে ভারসাম্যহীণ।

দুষণমুক্ত পরিবেশ মানুষের প্রত্যাশা মানুষ চায় সুস্থ সুন্দর দুষণমুক্ত পরিবেশ। কারণ দূষণমুক্ত পরিবেশ মানুষের খুব প্রয়োজন। প্রয়োজনের কারণ হচ্ছে -১. মানব সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য, ২. পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট হলে এর ক্ষতিকর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের দেহ মনের উপর, ৩. পানি বিভিন্নভাবে দুষিত হতে পারে। মানুষের জীবন রক্ষার জন্য পানিকে দুষণমুক্ত রাখা চাই, ৪. বায়ুর দুষণ হতে পারে। আর বায়ুদুশণই পারিবেশ দুশণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। মেরু অঞ্চলে বরফ গলতে থাকে, গ্রীন হাউসের প্রভাবে সমুদ্রতল বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে অতি অবশ্যই মানবজাতির মুক্তি দরকার। তাই বিশ্বপরিবেশ দুষণমুক্ত পরিবেশ মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ঃ২৮ এ বলা হয়েছে– অনুকুল পরিবেশের কথা বলা হয়েছে “ প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক সামজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে বসবাসের অধিকারী যেখানে এই ঘোষণার উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরুপে কার্যকর করা যায়।”[২৭০] এখানে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলতে বিশ্বপরিবেশকে বুঝানো হয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বর্ণিত অধিকার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের অনুকুল পরিবেশ তথা বিশ্বপরিবেশের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার প্রসঙ্গ

আমরা সমাজে বাস করি। আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা একটি মৌলিক মানবাধিকার। জীবিকা অন্বেষণ, অর্জন, উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, বন্টন, বিনিয়োগ, লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতারই পরিচায়ক। তাই সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান অবশ্যক।

---

২৭০ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নরনারী সকলের মৌলিক অধিকার হিসেবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে। চাকুরী ও উপার্জননের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের চাকুরী ও ব্যবসা করার সমান অধিকার রয়েছে। অর্জিত মুদ্রা ভোগ করার , খরচ করার অধিকার তার রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার মৌলিক চাহিদা পুরণ করতে ব্যর্থ হয় , তবে ইসলাম সাহায্য করবে, দান ও যাকাতের মাধ্যমে। এই ধরণের নীতি ইসলামে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুদের সাহায্য করার বিধান ইসলামে স্বীকৃত। এভাবে ইসলাম একটি নতুন আধুনিক আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক তায়েফের ছাকীফ গোত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে আর্থ- সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকারের কথা এসেছে এভাবে " ছাকীফ গোত্রের অনুপস্থিত লোকেরাও এইএই নিরাপত্তার অধিকার লাভ করবে। তাদের যে সম্পদ 'লাইয়াতে' রয়েছে সেগুলো 'ওজ' এর সম্পদের মতই সম্মানিত, অনতিক্রম্যও সুসংরক্ষিত (হারাম) বলে গণ্য হবে। তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র, ও সমব্যবসায়ীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাও এসব অধিকার লাভ করবে। ছাকীফ গোত্রের জানমালের উপর কোনরূপ যুলুম করতে পারবে না। তাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তারা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলতে পারবে। তাদের আমীর তাদের মধ্য থেকেই হবে- বনি মালিকের আমীর বিন মালিক গোত্র থেকে, আর বানি অখলাফের আমীর বনি আখলাফ থেকে হবে। ছকীফ গোত্রের যে সব লোক কুরাইশদের আঙ্গুরবাগানে পানি সিঞ্চন করে থাকে, ফসলের অর্ধেক তাদের পাওনা হবে। বন্দকী জিনিষের বিনিময়ে সূদ নেয়া যাবে না। বন্দক ছুটিয়ে নেওয়ার সামর্থ থাকলে দেনা পরিশোধ করে তা এখনই ছুটিয়ে নেবে, নতুবা আগামী বছরের জুমাদাল উলা পর্যন্ত তা শোধ করে দেবে। আর যে ব্যক্তি মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সত্তেও পাওনা পরিশোধ করলো না , সে যেন তাকে সূদ বানিয়ে নিল।[২৭১]

রসদ ও সশ্যাদি সরবরাহে তাদেরকে প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখা হবে এবং ফলমূল উৎপাদনের মওসূমে তাদেরকে বিব্রত করা হবে না। বৃষ্টি থেকে পানি ব্যাবহারের তাদের পূর্ণ আধিকার থাকবে।[২৭২]

আন্তজাতিক মানবাধিকারের সনদে আর্থ- সামজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ : ২২ এ বলা হয়েছে" প্রত্যেকে ব্যক্তি, সমাজের সদস্য হিসেবে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে, এবং তিনি জাতীয় প্রচেষ্টা অথবা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংগঠন (organisation) ও সংস্থান অনুসারে, তাঁহার মর্যাদা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অবাধ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নের অধিকারী (entitled)।" [২৭৩]
সমাজের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা এবং তাদের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য ইসলাম যে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে । যেমন , সমাজের প্রতিটি সদস্যকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণরুপে ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে সে অন্যের গলগ্রহ না হয়। অর্জিত সম্পদ শরী'আতের নিষিদ্ধ খাতসমূহে ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা , অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা, বিলাসব্যসন ও ভোগবাদিতার নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ ধ্বংস করার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তা ভূল পথে ব্যয়িত হওয়া

---

[২৭১] আবু উবায়েদ, *কিতাবুল আমওয়াল*(কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারীয়া, ১৪০১), পৃ. ১৯৪-১৮৫; তাবাকাতে ইবনে সা'াদ, খ.৩, পৃ.৩৩ ও ৫৩; মাকতুবাতে নবভী সাইযদ মহবুব রিযভী, পৃ. ২৩২-২৩৮
[২৭২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ খ. ৩ পৃ. ২১, মাকতুবাতে নবভী, সাইয়েদ রিযভী পৃ. ১৮৮-১৮৯
[২৭৩] গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্ধ করা হয়েছে। তার সঠিক গতি তার প্রকৃত হকদারের দিকে ফিরিয়ে দিতে তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনে অপরের অংশ নির্ধারণ করে এক সামষ্টিগতভাবে লালন পালন ব্যবস্থার সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হচ্ছে ১. অত্যাবশকীয় ভরণপোষণ পিত-মাতা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণ ২. আর্তমানবতার সেবায় কুর'আনের নিদের্শিত যাকাত অধিক সম্পদ ব্যয়। মহানবী সা. বলেন "যাকাত ছাড়াও তোমাদের আরো অধিকার রয়েছে।[২৭৪] অধিক সম্পদ ব্যয় করার তিনটি খাত এক . সেই মুসাফির যে পানাহার প্রার্থি হয়। দুই. সেই অভাবী যে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়। তিন. অক্ষম ও দূর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়। ৩.ধারকর্য দেয়া : বিত্তশালীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ এই যে, তারা যেন প্রয়োজনের সময় খোলা মনে অভাবীদের ঋণ দেয় এবং কোন জিনিস চাইলে তা দিতে যেন অসম্মত না হয়।ঋণ দেওয়া দান-খয়রাত তুল্য।[২৭৫] এভাবে ইসলাম সমাজের প্রত্যেক মানুষ শরী'আতের নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করে অধিকতর সম্পদ উর্পাজন করতে পারবে, নিজের প্রয়োজন পুরণের পর যা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকবে সমাজের দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় ব্যয বরবে, যাতে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সামাজিক ভারসাম্য এবং আর্থ-সামাজিক নিরাপত্ত নিশ্চিত হয়।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীতে শ্রমিকের অধিকার প্রসংঙ্গ

কাজ, ন্যায্য মজুররিসহ শ্রমিকের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) সচেতন ছিলেন। নবী করীম (সা.) শ্রমজীবিদের যেসব অধিকার নির্ধারিত করেছেন তম্মমধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার এই যে-" তাতে শুধু পূর্ণ মজুরীই প্রদান করা যথেষ্ট নয় বরং যতটা সম্ভব ত্বরিৎ মজুরী পরিশোধ করবে। তিনি আরো বলেছেন, "শ্রমিককের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও।"[২৭৬]

রাসূলে করীম (সা.) শ্রমিকের মজুরী দান করার পরেও তাদের লাভের অংশ দেওয়ার জন্য ও উপদেশ দিয়েছেন। "কর্মচারীদের তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও। কেননা আল্লাহ শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না। প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ ' হিদায়া' তে শ্রমিকের লভ্যাংশের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পুঁজিপতি তার মূলধন বা পুঁজি খাটানোর কারণে এবং শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে লাভের হকদার হয়ে থাকে।

মজুরীর ও কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ প্রসঙ্গে নবী করিম (সা.) নিম্লোক্ত নীতি নির্দিষ্ট করেছেন," শ্রমিকদেরকে দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপযুক্ত সাহায্য ও পোষাক-পরিচ্ছেদ দিতে হবে এবং তাদের উপর সামর্থ অনুসারে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।[২৭৭] মজুরীর পরিমাণ এরূপ হবে যেন তা কোন দেশ ও যুগের স্বাভাবিক অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত হয় এবং উপার্জনকারী তার উপার্জন দ্বারা অন্ন , বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূরণ করতে

---

[২৭৪] আবূ দাউদ,প্রাগুক্ত, বাব হাক্কিস সাইলি, হাদীস নং ১৪১৮
[২৭৫] ইবনু মাজাহ,প্রাগুক্ত, বাবুল কারযি, হাদীস নং ২৫২১
[২৭৬] ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবু ইজরাইল আজীরি, হাদীস নং ২৪৩৪
[২৭৭] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার বাণীতে বলেন ‘পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে রিযক তালাশ কর।’[২৭৮] ‘শ্রমিককে পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা মহা পাপ।[২৭৯]

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সনদে শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ২৩ এ বলা হয়েছে -

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করার অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষ জনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষণ লাভের অধিকার আছে।

(২) কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

(৩) যে সব ব্যক্তি কাজ করে তাহাদের প্রত্যেকের ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে যাতে তিনি এবং তাহার পরিবার মানবিক মর্যাদার সহিত জীবন যাপন করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে উহার পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও উহাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৩ এখানে যে সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- ১. কাজ করার অধিকার ২. পছন্দমতো কাজ বেছে নেয়ার অধিকার ৩. ন্যায় ও অনুকুল অবস্থায় কাজ বরার অধিকার ৪. সমান কাজের জন্য সমান বেতন লাভের অধিকার ৫. ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার,৬. প্রয়োজনে অন্যান্য সামাজিক সহায়তা লাভের অধিকার ৮. শ্রমিক সংঘ গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার।[২৮০]

উল্লেখ্য যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ২৪ নং পরিচ্ছেদ অনুসারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয়। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে “প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্রাম ও অবকাশ লাভের অধিকার রয়েছে; এর মধ্যে দৈনিক কর্ম-ঘণ্টার (working hours) যুক্তিসংগত সীমিতকরণ এবং সময়ে সময়ে সবেতন ছুটির অধিকার অন্তর্ভুক্ত।”[২৮১] আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের দুটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে (১) বিশ্রাম ও (২) অবসর বিনোদন। রাসূলুল্লাহর (সা.) এর বাণীতে এই অধিকারগুলো আরো জোরালো ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই শ্রমজীবি মানুষ ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে লাভের অংশীদার হিসাবে হযরত খাদিজা (রা.) এব ব্যবসায়ে খেটেছেন । খোলাফায়ে রাশেদুনের অন্যতম দুই খলিফা হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলি মেহনত করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণই নয় বরং হযরতের পূর্ববর্তী নবি রাসূলগণের অধিকাংশই শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। শ্রমিকের সমস্যা নিরসন এবং তাদের অধিকার পুরণে অত্যন্ত সজাগ, বাস্তব ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টি রাখার তাকিদ দিয়ে মহা নবী (সা.) বলেন “ এরা তোমাদের ভাই - তোমাদের খেদমত করেছে।”

ইসলামের বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো, শ্রমিক ও নিগোকর্তা তারা যেন একে অন্যের ভাই বলে মনে করে এবং তাদের পরস্পরের জন্য যেন সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিরাজমান থাকে। অন্তত থাকা খাওয়ার

২৭৮ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৩০

২৭৯ বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু ইসমু মান মানা'আ আজরাল আজীরি, হাদীস নং ২১০৯

২৮০ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০-৪৭১

২৮১ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে এদের পরস্পরের মধ্যে যেন অর্থনৈতিক সমতা বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা মজুরি নীতির ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো , শ্রমিককে অন্তত এমন মজুরি দিতে হবে, যা দ্বারা মজুরি দিয়ে শ্রমিকের অর্থনৈতিক সমতা এসে যায় । আজকাল শ্রমিকদের মজুরি যদি সেই পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, তবে শ্রমিক ও মলিকের মধ্যকার সংঘর্ষ অতি সহজেই বিলুপ্তি সাধন করা সম্ভব হবে। নবী (সা.) আরো বলেন " নামাজের খেয়াল রেখো আর যারা তোমাদের অধীনে আছে তাদের অধিকার ভুলে যেয়ো না।"[২৮২]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে ন্যায় বিচার লাভের অধিকার প্রসঙ্গ

ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়া মানবাধিকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। সবদিক দিয়ে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার পর্যায়ে স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে ন্যায় বিচার মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভূক্ত, তার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করণ প্রত্যেকটি মানব সমাজের উপর ধার্য অবশ্য কর্তব্য। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে মানব সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্টাই হচ্ছে নবী-রাসূলদের প্রেরণ, আসমানী কিতাব সমূহের অবতরণ এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির উদ্দেশ্য- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ " আমরা আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীসহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব, ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিদ কল্যাণ। আল্লাহ অবহিত হবেন যে কারা না দেখেও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশীল।"[২৮৩]

এ পর্যায়ে আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ হল " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

'আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমানতসমুহ তার হকদারকে প্রত্যাবর্তণ করতে আর যখন তোমরা লোকদের পারস্পারিক ব্যাপারে বিচার ফয়সালার কাজ করবে, তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করবে।'[২৮৪]

ইসলামী সুবিচারে কোন পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। এমন কি বাদী বা বিবাদী যদি নিকটাত্নীয়, সংগী-সাথী, বন্ধু বা পিতামাতার ও নিকটাত্নীয়দেরও বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী হোক কি গরিব, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিবাবক। বস্তুত ন্যায় বিচার ইসলামী সমাজের একটা মৌলিক ও ভিত্তিগত ব্যাপার। আর ইসলামী সমাজে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে।

'ন্যায়বিচারক শাসকের একদিন ষাট বছরের ইবাদতের চাইতে শ্রেষ্ঠতর[২৮৫]। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এই জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তরা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর

---

[২৮২] আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, বাবুন ফী হাক্কিল মামলুকি, হাদীস নং ৪৪৮৯

[২৮৩] আল-কুরআন, ৫৭: ২৫

[২৮৪] আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

২৮৫ তাবারানী, আল মু'জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত, বাবু মান ইসমুহু আব্দুর রহমান, হাদীস নং ৪৯২১

Dhaka University Institutional Repository

করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যার মুঠোয় আমার জীবন! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত তবে আমি তাঁরও হাত কাটতাম।'[২৮৬] এখানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতে বিচার প্রাপ্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'الا لا يجني جان الا على نفسه ولا يجزي والد على ولده ولا مولود عن والده " সাবধান! একজনের অপরাধে অন্যজন দায়ী হবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়ি করা যাবে না।"[২৮৭]

১. মদিনার সনদে বলা হয়েছে "বানূ আউফ গোত্রে ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ আউস গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।
২. বানূ আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধুমাত্র সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।
৩. বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য ঐ গোত্রের জাফনা শাখার জন্যও তা প্রযোজ্য।
৪. বানূ আউফ গোত্রে ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ শুত্বান গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। অপরাধের বিনিময়ে কল্যাণ।
৫. ছা'লাবা গোত্রের মাওয়ালীরা ছা'লাবা গোত্রের মতই বিবেচিত হবে।

নাযরান চুক্তিতে বলা হয়েছে- তাদের ভুখন্ডে কোন সৈন্য পদার্পণ করবে না। তাদের মধ্যে কেউ কোন অধিকার দাবী করলে কাউকে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত না করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে।[২৮৮]
প্রতিটি মানুষ ইনসাফের ভিত্তিতে তার যাবতীয় অধিকার সমূহ পেতে চায়।

সর্বশ্রেনীর মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিধান। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার কার্যকর করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল ও জবাবদিহী প্রশাসন ব্যবস্থা। এজন্য প্রয়োজন জনগণ, শাসক, প্রশাসকের মধ্যে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে শিক্ষা যা ইসলাম প্রতিটি নরনারীর উপর ফরজ ঘোষণা করেছে।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মানবাধিকার অন্যান্য বৈশিষ্টের আসনে সমাসীন। এখানে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য হয় না। শাসন বিভাগ যাতে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে না পারে সে জন্য শুরু থেকে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়েছে। ইসলামে মানবাধিকার আইনে সাধারন মানুষ এবং একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । ইসলামের এ শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার মানব রচিত সব সমাজব্যবস্থার শীর্ষে সমাসীন থাকবে চিরদিন। মানবতার যাবতীয় কল্যাণ ইসলাম নিশ্চিত করেছে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই আল-কুর'আনের দৃষ্টিতে সামাজিক সুবিচার ও মৌলিক অধিকার লাভের হকদার।

---

২৮৬ বুখারী,প্রাগুক্ত, বাবু হাদীসুল গারি, হাদীস নং ৩২১৬
২৮৭ ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবু আল খুতবাতু ইয়াওমান্নাহরি, হাদীস নং ৩০৪৬
২৮৮ মাজমু'আতুর ওয়াছাইক্ব, পৃ.১৪১-১৪২, কিতাবুলে খারাজ, পৃ. ৪১, ফুতুহুল-বুলদান, পৃ.৬৫-৬৬; ত্বাবাকাত খ. ১-২, পৃ.৩৫-৩৬; যাদুল মা'দ, খ. ২, পৃ.৪০; জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, খ. ১, পৃ.৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী শিশু, বৃদ্ধ, দাস দাসী বন্দী ও আদিবাসী অধিকার

প্রথম পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী অধিকার প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সমঅধিকার প্রসঙ্গে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে দাস-দাসীর অধিকার প্রসঙ্গ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে বন্দিদের অধিকার প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী অধিকার প্রসঙ্গ

তৎকালে আরবে নারীরা ভোগের সামগ্রী বলে বিবেচিত হত। পুরুষরা তাদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করত। কন্যাসন্তান জীবন্ত কবর দিয়ে তাদের জীবনাবসান করত। এমনকি জুয়ার আসরে স্ত্রীকে বাজি রাখার রেওয়াজ প্রচলত ছিল। হেরে গেলে বাজি রাখা স্ত্রী অবলীলাক্রমে অন্যের হাতে চলে যেত। এক কথায় নারীরা ছিল সমাজে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ঘৃণিত ও নিষ্পেষিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনার সনদে ৪১ নং অনুচ্ছেদে নারী অধিকারের কথা বলা হয়েছে এভাবে-"কোন মহিলাকে তার পরিবারের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতিবেশীর ন্যায় আশ্রয় দেয়া যাবে না।" তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "হে মানবমণ্ডলী তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল তোমরা তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে খাদ্যের বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।"[২৮৯] তিনি আরো বলেন, তোমরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায় সংগত ভরণ পোষণের ও পোশাক পরিচ্ছদের হক রয়েছে।"[২৯০]

সার্বজনীন মানবাধিকার সনদসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলে নারী অধিকার

---

[২৮৯] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ, *সুনানু ইবনু মাজা*(লেবানন: দারুল ইহয়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যা, তা.বি,), খ.২, পৃ. ১০২৫; মুসনাদু আহমাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫৮১৩

২৯০ বায়হাকী, প্রাগুক্ত, বাবুন ফিল ইহসানি ইলাল মামালিকি, হাদীস নং ৮৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.)এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রতিফলিত হয়েছে- UDHR এর Universal Declaration of Human Rights UDHR এর ১৬ নং অনুচ্ছেদ, ICESCR এর ৩নং অনুচ্ছেদ ICESCR এর ২৩ নং অনুচ্ছেদ এবং ECHR এর ১২ নং অনুচ্ছেদে। যেমন:

UDHRএর অনুচ্ছেদ : ১৬ এতে বলা হয়েছে,

"১. জাতি, জাতীয়তা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, পূর্ণবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের যোগ্য।

২. ভাবী-দম্পতির অবাধ ও সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌল গোষ্ঠী একক (Group. Clint) এবং উহা সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ লাভের অধিকারী।[২৯১]"

অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Convenant of Economic Social and Cultaral Rights) এর ৩ নং অনুচ্ছেদে নারী অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বর্তমান চুক্তির পক্ষরাষ্ট্রগুলি এই চুক্তিতে বর্ণিত সকল অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[২৯২]"

আবার পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Convenant on Civil and Political Rights) ২৩ নং অনুচ্ছেদে নারী অধিকার, বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন এবং ভঙ্গ হওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ : ২৩

১. পরিবার সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী এক (Group unit) এবং উহা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ লাভের অধিকারী।

২. বিবাহযোগ্য বয়স্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহ করার অধিকার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার স্বীকার করতে হবে।

৩. বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ ও স্ত্রীর অবাধ ও পূর্ণসম্মতি ব্যতিরেকে কাহাকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না।

৪. বর্তমান চুক্তির পক্ষরাষ্ট্রসমূহ বিবাহ সম্পর্ক বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার ও দ্বায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে সন্তানাদির (যদি সন্তান থাকে) জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।[২৯৩]

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের (The European Convention Human Rights) ১২ নং অনুচ্ছেদে নারী অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "বিবাহযোগ্য বয়সের নারী পুরুষদের

---

[২৯১] আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬

[২৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

[২৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ করার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে এবং এই অধিকার নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় আইনানুসারে উহা ব্যবহার করতে হবে"।[২৯৪]

নারী ও পুরুষ উভয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন যদি সঠিক এবং যৌন সম্পর্ক যদি বৈধ হয়, নারীর চেষ্টা সাধানায় যে শূন্যতা থেকে যায় তা পুরুষ পূরণ করে এবং পুরুষের চেষ্টা সাধনায় যে ঘাটতি ও অভাব থেকে যায় তা যদি নারী পুরণ করে, অনুরূপ যৌন সম্পর্ককে স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকতে দেয়া হয় এবং তাকে মজা লুটবার উপায় মনে করা না হয় তাহলেই কেবল সামাজিক জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু যদি নারী ও পুরুষের বন্ধন ও আচরণগত সম্পর্ক অসামঞ্জস্য এবং যৌন সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা থাকে তাহলে সমাজ পতন ও অবনতির দিকে ধাবিক হতে থাকে।

বর্তমান সভ্যতা নারী এবং পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি যৌন সমস্যার সমাধান দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, নারী ও পুরুষ ভ্রান্ত সম্পর্ক বর্তমান সভ্যতার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং মানুষকে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে যেখানে আরাম ও প্রশান্তির শত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সে তা থেকে বঞ্চিত।

সময়ের এ পেক্ষাপটে আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মানবাধিকার প্রশ্নে ইসলামের নারী অধিকার সম্পর্কিত নীতিমালা সকলের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরা যেন নারীরা বুঝতে পারে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে ইসলাম বিরোধী কোন শক্তির কাছে তাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই দিয়েছে নারীর সকল ন্যায়সংগত অধিকার সংরক্ষনের গ্যারান্টি, অন্য কেউ নয়।

নিম্নের আলোচনায় আমরা তা প্রমাণ করতে পারি :

নারী অধিকার যুগে যুগে মানব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায় এভাবেই তার বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্প বাণিজ্য ও তাহযীব তামাদ্দুনের ক্রমোন্নতি হয়েছে।

নারী ও পুরুষের শক্তি ও যোগ্যতার পার্থক্য রয়েছে। নারী তার দেহের খুন দিয়ে মানব বংশধারাকে লালন করতে পারে ঠিকই কিন্তু ভূমি কর্ষণ করে নিজের আহার্য্যের সংস্থান এবং তীর ধনুক হাতে শত্রুর মোকাবেলা করা তার জন্য অসম্ভব। কেননা প্রকৃতি তাকে লৌহ দৃঢ় পাঞ্জা এবং শক্তিশালী বাহু দান করেন নি। তবে তার হৃদয়ে আছে স্নেহ-ভালবাসা, সমবেদনা ও ত্যাগের স্পৃহা।[২৯৫] ফলে, নারী ও পুরুষের শক্তি ও যোগ্যতার এ পার্থক্য ইতিহাসের অধিকাংশ যুগে তাদের মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে নারীকে অবজ্ঞা ও অবমাননার দৃষ্টিতে দেখা হতো। এমনকি কখনো কখনো তাকে ওই সব অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হতো যা ওই দেশে জীব-জন্তুও ভোগ করতো।

নারী অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

---

[২৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

[২৯৫] মাও. সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, অনু. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *ইসলামী সমাজে নারী* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আগমনের পূর্বে গোটা দুনিয়া নারী জাতিকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতা ও তামাদ্দুনের জন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছিল। তাকে অধঃপতনের এমন এক অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আশা করা ছিল বাতুলতা। দুনিয়ার এই আচরনের বিরুদ্ধে ইসলাম উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো যে, গতিশীল জীবন নারী ও পুরুষ উভয়ের মুখাপেক্ষী। নারীকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, সে ধাক্কা খেতে থাকবে এবং তাকে জীবনের রাজপথ থেকে তুলে কাঁটার মত দূরে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ পুরুষকে সৃষ্টি করার যেমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে তেমনি নারীকে সৃষ্টিরও একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। মানুষের এ দুটি শ্রেণী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করেছেন। এ লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (৪৯) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ "ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয় প্রকার সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্ব জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত ও সর্ব শক্তিমান।"[২৯৬]

ইসলাম নারী জাতিকে লাঞ্চনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান থেকে দ্রুততার সাথে উঠিয়ে এনে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে । এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, "নবী (সা.) এর যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম এই ভেবে যে আমাদের সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল না হয়। নবী (সা.) এর ইনতিকাল হওয়ার পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের সাথে মিশতে শুরু করলাম[২৯৭]।"

এই নির্যাতিত শ্রেণীটির বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। কোর'আন বললো ,তারা জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে: কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।"[২৯৮]

নবী (সা.) এই নির্যাতিত শ্রেণীকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ নামা ও শিক্ষা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত নারী অধিকারের কোন দাবীদার তার চেয়ে ন্যায়ানুগ ও বাস্তব শিক্ষা পেশ করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, হকদারকে হক না দেয়া, সব রকম পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং মেয়ে সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্চনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২৯৯]

---

[২৯৬] আল-কুরআন, ৪২: ৪৯-৫০

[২৯৭] আবূ-আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুন নিকাহ। উদ্ধৃতি, মাও. সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৬

[২৯৮] আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

[২৯৯] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবী দাঊদ*(লেবানন : দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যা, বৈরুত,১৩৮৯/১৯৬৯), কিতাবুল আদব,অনুচ্ছেদ.ফী-ফাদলে মানা আলা ইয়াতামা, পৃ. ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সা.) অত্যন্ত দরদ ভরা ভাষায় বলছেন “আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যাকে (বিধবা হওয়ার কিংবা তালাক দেয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণকারী বা উপার্জনকারী আর কেউ নাই।”[৩০০]

গোটা বিশ্ব নারী জাতিকে অপরাধের উৎস, এবং সাক্ষাত পাপ ও গোনাহ মনে করে বসেছিল। কিন্তু বিশ্ব-জাহানের সেই সর্বকালের অতি পবিত্র ব্যক্তিত্ব যার প্রতিটি চলন-বলন ও আচরণ ছিল নৈতিকতায় ভরপুর যিনি দুনিয়াকে তাকওয়া ও খোদাভীতির শিক্ষা দিয়েছেন, যাকে সৃষ্টিই করা হয়েছিল এ জন্যে যে, পাপ ও অশ্লীলতায় ভরা বিশ্বে আমূল পরিবর্তন আনবেন। তিনি বলেছেন, “দুনিয়ার বস্তু নিচয়ের মধ্যে আমি ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধি আর আমার চক্ষু শীতলাকারী হলো নামায।”[৩০১]

এক সময় নবী (সা.)- এর স্ত্রীগণ উটের পিঠে সফর করছিলেন। নবী (সা.) উষ্ট্রচালকে বললেন–

“কাঁচগুলোকে একটু দেখে শুনে যত্নের সাথে নিয়ে যাও।”[৩০২]

রাসূল (সা.) অন্যত্র বলেন, “আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংস। যা তার সন্দেহ সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়[৩০৩]।”হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, “নবী (সা.) কাকে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসতেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ফাতেমাকে।”[৩০৪]

ইসলামের এসব শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব আনলো যে, যারা এক সময় একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না এবং এই নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিতো না তারাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের জীবনের পুঁজি মনে করতে লাগলো। আপন শিশু সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেতো না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেল। আর যারা নারীর সাথে স্নেহ-ভালবাসার আচরণ করতে জানতো না তারাই নিজেদের জীবন সন্ধায় এই নির্যাতিত মানব শ্রেণীর ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো। এ প্রসঙ্গে আমরা উদাহরণ পেশ করতে পারি। যেমন,

“ওহুদের যুদ্ধের সময় হযরত জাবের (রা.) এর এর পিতা তাকে বললেন: বেটা, হয়তো এই যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামীতার অছিয়ত করছি[৩০৫]।”

সুতরাং হযরত জাবের (রা.) একজন যুবক হওয়া সত্বেও তিনি তাঁর বোনদের দেখা শোনার জন্য একজন বিধবাকে নিজের জন্য পছন্দ করলেন। নবী (সা.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলো না কেন? জবাবে তিনি বললেন “হে আল্লাহর রাসূল, আমার

---

৩০০ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াযিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৩০১ নাসায়ী, প্রাগুক্ত, কিতাবু ইশরাতিন নেসা, অনুচ্ছেদ. হুব্বুননিসা।

৩০২ ইমাম মুসলিম, সম্পন্না পরিষদ,অনু. *সহীহ মুসলিম*(ঢাকা :ই.ফা.বা. ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খৃ.), খ. ৭ম, পৃ. ৩২৭

৩০৩ আবূ-আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, উদ্ধৃতি, মাও. সাইয়িদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬১

৩০৪ তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব। উদ্ধৃতি: মাও. সাইয়িদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত।

৩০৫ মুসতাদরিক হাকেম, খ.৪, পৃ. ২০৩ । উদ্ধৃতি: মাও. সাইয়িদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অর্থাৎ আমার নয়টি বোন আছে, তাদের দেখা শোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি একজন অনভিজ্ঞা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করি নাই। তাই এমন একজন নারীকে পছন্দ করেছি, যে তাদের চুল চিরুণী করে দিতে এবং দেখা শোনা করতে পারবে। নবী (সা) বললেন, তুমি ঠিকই করেছো।"

এখানে চিন্তার বিষয়, একজন যুবক, যার হৃদয়ের গভীরে আবেগের সমুদ্র তরঙ্গায়িত এবং যার উঠতি যৌবনের দাবী ও চাহিদা ভোগের উপকরণ কামনা না করে সে নিজের ছোট ছোট বোনদের স্বার্থে আবেগকে অবদমিত করছে এবং কামনার পরিতৃপ্তির জন্য এমন একটি সমাধান বেছে নিচ্ছে যৌবনের উত্তালতা যা সহজে মেনে নিতে পারে না। এটা কি কোন সাধারণ ত্যাগ? চিন্তা ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে এই যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল ইতিহাসের আর কোন যুগে তার নজীর মিলবে না। অতএব এসব শিক্ষার মধ্যে এত শক্তি আছে যে তার জুলুম ও নির্যাতনের দৃঢ় বাহুকে চুরমার করে দিতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তার পক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের সীমার বাইরে পা রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তাই অসহায় ও দূর্বল নারীর প্রতি সে জুলুমও করতে পারে না।

নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে যখন সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে বিশ্বের সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে নারীর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন আরব উপদ্বীপের মরুময় পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে সেই ঐশী বাণী ঘোষিত হলো, যা নারীকে দিল সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্মানজনক অবস্থান, যা তাকে দিল সকল অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে, যা তাকে অতীতের সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমান থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিল, যা তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য ও মানবসুলভ অধিকারের নিশ্চয়তা দিল, যা তাকে পাশবিক যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি দিল এবং সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধানে ও ঐক্য সংহতি রক্ষায় তাকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিল।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখ দিয়ে ইসলাম নারী সম্পর্কে যে সংস্কারমূলক নীতিমালা ঘোষণা করলো, তার সার সংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করছি; প্রথমত: মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সব রকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করা হয়। আল কুর'আনে মহান আল্লাহ বললেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ "হে মানব জাতি, তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন[৩০৬]।"

দ্বিতীয়ত: পূর্ববর্তী ধর্ম মতের অনুসারীরা নারীকে যে একটা অভিশাপস্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস ও সমাজের গলগ্রহ রূপে চিহ্নিত করতো, সেই মানসিকতাকে ইসলাম প্রতিহত করলো। অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ইসলাম আদম (আ.)- এর জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হাওয়াকে দায়ী করেনি বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে। আদম (আ.)- এর ঘটনা বর্ণনাকালে আল্লাহ বলেন, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ "শয়তান তাদের দু'জনেরই উহা (জান্নাত) হতে পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যে স্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করালো।"[৩০৭]

[৩০৬] আল-কুরআন, ৪ : ১
[৩০৭] আল-কুরআন, ২ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আদম ও হাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا "শয়তান তাদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দিল যাতে তাদের ঢেকে রাখা লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দিতে পারে।"[৩০৮]

আল্লাহ্ তাওবার ব্যাপারেও তাদের উভয়কে সমভাবে অংশীদার করেছে, যেমন বলা হয়েছে, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين "তারা উভয়ে বললো 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবো।"[৩০৯] এমনকি আল কুরআনের কোন কোন আয়াতে এই পাপটির জন্য এককভাবে শুধু আদমকে দায়ী করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى "আর আদম স্বীয় প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে বিপথগামী হলো।"[৩১০]

তৃতীয়ত: পুরুষের মত নারী যদি সৎ কর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদাত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো। পক্ষান্তরে সে অসৎকর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করলে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুস্কার দান করব।"[৩১১] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى "অতঃপর তাদের প্রতিপালন তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের কোন কর্মকে নষ্ট করিনা- চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী ।"[৩১২]

লক্ষ্য করুণ আল কুরআন নিম্নের আয়াতে উভয়ের সমমর্যাদার ওপর কত জোর দিয়েছে, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا "নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারিণী, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী, ধৈর্যধারী ও ধৈর্যধারিণী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী স্ত্রী, সদকা প্রদানকারী ও সদকা প্রদাদনকারিনী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার স্ত্রী, সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী স্ত্রী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারীদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[৩১৩]

চতুর্থত: ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এই মানসিকতা শুধু যে তৎকালীন আরব সমাজেই ছিল তা

[৩০৮] আল-কুরআন, ৭ : ২০
[৩০৯] আল-কুরআন, ৭ : ২৩
[৩১০] আল-কুরআন, ২০ : ১২১
[৩১১] আল-কুরআন, ১৬ : ৯৭
[৩১২] আল-কুরআন, ৩: ১৯৫
[৩১৩] আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

নয়, বরং আজও বহু জাতির মধ্যে বিরাজমান, এমনকি কিছু কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যেও এই মানসিকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই জঘন্য অভ্যাসের নিন্দা করে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ "তাদের কেউ যখন মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর শুনতে পায়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে যায়। প্রাপ্ত খবরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় সে নিজের সমপ্রদায় হতে আত্নগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও ঐ সন্তানকে কি রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।"[৩১৪]

পঞ্চমত: ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "যখন জীবন্ত সমাধিস্ত কণ্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো।"[৩১৫]

ষষ্ঠত: ইসলাম নারীকে সম্মান করতে ও মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মেয়ে হিসেবেও, স্ত্রী হিসেবেও এবং মা হিসেবেও। মেয়ে হিসেবে তাকে মর্যাদা দিতে কিভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তার নমুনা নিম্নের হাদীস থেকে পাই "যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম বিদ্যা ও উত্তম আচরণ শেখায়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" নারীকে স্ত্রী হিসেবেও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।"[৩১৬]

রাসূল (সা.) বলেছেন, "পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে উৎকৃষ্টতম সম্পদ হলো সংকর্মশীলা স্ত্রী। যার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দিত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে স্বামীর মর্যাদা ও সুনাম সংরক্ষণ করে।" নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে।"[৩১৭]

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার সেবা পাওয়ার অধিকার সব চেয়ে কার বেশী? রাসূল (সা.) বললেন তোমার মার। লোকটি বললো, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মার। লোকটি আবার বললো, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মার। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার বাবার।[৩১৮]

---

[৩১৪] আল-কুরআন, ১৬ : ৫৯
[৩১৫] আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯
[৩১৬] আল-কুরআন, ৩০ : ২১
[৩১৭] আল-কুর'আন, ৪৬ : ১৫
[৩১৮] মুসলিম,প্রাগুক্ত, বাবু বিররিল ওয়ালিদাইনি, হাদীস নং ৪৬২৪

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত: নারীকে শিক্ষা দানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস তো ইতিপূর্বেই এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানকে ভালো বিদ্যা ও সদাচার শিক্ষা দিলে জান্নাত অবধারিত[৩১৯]।এ ছাড়া অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নরনারীর ওপর ফরয।"[৩২০]

অষ্টমত: ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে, তা সে মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা-যাই হোক না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ও সে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

নবমত: স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ্ বলেন,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে[৩২১]।"

দশমত: তালাকের সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যাতে স্বামী কোন রকমের স্বেচ্ছাচারমূলক বা অত্যাচারমূলক আচরণ করতে না পারে। এ জন্য তালাকের সীমা নির্ধারণ করেছে এভাবে যে, তা সর্বোচ্চ তিনটের বেশী হতে পারবে না। আরবদের সমাজে তালাকের কোন সীমা সংখ্যা ছিল না। তাছাড়া তালাক কার্যকর করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এরপর একটা ইদ্দতের মেয়াদ নির্ধারণ করেছে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের প্রতি সমঝোতায় প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ এনে দেয়।

একাদশ: ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে। অথচ সমকালীন আরবে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে কোন সীমা সংখ্যার বালাই ছিল না।

দ্বাদশত: নারীকে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে এবং এই অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্ব কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাদীক্ষা, তদারকী ও তার কোন সম্পদ থাকলে তার তত্ত্বাবধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অভিভাবকত্বের নামে তার দন্ডমুন্ডের মালিক হতে বা তার ওপর স্বেচ্চারমূলক শাসন চালাতে ইসলাম কাউকে অনুমতি দেয়নি। আর বয়োপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কেউ ক্রয় বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, বন্ধক, ইজারা, শরীকী ব্যবসায় ইত্যাকার যাবতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতায় ও অধিকারে আদৌ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না।

উল্লেখিত ১২টি মূলনীতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও মানানসই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো:

---

[৩১৯] তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীরি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০২৯৫

[৩২০] ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত, বাবু ফাযলিল উলামাই, হাদীস নং ২২০

[৩২১] আল-কুরআন, ২: ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

১. **মানবিক ক্ষেত্র :** এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার ও তার মানুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল,নতুবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২. **সামাজিক ক্ষেত্র :** ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তর তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মানও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষত: বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালোবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩. **আইনগত ক্ষেত্রে :** আইনগত ক্ষেত্র প্রসঙ্গে ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী বলেন-“বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।”[৩২২]

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপুরক আবরণ। ইসলাম কখনই নারীকে সেবাদাসী হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি রয়েছে পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার। সর্বোপরি ইসলাম নারী জাতিকে এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছেন- يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً “হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগনিত নারী ও পুরুষ।”[৩২৩]

ইসলামের এই এক ঘোষণায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল নারী পুরুষের মধ্যকার আকাশসম ব্যবধান। যুগ যুগ থেকে নারী পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা লৌহ প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করল- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর নিয়ম অনুযায়ী।”[৩২৪]

বর্তমান সমাজে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পুরুষরা যতটুকু ভোগ করছে নারীরা তাদের অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই ততটুকু ভোগ করতে পারছে না নিজেদের অসতর্কতার কারণে। কিন্তু যেখানে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে; নারীরা সেখানেই তা সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন এ ব্যাপারে ইসলামী আইন তাদের চেষ্টা সাধনাকে সফল করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহায়তা করেছে। নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামই সর্বপ্রথম বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম নারীকে সর্বব্যাপী যে অধিকার দিয়েছে আমরা তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারিঃ যেমন-

২৬২. ড. মুস্তাফা আস্-সিবায়ী, অনু.আকরাম ফারুক, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খৃ.), পৃ.২১

৩২৩ আল-কুর আন, ৪: ১

৩২৪ আল-কুর আন, ২ : ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

১. ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার : বিবাহিত নারীর মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে এটা অন্যতম। ভরণ পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। তবে ভরণ পোষনের মান নির্ধারণ পিতা বা স্বামীর পিতা বা স্বামীর সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনের নীতি হলো- وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ "তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যাবস্থা করিও সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে।"[৩২৫] বিয়ের পূর্বে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করবে মেয়ের পিতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ " যথাযথভাবে মেয়ের খাদ্য ও ভরণ পোষণের ব্যাবস্থা করা পিতার জন্য অপরিহার্য[৩২৬]।"বিয়ের পর নারী তার এ অধিকার আদায় করবে স্বামীর কাছ থেকে। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেছেন "যথাযথভাবে তাদের (নারীদের) পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের অপরিহার্য।"[৩২৭]

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। এমন কি স্বামী ভরণ পোষণে ব্যর্থ হওয়ার ফলে স্ত্রী যদি বিয়ে বিচ্ছেদের দাবি করে তা হলে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহম্‌দ ইবনে হাম্বল (র.) এর মত অনুযায়ী বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে।

নারীর স্বাধীন ভাবে কাজ করার অধিকার

পুরুষের যেমন স্বাধীন সত্তা রয়েছে নারীরও তেমন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা রয়েছে। একজন পুরুষ যেমন– স্বাধীনভাবে তার প্রতিপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, সম্পত্তি উপার্জন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, আর্থিক লেন-দেন করতে পারে, তেমনি একজন নারীও স্বাধীনভাবে উক্ত কাজসমূহ করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী দায়ী নয়। যে যা করবে সে জন্য সেই দায়ী থাকবে। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে-"প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করিবে না।'

আল্লাহ বলেন, مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "যে কেউ সৎপথে চলে, নিজের মঙ্গলে সে জন্যই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"[৩২৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বসম্পর্কে জবাব দিহি করতে হবে।"

শিক্ষার অধিকার

পুরুষের ন্যায় প্রত্যেক নারীর সমানভাবে লেখাপড়ার অধিকার রয়েছে। ইসলামে নারী-পুরুষ সকলের উপর বিদ্যা অর্জন ফরয করা হয়েছ। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ،اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَم ،الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক বা জমাট বাধা

---

[৩২৫] আল-কুর আন, ৪ : ২৩৬

[৩২৬] আল-কুর আন, ২ : ২৩৩

[৩২৭] তিরমিযী, প্রাগুক্ত, বাবু মা জা'আ ফী হাক্কিল মারআতি আলা যাওজিহা, হাদীস নং ১০৮৩

[৩২৮] আল-কুর আন, ১৭ : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

রক্তপিন্ড' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৩২৯]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ বলুন, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?[৩৩০]

ইসলাম জ্ঞানার্জনের জন্য নারীকে শুধু অধিকারই দেয়নি রীতিমত তা ফরয করে দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে পুরুষ থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন- "প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"[৩৩১]

মহানবী (সা.) মেয়েদেরকে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি কোন কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করে, তবে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে[৩৩২]।"ইসলাম জ্ঞানার্জনের জন্য নারীদের যে অধিকার দিয়েছে এ অধিকারকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন রাসূলের (সা.) মহিলা সাহাবীরা। তারা বেশী বেশী জ্ঞানার্জনের জন্য রাসূলের খিদমতে এসে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। একবার জনৈকা মহিলা রাসূলের (সা.) কাছে এসে বললেন- "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাদীস তো সব পুরুষরা নিয়ে গেল। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যে দিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে।"[৩৩৩]

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক যুগে মুসলিম নারীদের নিরক্ষরতা মুসলিম জাতির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষিতা মা ও শিক্ষিতা স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে খুবই সহায়ক হবে। জন্মের পর শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া একটি সভ্য ও উন্নত জাতি আশা করা যায় না। এ শিক্ষার সূচনা হয় মায়ের কোলে। অতএব এ মায়ের জাতি তথা নারী জাতিকে শিক্ষিতা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন "রাসূল (সা.) মনে করলেন, তাঁর কথা, মেয়েরা শুনতে পায়নি। তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে বললেন। ইবনে জুরাইয হযরত আতা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কি মনে করেন যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ইমামের কর্তব্য। কিন্তু তারা এটা করছে না কেন?"[৩৩৪]

[৩২৯] আল-কুর'আন, ৯৬ : ১-৪
[৩৩০] আল-কুর'আন, ৩৯ : ৯
[৩৩১] বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান,প্রাগুক্ত, বাবু তলবিল ইলমি ফারীযাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন,হাদীস নং ১৬১৪
[৩৩২] তাবারানী,আল মু'জামুল কাবীর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০২৯৫
[৩৩৩] সহীহ আল বুখারী । উদ্ধৃতি, বিধিবদ্ধ ইলামী আইন, খ. ৩, পৃ. ১৮৮
[৩৩৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পাননি, কারণ সমাবেশ ছিল বড়, উপরন্তু মহিলাদের সারি ছিল পুরুষদের সারির পেছনে, তখন তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে আলাদাভাবে উপদেশ দিলেন। এটা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈধ অধিকার। মহানবী (সা.)- এর যুগের মেয়েরা এ অধিকার আদায়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন, জ্ঞান অন্বেষণে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। ইসলামী আইনবিদগণও এ অধিকারের ব্যাপারে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী 'আল্লামা ইবনুল হাজ্জ' এর 'আল মাদখাল' গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন "নারী যদি তার স্বামীর কাছে নিজের দীনি অধিকার ও দীন শিক্ষার অধিকার দাবি করে, তা হলে স্বামী নিজে সরাসরি তার সে দাবি পূরণ করবে অথবা এ উদ্দেশ্যে তাকে বাইরে যাবার অনুমতী প্রদান করবে। আর এই অধিকার লাভ করার দাবি বিচারকের কাছে পেশ করলে পার্থিব অধিকার পূরণের ব্যাপারে বিচারক যেমন স্বামীকে বাধ্য করবেন, এ অধিকার পুরণের জন্যও ঠিক তেমনি বাধ্য করবেন। কারণ দীনি অধিকারসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য।"[৩৩৫]

চিকিৎসার অধিকার

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ অধিকার যেমন আছে পুরুষের, তেমনি আছে নারীরও। নবী করীম (সা.) হযরত উসমান (রা.) কে বদরের যুদ্ধের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন শুধু তার রুগ্ন স্ত্রীর সেবা- শুশ্রুষার জন্য। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.)- এর অনুপস্থিতির কারণ হলো তাঁর স্ত্রী মহানবীর কন্যা রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাই রাসূল (সা.) তাকে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান তোমারও সেই প্রতিদান।"[৩৩৬]

চিকিৎসা পেশা গ্রহণে নারীর অধিকার

নারী নার্সিং ও চিকিৎসামূলক সেবাজনিত পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই সম্পর্কে বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে আয়েশা (রা.) বলেছেন, খন্দক যুদ্ধে সাদ (রা.) আহত হয়েছিল। তাকে হিব্বান ইবন ওরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশ তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট হতে যাতে তার সেবাযত্ন তদারকি করতে পারেন সেজন্য মসজিদে তাঁবু খাটানো হয়েছিল।"[৩৩৭] হাফেজ ইবন হাজর আসকালানী বলেছেন, ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাদের চিকিৎসা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন সা'দকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ, যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার দেখাশুনা করতে পারি।"[৩৩৮]

জীবন সঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার

---

[৩৩৫] মাও. জালালুদ্দীন আনসার উমারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[৩৩৬] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা : ই.ফা.বা. গবেষণা বিভাগ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খৃ.), পৃ. ১৮৮

[৩৩৭] বুখারী, মাগাজী অধ্যায়। উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত।

[৩৩৮] ফাতহুল বারী, খ.৮, পৃ. ৪১৯। উদ্ধৃতি: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন অধ্যায়ে উপণীত হয়। যদি সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হয়ে যায় বা একের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তা হলে গোটা জীবনটাই বিড়ম্বনাময় হয়ে যায়। সে সংসারে জ্বলে ওঠে অশান্তির দাবানল। আমাদের সমাজে পুরুষের স্ত্রী নির্বাচনে তা পূর্ণরূপেই মেনে নেয়া হয়। একজন পুরুষ কাঙ্খিত মানের স্ত্রী লাভের জন্য বহু কনে দেখতে পারেন, কিন্তু নারীদেরকে আমাদের সমাজ এ জাতীয় অধিকার তেমন দেয় না। সেও যে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তারও রুচি আছে; আছে ভাল বা মন্দ লাগার অনুভূতি, এসব আমরা বেমালুম ভুলে যাই। বর পছন্দ করা যেন নারীর অধিকারেই আসে না; বরং এ সমাজে এ দায়িত্ব নিছক অভিভাবকরাই আনজাম দিয়ে থাকেন। এ জাতীয় একপেশে ও অধিকার হরণকারী নীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, "নারীর বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমিত নিহে হবে।"[৩৩৯] ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ফিকহুস সুন্নাহ্' এ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়িদ সাবিক উল্লেখ করেছেন, "বিয়ের পূর্বে নারীর সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে (বিয়ের কার্য) শুরু করা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব। অভিভাবক আক্বদের পূর্বে তার সম্মতি জেনে নিবেন, যেহেতু বিয়ে হলো পুরুষ এবং নারীর মধ্যকার স্থায়ী ও যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেম-ভালবাসা স্থায়িত্ব লাভ করে না। এ কারণে শরী'আত মেয়েকে (কুমারী হোক বা সায়্যিবা) জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া এবং যেখানে তার আগ্রহ নেই এমন স্থানে পাত্রস্থ করাকে নিষেধ করেছে এবং তার সম্মতির পূর্বে বিয়েকে অশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছে।"[৩৪০] নবী করীম (সা.) বলেন 'বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যাবে না।"[৩৪১] ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) নারীর অসম্মতিতে সম্পাদিত বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ:

'কাসেম থেকে বর্ণিত, জাফর তনয়ের এক কন্যা আশংকা করলেন, তার অসম্মতি সত্বেও অভিভাবক তাকে বিয়ে দেবেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্য জারিয়ার ছেলে আবদুর রহমান ও মুজাম্মা নামক দুই বয়োবৃদ্ধ আনসারীর খিদমতে লোক পাঠালেন। তারা বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। খানসা বিনতে খিদামের ব্যাপারে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তার পিতা তাকে অসম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) সে বিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন। মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী এ সম্পর্কে বলেন, 'বিয়ের পূর্বে যুবতীর অনুমতি অপরিহার্য হওয়া সম্পর্কিত রাসূল (সা.) এর নির্দেশের ব্যাপার পিতাগণ কতই না উদাসীন অথচ এর ফলাফল খুবই খারাপ ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কারও কাছেই গোপন নয়।"[৩৪২]

অন্য একটি মেয়েকে তার পিতা আপন ধনাঢ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কনে বরকে একেবারেই পছন্দ করেনি। মেয়েটি রাসূল (সা.) এর খিদমতে এ বিষয়ে অভিযোগ তুললে তিনি বললেন, এ বিয়ে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। মেয়েটি বললো, বাবার দেয়া বিয়ে আমি

---

[৩৩৯] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা: ই.ফা.বা.গবেষণা বিভাগ, ১৪২২হি./২০০১ খৃ.), পৃ. ১৮৯

[৩৪০] সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ্*(কায়রো : দারুল ফাতহি লিল ইলামিল আরবী,১৯৯০ খৃ.), খ. ২য়, পৃ. ২৪৩

[৩৪১] সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্ । উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, পৃ.১৮৯

[৩৪২] মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী, *তুহফাতুল উরুস*(জর্দান : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, আম্মান, ১৪১০ হি.), পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

খতম করবো না বটে; তবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েদের ইচ্ছা ও পছন্দের বিপরীতে তাদের বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার পিতার নেই।"[৩৪৩]

আমাদের সমাজে দুই ধরনের পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত ঐ সমস্ত পরিবার যেখানে মেয়েদের বিবাহ দেয়া হয় অথচ তাদের বিবাহ সম্পর্কে তাদের মতামতের কোন মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি মেয়েরা তাদের জন্য অভিভাবক কর্তৃক পছন্দ করা 'বর' অপছন্দ করলেও বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তারা পায় না।

দ্বিতীয়ত: ঐ সমস্ত পরিবার যারা তাদের মেয়েদেরকে সর্বক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। পারিবারিক এ অবাধ স্বাধীনতা এক সময় তার উচ্ছৃঙ্খলতায় রূপ নেয়। তারপর, পারিবারিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষার কারনে এক সময় তার পার্শ্বে জড় হয় অসংখ্য বন্ধুরূপী 'সর্বনাশার' দল। এরপর এদের মধ্যে থেকেই একদিন সে একজনকে জীবনসঙ্গী করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মেয়ের বাবা-মা যদি নিজেদের সামাজিক অবস্থানের সাথে ছেলের বাবার সামাজিক অবস্থান মিলিয়ে ভাল মনে করে তা হলে বিয়ের লোক দেখানো অনুষ্ঠান হয় মেয়ের পিত্রালয়ে। আর যদি তা না হয়, তা হলে বিয়ের 'অনুষ্ঠান' বিহীন আনুষ্ঠানিকতা হয় সরকারী কাজী অফিসে।

ইসলাম এ দু'ধরনের বিবাহের কোন একটিকেও সমর্থন করে না। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের মতামতের গুরুত্বের চেয়ে নারীর মতামতের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয় এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "বিধবা নারীর বিবাহ হতে পারে না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তখন তিনি বললেন, অনুমতি চাওয়ার পর চুপ থাকাই তার অনুমতি।"[৩৪৪]

এখানে আল্লাহর রাসূল (সা.) বিবাহের ব্যাপারে নারীকে তার মতামত প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি। বরং এখানে তার পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ দেওয়া ইসলামী শরী'আতে জায়েজ নেই।

উত্তম ব্যবহার প্রাপ্তির অধিকার

কুর'আন মজীদের শিক্ষা হলো, স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা। এমন কি স্ত্রী যদি অপছন্দীয় হয়, তবু যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাব মিলেমিশে জীবন যাপন করার চেষ্টা করতে হবে। কুর'আন কারীমে বলা হয়েছে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তারা যদি তোমাদের পছন্দনীয় না হয়, তা হলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন বিষয়কে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাতে তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।"[৩৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন "মুমিনের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ন সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারা যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"

---

[৩৪৩] মাও. সাইয়িদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৬

[৩৪৪] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৭৭১

[৩৪৫] আল-কুরআন, ৪ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

তবে স্ত্রীকে শাসন করা যাবে না, এমনটি নয়। বরং কোন স্ত্রী যদি অন্যায় করে বসে, তাহলে তাকে পর্যায়ক্রমে সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে। এ ব্যাপারে কুর'আনে বলা হয়েছে- وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, (এতে যদি সংশোধিত না হয়) তাদের শয্যা ত্যাগ কর, (শেষ পর্যায়ে) মৃদু প্রহার কর। যদি তাতে তারা অনুগতা হয়ে যায় তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না।"[৩৪৬]

তবে কোন ক্রমেই এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি চলবে না, রাসূল (সা) এর কয়েকখানা বাণী এ ব্যাপারে আমাদের পথ নির্দেশক।

১. স্ত্রীদেরকে সদয়ভাবে ভর্ৎসনা করো।
২. মুসলিম কখনও স্ত্রীকে ঘৃনা করবে না; যদি স্ত্রীর কোন একটি কাজের জন্য সে অসন্তুষ্ট হয়, তবে স্ত্রীর কোন একটি গুণের জন্য সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।
৩. তুমি কি তোমার স্ত্রীকে প্রহার কর, যেমন দাসকে করতে? এটা নিশ্চয়ই করবে না।
৪. 'আমি (মু'আবিয়া বিন হায়দা) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কি কর্তব্য? তিনি বললেন, যখন নিজে খাবে, তাকেও খাওয়াবে, নিজে কাপড় পরলে তাকেও পরাবে, কখনও তাকে গালি দিও না বা তার মুখে আঘাত করো না। অসন্তুষ্ট হলে নিজেকে তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখ না।[৩৪৭]

অর্থ উপার্জনে পেশা গ্রহণের অধিকার

যে কোন বৈধ পেশা গ্রহণে নারী সম্পূর্ন স্বাধীন। ইসলামে বিভিন্ন যুগে নারী বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শরী'আতের সীমার মধ্যে অবস্থান করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই রয়েছে। ইসলাম এদের পরিশ্রমলব্ধ ফলকে এদের বৈধ অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছে। স্বামী তার স্ত্রীর সম্পদে কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার রাখে না। অপরদিকে স্ত্রীও স্বামীর সম্পদে কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।"[৩৪৮]

নারীরা অর্থোপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থা হতে পারে। যেমন-

(১) চিকিৎসা পেশা গ্রহণ

নারী চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করতে পারবে। নারী নার্সিং ও চিকিৎসামূলক সেবা জনিত পেশায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রাসূল (সা.) এর সময়ে রুফাইদা আসলামী (রা.) সহ অনেক মহিলা সাহাবী ছিলেন যারা চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে ও স্বেচ্ছা সেবক হিসেবে আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করতেন।

---

৩৪৬ আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

৩৪৭ আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-সুহরাওয়ার্দী অনুদিত *Sayings of Mohammad (Sm.)* এর বরাতে শাহাবুদ্দীন আহমদ রচিত 'রাসূল (সা.) এর অনুসরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ, সীরাত স্বরণিকা(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ২৩

৩৪৮ আল-কুরআন, ৪ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

(২) কৃষি পেশা গ্রহণ

ইসলাম নারীকে মানবতা তথা সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। তবে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়িকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে। কৃষি কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থোপার্জন নারীর জন্য বৈধ। নিম্নো ক্ত হাদীস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন-

"হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি (ইদ্দতের সময়ের মধ্যে) গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাঁকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার তুমি তো সেগুলো অবশ্যই সদকা করবে বা ভাল কাজে ব্যবহার করবে।"[৩৪৯]

(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা গ্রহণ

ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার অধিকারও নারীর রয়েছে। যেমন, "ফায়েলা নামের এক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললেন, আমি একজন মহিলা। (নানা প্রকার জিনিস) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি একজন ব্যবসায়ী)। এরপর তিনি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকে জেনে নিলেন।"[৩৫০]

হযরত উমর (রা.)- এর খিলাফত যুগের একটি ঘটনা, "আসমা বিনতে মুখাররাবাহ্ ইবনে জানদালকে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি সেই আতরের কারবার করতেন।"[৩৫১]

(৪) শিল্প ও কারিগরি পেশা গ্রহণ

নারীরা শিল্প ও কারিগরি পেশা গ্রহণ করতে পারে । ইসলামে নারীর এ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী থেকে আমরা পাই "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করে তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন 'আমি কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। আমার স্বামী ও সন্তানদের (আয়ের কোন উৎস) কিছুই নেই। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারি?' নবী (সা.) বললেন 'হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য বয় করতে পার। এ জন্য তুমি পুরস্কার লাভ করবে।"[৩৫২] অপর একটি হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই "উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা.) ও চামড়া পাকা করার কাজে পারদর্শী ছিলেন এবং কাজ তিনি করতেন। হযরত আবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন একটি মেয়েলোক দেখলেন, অতঃপর তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা.) এর কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।"[৩৫৩]

বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার

---

[৩৪৯] মাও. সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

[৩৫০] তাবাকতে ইবনে সা'দ: ৮ম খণ্ড,পৃ.২। উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, পৃ.২০১

[৩৫১] প্রাগুক্ত।

[৩৫২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ। উদ্ধৃতি : মাও.সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪-১২৫

[৩৫৩] সহীহ মুসলিম । উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলাম ও মানবাধিকার, পৃ.২০২

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য মানুষকে পবিত্র জীবন যাপনে সহায়তা করা। পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা ইত্যাদি। এ উদ্দেশ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের দৈহিক চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম হবে, একে অপরকে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির সাথে মেনে নিতে পারবে। এ উদ্দেশ্য বিশেষ কোন রোগের কারণে বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে তা পূরন না হলে ইসলাম এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারীকে 'খোলা'র (বিয়ে বিচ্ছেদের) অধিকার দিয়েছে, যেমন দিয়েছে পুরুষকে তালাকের অধিকার। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে অপছন্দ করলে স্বামীর হাতে রয়েছে তালাক প্রদান করার অধিকার। অপরদিকে স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করলে স্ত্রীর রয়েছে 'খোলা'র অধিকার।

যে বিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি, প্রেম-ভালবাসা ও আত্মিক তৃপ্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়, ইসলাম এ জাতীয় বিয়েকে জোরপূর্বক টিকিয়ে রেখে অশান্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করতে চায় না। বরং এ জাতীয় বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে মানুষকে এ আযাব থেকে মুক্ত করতে চায়।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি কি দোষ পরিলক্ষিত হলে আদালত কর্তৃক বিয়ে বিচ্ছেদ বৈধ, এ সম্পর্কে ইসলামী আইনবেত্তাগণের মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে যে মতটি বর্ণিত, তা হলো; "স্ত্রীদের চারটি দোষে বিয়ে ফেরত যেতে পারে, তা হচ্ছে– পাগলামী, কুষ্ঠরোগ, শ্বেত রোগ এবং যৌন অঙ্গের কোন রোগ।"[৩৫৪]

এটা যেমন স্ত্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি স্বামীর ব্যাপারেও। তবে এ ব্যাপারে যে মতটি কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার অধিক কাছাকাছি মনে হয়, তা হলো, যেসব ত্রুটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, এর যে কোন ত্রুটির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিয়ে বাতিল করার ইখতিয়ার রয়েছে। যেমন– উন্মাদনা, ধবল কুষ্ঠরোগ, দুর্গন্ধযুক্ত মুখ, বিভিন্ন প্রকার ঘৃণিত রোগ এবং যৌনাঙ্গে এমন ধরনের ত্রুটি যা সহবাসে বিঘ্ন ঘটায়।

সাবিতের স্ত্রীর খোলা'র দাবির ভাষা থেকে জানা যায়, সাবিতের (রা.) চেহারা তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি যে ভাষায় রাসূল (সা.) এর কাছে অভিযোগ পেশ করেছিলেন সে ব্যাপারে ইবনে জারীরে বর্ণনা করা হয়েছে "হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার মাথা ও তার মাথাকে বস্তু কখনও একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতকগুলো লোকের সাথে সামনের দিকে আসছে কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশি কালো, সবচেয়ে বেটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তার দীনদারী ও নৈতিকতার কোন ত্রুটির কারণে তাকে অপছন্দ করছি না, বরং তার কুৎসিত চেহারাই আমার কাছে অপছন্দনীয়। আল্লাহর শপথ। যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তা হলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তার মুখে থু-থু দিতাম।

দাম্পত্য জীবন হল মানুষের কাছে সুখ, শান্তি, প্রেম, ভালবাসার, এক বেহেশতী 'সওগাত'। কিন্তু কোন কারণে যদি এ ভালবাসায় ফাটল ধরে তবে ইসলামের বিধান হল, যে- কোনভাবে তা মীমাংসা করে ফেলা। যদি তা কোনভাবেই সম্ভব না হয় এবং স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, তবে সে স্ত্রীকে 'তালাক' দিতে পারবে। আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চায় কিন্তু স্বামী তা চায় না, তবে স্ত্রী

[৩৫৪] নাইলুল আওতার, খ. ২, পৃ.২৯৯; উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীকে কিছু টাকা পয়সা বা ধন-সম্পদ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে[৩৫৫]। যাকে ফেকাহ এর পরিভাষায় 'খুলা' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তা হতে কোন কিছু গ্রহন করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তা হলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন অপরাধ নেই।"[৩৫৬]

ধর্মীয় অধিকার

হিন্দু ধর্ম যেখানে নারীর অন্যান্য অধিকারের সাথে ধর্মীয় অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে, ইসলাম সেখানে নারীর ধর্ম পালনের অধিকারকে পুরুষের ধর্ম পালনের অধিকার থেকে আলাদা করে দেখেনি। ধর্ম পালনের জন্যে এখানে যে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাতেও নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভিন্নতা বা তারতম্য নেই। পুরুষ পুরুষ হওয়ার কারণে এবং নারী নারী হওয়ার কারণে এখানে বিশেষ কোন সুবিধা পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا "যারা সৎকর্ম করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা পুরুষ হোক অথবা নারী , তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না[৩৫৭]।" অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের অধিকারকে একাকার করে দিয়ে বলছেন, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুনলমান নারী ইমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"[৩৫৮] ধর্মীয় ও সৎ কাজ করা ও তার প্রতিদান প্রাপ্তির অধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে অভিন্নতার কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার

অন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নারী ও পুরুষকে সমনির্দেশ দিয়ে বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ "মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে।"[৩৫৯]

---

[৩৫৫] সাইয়েদ সাবেক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.২৯৪
[৩৫৬] আল-কুরআন, ২ : ২২৯
[৩৫৭] আল-কুরআন, ৪ : ১২৪
[৩৫৮] আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫
[৩৫৯] আল-কুরআন, ৯ : ৭১

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.)- এর যুগে হযরত আউস ইবনে সামিত ও তার স্ত্রীর মধ্যে সংঘটিত ঘটনায় তার স্ত্রী খাওলা বিনতে সালাবা এ অধিকার চর্চায় যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা প্রতিটি নারীর জন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঘটনাটি নিম্নরূপ;

হযরত আউস ইবনে সামিত একদা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে স্ত্রী খাওলা বিনতে সালাবা অস্বীকৃতি জানালেন। আউস রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীর সাথে জিহার[৩৬০] করল। খাওলা রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আউস এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে জিহার করলো অথচ তার থেকে আমার কয়েকটি ছেলেপুলে আছে। এদেরকে যদি তার কাছে সমর্পণ করি, তা হলে সে নষ্ট করে ফেলবে। আর যদি আমার কাছে রাখি, এরা উপবাস থাকবে। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সিদ্ধান্ত কি? রাসূল (সা.) বললেন, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (এটা কি করে সম্ভব) সে তো 'তালাক' শব্দ উল্লেখ করেনি। সে আমার সন্তানের পিতা এবং আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে পুনরায় বললেন, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। সেও তার কথা পুনরাবৃত্তি করলো। এভাবে রাসূল (সা.) এবং খাওলা নিজ নিজ কথা পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তখন জাহিলী যুগের এ পদ্ধতি 'তুমি আমার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়' বা এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করলেই তালাক হয়ে যাবার পদ্ধতি বাতিল করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন।"[৩৬১] এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ বলেন- "আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে । আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৩৬২]

চিত্তবিনোদনের অধিকার

চিত্তবিনোদন প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। মানুষ যন্ত্র নয়, যান্ত্রিকভাবে তার সারাটি জীবন পরিচালনা সত্যিই দুরূহ ও কঠিন ব্যপার। তাই ইসলাম বৈধ পন্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েরই চিত্তবিনোদনের অধিকার প্রদান করেছেন। রাসূল (সা.) এর যুগে নারীরা এ অধিকার ভোগ করেছেন বিভিন্নভাবে। এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো :

ক. স্বামী-স্ত্রী এক সাথে চলাফেরা :

নবী করীম (সা.) স্ত্রীকে বাদ দিয়ে দাওয়াত রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন বলেও প্রমাণ রয়েছে।

'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এক পারসিক প্রতিবেশী, যে ভাল গোশত রান্না করতে পারতো, তাঁর জন্য তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে দেখিয়ে বললেন, সে আমার সাথে যাবে না? আগন্তুক বললো, জ্বি না। রাসূল (সা) বললেন, তা হলে আমিও যাবো না। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল (সা.) বললেন, আয়েশা আমার সাথে যাবে না?সে বললো, জ্বি না। রাসূল (সা.) বললেন, তবে আমি যেতে পারছি না। লোকটি পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল

---

৩৬০ আউস বললো: 'তুমি আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়।' জাহিলী যুগে স্ত্রীকে এ জাতীয় কথা বললে এটাকে তালাক হিসেবে ধরে নেয়া হতো। পরবর্তীতে তাদের এ ধারণা বাতিল করে এ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। সূরা মুজাদালার ১-৪ আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩৬১ শায়খ মুহাম্মদ আলী-সাবুনী, *সাফওয়াতুত তাফসীর*(কায়রো : দারুস সালাম লিত তিবাআতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওজী, ১ম সংস্ক., ১৯৯৬ খৃ.), খ.৩, পৃ.১৪৭২

৩৬২ আল-কুরআন, ৫ : ১

Dhaka University Institutional Repository

(সা.) বললেন, আয়েশা কি যাবে? এভাবে তৃতীয়বারে লোকটি বললো, জ্বি হ্যাঁ। এরপর তাঁরা উভয়ে উঠলেন। লোকটি গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন।[৩৬৩]

হরত আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) যখন কোন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো তিনি তাকে সাথে নিতেন।"[৩৬৪]

খ. ঈদ উৎসব পালন

ঈদের দিন খুশির দিন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এই দিনে আনন্দ করতে চায়। মেয়েরা যেন এ দিনটিকে ভালভাবে উপভোগ করতে পারে সে জন্য ইসলাম তাদেরকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতিই শুধু প্রদান করে না বরং নির্দেশ প্রদান করে, স্বীকৃতি দিয়েছে খেলাধূলা উপভোগের। হযরত উম্মু আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা.) (ঈদেন দিন) আমাদেরকে বাইরে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।"[৩৬৫]

উম্মুল আতিয়াহ (রা.) এর অন্য এক বর্ণনা উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিন বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলারা বেরিয়ে পুরুষদের পিছনে বসে থাকতো। তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর দিতো। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন "ঈদের দিনে কিছু হাবশী চামড়ার তৈরি ঢোল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিলো। আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞিস করলে বা তিনি নিজেই বললেন, তুমি কি এই খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার গাল রাসূল (সা.) এর গালের সাথে মিলানো ছিল তিনি বলছিলেন, হে বনী আরফেদাহ। তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। অবশেষে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলে যাও।"[৩৬৬]

গ. সম্বর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ

সম্বর্ধনা সভায় অংশগ্রহণের কাউকে সংবর্ধিত করার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

"হিজরতের দিন আমরা রাতে মদীনায় এলাম। নারী-পুরুষ সকলে ঘরের ছাদে উঠেছিল। বালক ও খাদিমরা রাস্তায় বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়ে ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! শ্লোগান দিয়ে রাসূল (সা.) কে সংবর্ধনা জানাচ্ছিল।"[৩৬৭]

ঘ. বিয়ে উৎসবে অংশ গ্রহণ

চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বিয়ের উৎসবে অংশ গ্রহণ। পুরুষ যেমন এ জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনন্দ-ফুর্তি লাভ করে, একঘেয়েমী দূর করে, তেমনি নারীকেও ইসলাম এ অধিকার প্রদান করেছে। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক বিবাহ

---

[৩৬৩] মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ। উদ্ধৃতি : সম্পাদনা পরিষদ, ইসলাম ও মানবাধিকার, পৃ.১৯৭

[৩৬৪] বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

[৩৬৫] বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন ।

[৩৬৬] বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

[৩৬৭] মুসলিম। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মজলিস থেকে নারী এবং শিশুদেরকে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়'। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন।[৩৬৮]

স্বতন্ত্র নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠার অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে বাধা তো দেয়ই না বরং সংগঠন গড়ে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কাজকর্ম করার স্বাধীনতা ও ইসলাম নারীদের প্রদান করে। এসব সংগঠন নারীদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতে পারে। এ প্রশ্ন উঠানোর কোনই কারণ নেই যে, মহানবী (সা) খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীদের কোন সংগঠন ছিল না। কেননা যেসব কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগঠন গড়ে তোলা হয়, তখন সেসব কারণ ও অবস্থায়ই বিদ্যমান ছিল না। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় যে, সে সময় বিভিন্ন আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজনে নারীরা সমবেত হতেন এবং কোন সময় তাঁদের সমস্যাবলী সংঘবদ্ধভাবে নবী করীম (সা.) এর কাছে পেশ করতেন, আর তিনি সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান বাতলে দিতেন। এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে মহানবী (সা.) এর দরবারে হাজির হলেও সকলে একসঙ্গে কথা বলেননি। যেমন লক্ষ্য করা যায়–

তারা সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বাস্তব সমস্যাগুলি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমীপে পেশ করেছেন এবং এ সকল ক্ষেত্রে প্রথমে তারা তাহাদের মধ্যে নেত্রী নির্বাচন করিয়া তার মাধ্যমেই কথা বলেছেন।[৩৬৯] যেমন হযরত যায়েদ (রা.) এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) নেত্রী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হয়েছি। তাহাদের সকলেই আমার কথা বলেছে এবং আমি যে মত পোষণ করি তারাও সে মতই পোষণ করে।"[৩৭০]

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার :

প্রথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মই নারীর সকল অধিকারের সাথে তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকারকেও অস্বীকার করেছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার দিয়ে তাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–"পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী এ অংশ নির্ধারিত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ।"[৩৭১] এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার না দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু কথাটি যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অজ্ঞতা প্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ইসলাম নারীকে তার জীবনের সকল অধ্যায়ই অর্থনৈতিক সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছে। বিবাহের পূর্বে তার ভরণ-পোষণ

---

[৩৬৮] বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

[৩৬৯] সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.), খ.৩, পৃ.৮৮৮

[৩৭০] আল- ইসতীয়ার। উদ্ধৃতি, মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৭

[৩৭১] আল-কুরআন, ৪: ১১

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদির ব্যাপারে যাবতীয় খরচ করার দায়িত্ব তার পিতার আর বিবাহের পর এ দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় তার স্বামীর উপর। উপরন্তু বিবাহের পর নারীর তার স্বামীর নিকট থেকে 'মোহর' পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যা পুরুষের নেই।

আর এভাবেই ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে তাকে মর্যাদাবান করেছে।

নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের অধিকার

পুরুষদের মত নারীরও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। এই সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণ পাওয় যায়। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাফে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লোকদের সমবেত করার জন্য "হে মানব মণ্ডলী' বলে সম্বোধন করতেন, তখন হযরত উম্মে সালামা (রা.) ও উক্ত সামবেশে অংশগ্রহণ করতেন। যদি কেহ তাকে সমাবেশে যোগদান করা হতে এই বলিয়া নিষেধ করতেন যে, 'হে মানব মণ্ডলী' বলে তিনি তো শুধু পুরুষদেরকে আহ্বান জানাইয়াছেন, মেয়েদেরকে আহ্বান করেন নাই, তখন তিনি তাহাদেরকে জবাব দিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'হে মানব মণ্ডলী' বলে সম্বোধন করেছেন । আমিও মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত (এইখানে নারীও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই)।"[৩৭২]

নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেছিলেন আমার ইদ্দাত পূর্ণ হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেলাম। তিনি ঘোষণা করছেন , (মুয়াজ্জিন আযানের সহিত আস-সালাতু জা'মেয়া বললে এর অর্থ হত নামযের সহিত সাধারণ সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে)। সুতরাং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সহিত নামায আদায় করলাম। আমি পুরুষদের কাতার সংলগ্ন মেয়েদের কাতারে ছিলাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি মসজিদে গমনকারী লোকদের সহিত মসজিদে গেলাম। মেয়েদের যে কাতারটি পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের পিছনে ছিল আমি সেই কাতারে ছিলাম। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা দিলেন।"[৩৭৩]

হযরত জয়নাব বিনতে মোহাজির হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি হযরত আবু বাকর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, জাহিলী যুগের অবসানের পর আল্লাহ্ আমাদের যে চমৎকার দীন দিয়েছেন তার উপর আমরা কত দিন টিকে থাকতে পারব? তিনি বললেন, তোমাদের নেতারা যত দিন পর্যন্ত তার উপর অবিচল থাকবে তত দিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। সে বলল, নেতা আবার কি? তিনি বললেন, তোমার কাওমে কি এমন সব প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নাই যারা আদেশ দিলে তারা মেনে নেয়? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, তারাই জনগণের নেতা।[৩৭৪]

ইসলাম নারীকে অজ্ঞ বা মূর্খ থাকার অনুমতি দেয়নি, বরং ফরয করা হয়েছে তার জন্যে জ্ঞান-অর্জনকে। নারী তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে কখনো যদি শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কোন ভুল বা অসঙ্গতি দেখতে পায় তবে এ ব্যাপারে সে সঠিক পরামর্শ রাখতে পারে।

---

[৩৭২] মুসলিম, প্রাগুক্ত , খ. ৭,পৃ. ৮৩

[৩৭৩] প্রাগুক্ত,খ. ৮, পৃ.২০৫

[৩৭৪] উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ.৯০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে রাজনীতির মৌলিক একটি কথা হল 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আ'নিল মুনকার' আর এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সবাই সমান। মজার ব্যাপার হল এ ব্যাপারে মহানবীর (সা.) মহিলা সাহাবাগণ কোন ক্রমেই পিছিয়ে ছিলেন না।

মহিলাগণও যেহেতু রাষ্ট্রের নাগরিক তাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের ভাল–মন্দ কাজের ফলাফল বা প্রভাব থেকে তারাও মুক্ত হতে পারবে না। তাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদেরও অধিকার রয়েছে 'জালিম' শাসককে হটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু একজন নেতা নির্বাচনের আন্দোলনে শরীক হওয়ার। এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ইসলামী চিন্তা চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে কাজ শুরু করতে পারে।

নারীর সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার অধিকার

নারী পুরুষের মতই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সমাজের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশের ও পরামর্শ দানের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। হযরত হাসান বসরী নবী (সা.) এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন এভাবে "নবী (সা.) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করতো যা তিনি গ্রহণ করতেন।"[৩৭৫] সরকারের সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নারী দায়িত্ব পালন করতে পারে। নারীর সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে সরকারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন,

"মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও মারওয়ান হতে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাকে সমর্থন করে। তারা উভয়ে বলেছেন হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা.) যাত্রা করলেন, এর পর সুহায়েল ইবনে আমর এসে বলল, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) লেখক ডাকলেন এবং বললেন -লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই কথা শুনে সুহায়েল বলল আল্লাহর শপথ! রহমান কি আমি জানি না। আপনি বরং 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে বলুন। তখন মুসলমানরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ছাড়া কিছুই লিখব না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা আমাদের ও বাইতুল্লাহর মাঝে বাধা হবে না। যাতে আমরা তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম! এইরূপ হলে আরববাসী বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এই শর্ত মেনে নিয়েছি। আমরা বরং আগামী বৎসরের জন্য এই শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই লিখলেন। সুহায়েল বলল, আমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি আপনার নিকট (মদীনায়) চলে যায়, সে আপনার দীনের অনুসারী হলেও তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। মুসলিমনরা সকলেই (এই প্রস্তাবে) বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ। যে মুসলিম হয়ে চলে আসবে তাহাকে কিভাবে প্রত্যর্পণ করা যাবে? হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর নকিট গিয়ে বললাম, আপনি কি সত্যই আল্লাহর নবী? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম তাহলে কেন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীন শর্ত মেনে নেব? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আমি বললাম, আপনি কি বললেন না যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লায় যাব এবং তাওয়াফ

---

[৩৭৫] সাইয়িদ জালালালুদ্দীন আনসারী উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলেছিলাম। তবে কি আমি বলেছিলাম যে, আমরা এই বৎসরই তা করব? তিনি বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, এখন গিয়ে তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুণ্ঠন করে লও। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! কেউ উঠল না, এমনকি তিনি তিনবার এই কথা বললেন। যখন তাদের কেউ উঠল না তখন তিনি উম্মে সালামার নিকট গেলেন এবং তাকে সাহাবাদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি চান তাহলে কারো সাথে কোন কথা না বলে প্রথমে নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং মাথা মুণ্ঠন করে ফেলুন। এর পর তিনি চলে গেলেন এবং কারও সাথে কোন প্রকারের কথা না বলো উম্মে সালামা যা বলেছিলেন তা করলেন। তিনি নিজের কুরবানীর পশু জবাই করলেন এবং পরস্পরের মাথা মুণ্ঠন আরম্ভ করল।"[৩৭৬]

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেছেন , আমি একদিন উম্মুল মুমিনীন হাফসার (রা.) নিকট গেলাম। সে সময় তার চুল হতে পানি ঝড়ছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন খেলাফতের বিষয়টি নিয়ে লোকজন কি কাণ্ড করছেন। (হযরত আলী (রা.) হযরত আমীরে মুয়াবিয়াহ (রা.) এর বিবাদের প্রতি ইংগিত) শাসন কর্তৃত্ব ও ইমারতের কিছুই আমাকে দেয়া হয় নাই। হযরত হাফসা (রা.) বললেন, তুমি গিয়ে তাদের সহিত শরীক হও তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি নিজেকে তাদের হতে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বার বার বলায় তিনি (আবদুল্লাহ ইবন উমর) যেতে বাধ্য হলেন।"[৩৭৭]

খাটে করে লাশ নেয়ার পদ্ধতি ইসলামের প্রথম দিকে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। হযরত আসমা বিনতে উমাইশ (রা.) আবিসিনিয়ায় খৃষ্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেন। পরবর্তীতে তিনি পরামর্শ দেন এবং তা গৃহীত হয়।[৩৭৮]

উমর (রা.) ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহিলাদের সাথে পরামর্শ করতেন। ইবন শিরীন হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন 'উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে উমর (জ্ঞানী লোকদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমন কি (সে সব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামতে কোন কল্যাণকর দিক থাকলে বা কোন উত্তম বিষয় দেখলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।"[৩৭৯]

আল্লামা ইবনে আবদিল বার শিফা বিনতে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন, তাঁকে তিনি সন্তুষ্ট রাখতেন এবং (অন্যদের তুলনায়) বেশি মর্যাদা দিতেন।[৩৮০]

সরকার নির্বাচনে নারীর অধিকার

---

[৩৭৬] উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ৮৯৬

[৩৭৭] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৮৭

[৩৭৮] সায়্যিদ জালালুদ্দীন আনসার উমারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩

[৩৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪

[৩৮০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র বা সরকার নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পরামর্শ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন হযরত হাফসা (রা.) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে উদ্বিগ্ন হয়ে স্বীয় মতামত তার ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) কে প্রদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে,

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন, একবার আমি হযরত হাফসার (রা.) ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা (পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করেন নাই? আমি বললাম, তিনি তা করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি তা করতে পারেন। ইবন উমর (রা.) বললেন, এর পর আমি এই ব্যাপারে আব্বাস এর সহিত কথা বলব বলে তাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলাম।[৩৮১]

জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশ নেয়ার অধিকার

ইসলামী শরী'আত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও হিফাযত তথা জাতীয় নিরপত্তার দায়িত্ব নারীর কাঁধে অর্পন করেনি বটে, তবে নারী যদি এ জাতীয় ক্ষেত্রে অংশ নিতে চায়, এ অবস্থায় ইসলাম তাকে সে অধিকার দেয়। মহানবী (সা.) এর যুগে মুসলিম নারীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের খাবার তৈরি করা, যুদ্ধাহত লোকদের সেবা-শুশ্রুষা করা বা ঘোরতর প্রয়োজনে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নারীরা প্রমাণ করেছেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ভূমিকা পালনে তারা কোনক্রমেই পিছিয়ে নেই।

এক আনসারী মহিলা সাহাবী উম্মু আমরা উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের মত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন্ সা'দ ইবনে রাবীর কন্যা উম্মু সা'দ তাঁকে তাঁর এ কৃতিত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এভাবে বর্ণনা করেন "আমি মুজাহিদীনের সেবা ও সহযোগিতার জন্য খুব সকালেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছি। প্রথমে মুসলিমরাই বিজয় লাভ করলো। কিন্তু পরে এই অর্জিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা বিশৃঙ্খল ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন আমি নবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রক্ষা করার জন্য তীর ও তরবারী চালাতে লাগলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আমার উপর শক্রর আঘাত এসে পড়লো। আমি তাঁর কাধের উপর গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে কঠিন আঘাত করেছিল?

তিনি বললেন, এ আঘাত করেছিল ইবনে কিমআহ। আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন। পরাজিত হয়ে মুসলমানরা নবী (সা.) এর আশপাশ থেকে যখন সরে পড়লো, তখন সে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসলো, বললো মুহাম্মদ কোথায়? এ যুদ্ধে সে বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তার জীবিত থাকা আমার জন্য ধ্বংস ও মৃত্যুর শামিল। এ কথা শুনে আমি নিজে, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং আরো ক'জন সাহাবা তার মুকাবিলা করলাম। আমরা ক'জনই নবী (সা.) এর পাশে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলাম। সম্মুখ মুকাবিলার এ মুহূর্তেই সে আমার ওপর আঘাত করে। সে আঘাতের ক্ষতচিহ্নই তুমি দেখতে পাচ্ছ। তরবারী দিয়ে আমিও তাকে কয়েকটি আঘাত করলাম। কিন্তু আল্লাহর দুশমন দু'দুটি লৌহবর্ম দ্বারা তার দেহ সুরক্ষিত রেখেছিল।"[৩৮২]

---

[৩৮১] মুসলিম, : নেতৃত্ব অধ্যায়। উদ্ধৃতি : সায়্যিদ জালালুদ্দীন আনসার উমারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

[৩৮২] সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সা.) এর জীবন রক্ষায় যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, নবী (সা.) নিজে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে "ডানে ও বায়ে যেদিকেই আমি তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই দেখছিলাম, উম্মু আমারা আমাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছে।"[৩৮৩]

উম্মু আমারার ছেলেকে একজন আহত করে ফেললো। সে যখন তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডেকে বললেন, উম্মু আমারা, এ লোকটিই তোমার ছেলেকে আহত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে উম্মু আমারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে এত জোরে তাকে আঘাত করলেন যে, সে সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নবী (সা.) মুচকি হেসে বললেন, উম্মু আমারা, তুমি তোমার ছেলের প্রতিশোধ নিয়েই ফেললে! এরপর উম্মু আমারা তাকে তীর বর্ষণ করে ধ্বংস করে ছাড়লেন। এ অবস্থা দেখে নবী (সা.) সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তোমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন, তোমার কলিজা ঠান্ডা করেছেন এবং তোমার ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তোমাকে দিয়েছেন।

উম্মু আমারা (রা.) আরো একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"এক বড় যোদ্ধা এগিয়ে এসে আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলো। আমি ঢাল দিয়ে তা ঠেকিয়ে ব্যর্থ করে দিলাম। যখন সে পালাতে উদ্যত হলো তখন আমি তার ঘোড়ার উপর আক্রমণ করে তার পা কেটে ফেললাম। সে তখন চিৎ হয়ে পড়ে গেল। নবী (সা.) সবকিছু দেখছিলেন। তিনি আমার ছেলেকে ডেকে বললেন, উম্মু আমারার ছেলে যাও, তোমার মাকে সাহায্য কর। তখন সে দ্রুত এগিয়ে আসলো। তার সাহায্যে আমি তাকে মৃত্যুর দুয়ার পৌঁছে দিলাম। সেদিন তাঁর সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দেখে নবী (সা.) বললেন "নুসাইবা বিনতে কা'বের (উম্মু আমারা) আজকের দৃঢ়তা ও ধৈর্য অমুক ও অমুকের দৃঢ়তা ধৈর্য থেকে উত্তম প্রমাণিত হয়েছে।"[৩৮৪]

হযরত আনাস (রা.) এর মা উম্মু সুলাইম (রা.) উহুদের যুদ্ধে খঞ্জরসহ রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলেন।[৩৮৫]

রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের স্ত্রী উম্মু হাকীম শরিক হয়েছিলেন। আজনাদাইনের যুদ্ধে ইকরামা (রা.) শাহাদাত লাভ করার কয়েকদিন পর 'মারজে সিদার' নামক স্থানে খালিদ বিন সাঈদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের দ্বিতীয় দিন খালিদ ইবনে সাঈদ ওয়ালীমার আয়োজন করলেন। লোকজন তখনো খাওয়া দাওয়া শেষ করতে পারেনি। এমন সময় রোমানরা যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা শুরু করে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে নববধূর সাজে সজ্জিতা উম্মু হাকীম তাঁর তাঁবুর একটি মোটা দণ্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাই শত্রু সেনাদের সাত জনকে হত্যা করেন।[৩৮৬]

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এর হাতে নয় জন রোমানকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল।[৩৮৭]

---

৩৮৩ প্রাগুক্ত।
৩৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭
৩৮৫ মুহাম্মদ বিন সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৬
৩৮৬ সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮
৩৮৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনী পরাভূত হয়ে পড়লে কয়েকজন অসম সাহসী যোদ্ধার সাথে হারিসা নাম্নী এক মহিলা পাহাড়ের মতো অটল হয়ে যুদ্ধেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[৩৮৮]

শত্রুর মুকাবিলায় নারীরা প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু অংশগ্রহণ করেছেন, পরোক্ষভাবে করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। যুদ্ধরত সৈনিকদের অনুপ্রেরণা যোগানো, আহত যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা, তাদের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের চেয়ে কম নয়।

রাবাইয়ি বিনতে মু'আওয়াজ (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমরা নবী (সা.) এর সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে যেতাম। সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং যুদ্ধে নিহত ও আহতদের মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।[৩৮৯]

উম্মু আতিয়া (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সেখানে আমি মুজাহিদদের জিনিসপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ওষুধ ও পথ্য দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রুষা করতাম।[৩৯০]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মু সুলাইম (রা.) মুজাহিদদের সেবা করেছিলেন। আনাস (রা.) এর ভাষা নিম্নরূপঃ

"আমি আবূ বকরের কন্যা আয়েশা (রা.) এবং উম্মু সুলাইম (রা.) কে প্রস্তুত হয়ে মানুষের সেবা করতে দেখলাম। (তারা এত দ্রুত এ তৎপরতা চালাচ্ছিলেন যে,) আমি তাঁদের পায়ে পরিহিত খাড়ু সমূহ দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা মশকে পানি ভরে তা কাঁধে বহন করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আবার ভর্তি করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পিপাসা নিবৃত্ত করছিলেন[৩৯১]।"

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন, "বহু মুসলিম মহিলা নবী (সা.) এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[৩৯২]

খায়বারের যুদ্ধে আবু রাফে'র স্ত্রী সালমা, আশহাল গোত্রের এক মিহলা উম্মু আমের, এক আনসারী মহিলা উম্মু কারা এবং কুতাইবা বিনতে সা'দেরও অংশগ্রহনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে নারী ও পুরুষ দুভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ছাড়া যেমন মানব জাতির পূর্ণতা সম্ভব নয়, নারী ছাড়াও তেমন এর পূর্ণতা অসম্ভব। এরা একে অন্যের পরিপূরক। আর এ কারণেই ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষর মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেনি।

মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ সমান এ কথা যেমন সত্য, এরা মানব জাতির দুটি ভিন্ন অংশ এ কথাও তেমন সত্য। এদের শারীরিক গঠন ও আকৃতি যেমন ভিন্ন, এদের মানসিক অবস্থা ও তেমনই ভিন্ন।

---

[৩৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯

[৩৮৯] বুখারী ,প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ। উদ্ধৃতি : সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ২০৭

[৩৯০] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

[৩৯১] বুখারী। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

[৩৯২] সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম হিসেবেই নারী পুররুষের আকৃতি-প্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে।

প্রকৃতিগত কারণেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য। আর এই বিপর্যয় রোধ করতেই ইসলাম একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীকে-নারী, পুরুষকে পুরুষ হিসেবেই তাদের স্ব-স্ব স্থানে মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। আর এভাবেই ইসলাম উভয়ের কাছ থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত কর্তব্য আশা করে। এই গণ্ডির মধ্যে থেকেই উভয়কে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভের সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে। নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে থেকে উভয়ে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে তা সমান মর্যাদার দাবী রাখে। পুরুষত্বে যেমন কোন আভিজাত্য নেই, নারীত্বে ও তেমনি কোন অপমান নেই।

ইসলাম কখনো নারীর অযৌক্তিক অবরোধ সমর্থন করে নি। শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধ বজায় রেখে নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে কোন নিষেধ নেই। পর্দা বা শালীনতার মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর দেয়া সকল অধিকারকে ভোগ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, আজকের সমাজে যারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে নারী সমাজকে তথাকথিত প্রগতির নামে উচ্ছৃংখলতার দিকে নিয়ে আসছে তারা নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'সম্মান' নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও প্রকারান্তরে কেড়ে নিতে চাচ্ছে।

ইসলাম নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছে বিশেষ করে মহানবী (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারীদের যে অধিকারের ঘোষণা প্রদান করেছেন এবং মহানবী (সা.) এর যুগে নারীরা যে অধিকার সমূহ ভোগ করেছেন বর্তমান কালেও নারীরা সে অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলে আবার এ সমাজ সুখী ও ভারসম্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে, নারীরা কেউ যুলুমের শিকার হবে ন। তাই বিশ্বের প্রত্যেক মুসলিম নারীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার সকল নারীর সামনে উপস্থাপন করে জনমত গঠন করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে সমঅধিকার প্রসঙ্গে

সমান অধিকার হচ্ছে মূলত সুযোগ সুবিধার সমতা(Equality of pportunity). জন্মগতভাবেই মানুষ এক ও ভিন্ন। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই সমান এবং সমপর্যায়ভূক্ত। মানুষের প্রতি সম্মান বোধ এবং মানুষে মানুষে অভিন্ন নীতি ইসলামী আদর্শের এক অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার ইসলামী সাম্যের তাৎপর্য হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান এবং প্রত্যেকে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার পাবে। কারো প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। শুধু নীতিগতভাবেই নয়, ব্যবহারিক বাস্তবতার মাধ্যমেও ইসলাম প্রমান করেছে যে সাম্য ইসলামের মৌলিক নীতি। ইসলামী ব্যাবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

কেবল মাত্র সাম্যের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয় নি বরং যেসব কারণে মানুষে মানুষে হিংসা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হতে পারে তাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাইতো মদীনা সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের পারস্পারিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধানের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম। মদিনার সনদে অনুচ্ছেদ ১৫ তে বলা হয়েছে "আল্লাহর নিরাপত্তা সামগ্রিক। সম্প্রদায়ের একজন নগণ্য সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাও যুক্তভাবে সবার জন্য পালনীয়। অন্য মানুষের বিপক্ষে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মাওলা বা সহযোগী।" 'বানূ আউফ গোত্রে ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ নাজ্জার, বানূ হারিছ বানূ সা'ইদা, বানূ জুশাম, বানূ আউস এবং বানূ ছা'লাবা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।"

আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ তার কাছে সকলেই সমান। ইসলাম মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য বিধান করেছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন' হে মানব মণ্ডলী তোমাদের প্রভূ এক, তোমাদের পিতা এক জন। তোমরা প্রত্যেকে আদমের সন্তান অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্টত্ব নেই।[৩৯৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে দাস-দাসীর অধিকার প্রসঙ্গ

প্রাক ইসলামী যুগে দাস-দাসীর অবস্থা ছিল খুবই করুন। পণ্য দ্রব্যের মত দাস-দাসীও হাটে বাজারে বিক্রি করা হত। তাদের কোন প্রকার অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল না। দাসীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করা হত। মনিব তাকে ইচ্ছামাফিক ভোগ করত, অপরকে উপহার দিত। মোট কথা, মনিবের মর্জির উপর তাদের জীবন পরিচালিত হত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যক্তি জীবন ছিল দাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রচন্ড বিদ্রোহ। মহানবী (সা.)- এর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে দাস-দাসীদের অধিকার নিশ্চিত করণে ঘোষণা করেন–"তোমরা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পড়বে তাদেরও তাই পরিধান করাবে। যদি তারা অমার্জনীয় কোন অন্যায় করে ফেলে তাহলে তাদেরকে অন্যত্র বিক্রি করে দাও। তাদেরকে নির্যাতন করবে না।"[৩৯৪] তায়েফবাসীদের সাথে কৃত চুক্তি পত্রে ক্রীতদাসের অধিকার এর কথা বলা হয়েছে- তাদের কাছে যদি এমন কোন বন্দি বা ক্রীততাস থাকে- যাকে তার মুনিব বিক্রি করে দিয়েছে, তা হলে তার সে বিক্রি বিশুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে সব বন্ধীকে বিক্রি করা হয় নাই , তাদের মুক্তিপণ হবে ছয়টি উটনী যা দুটি কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।" এখানে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের চেতনা হচ্ছে- 'দাস-দাসীর অধিকার।'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে 'তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পড়বে তাদেরকেও তাই পরিধান করাবে' এই নির্দেশ দিয়ে বলেন মনে রেখো তারাও

---

[৩৯৩] *বায়হাকী*, শু'আবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৯২১

[৩৯৪] ইবনে সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ১৮৫। উদ্ধৃত, আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ.) অনুবাদ ও সম্পাদনা মাও- মুহিউদ্দিন খান(ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৭ম সংস্ক,১৪২১ হি./২০০০খৃ.), পৃ. ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মতো মানুষ । এই তাগিদ দিয়ে ক্রীতদাসকে শুধু সামাজিক মর্যাদাই দেননি সেই সঙ্গে প্রকারান্তরে দাস প্রথার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। দাস-দাসীদের এই অধিকার মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা সহ আন্তর্জাতিক কনভেনশনে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন–মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় মানুষকে দাসত্বে অথবা গোলামিতে আবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ক্রীতদাস প্রথাও দাস ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলে দাস-দাসীর অধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন (Universal Declaration of Human Rights) ঘোষণার ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসত্বে (Slavery) অথবা গোলামীতে (Servitude) আবদ্ধ রাখা যাবে না, এবং সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ।"[৩৯৫]

মহানবী (সা.) দাস-দাসীদের অধিকার এবং জবরদস্তিমূলক অথবা বাধ্যতামূলক (Compulsory) শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা স্থান পেয়েছে, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি International Convention Civil and Political Rights) এর ৮ নং অনুচ্ছেদে।[৩৯৬] যেমন বলা হয়েছে-

(১) কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস রূপে ধরে রাখা চলবে না, সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা (Slavery) এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হবে।

(২) কাহাকেও বশ্যতায় (servetude) আবদ্ধ রাখা চলবে না।

(৩) (ক) কোন ব্যক্তির নিকট হতে জবরদস্তিমূলক (compulsory) শ্রম আদায় করা যাবে না।

(৩)/খ. পরিচ্ছেদের অর্থ এই নয় যে, সে সব দেশে কোন অপরাধির শাস্তি হিসাবে কঠোর পরিশ্রমসহ কারাবাস আরোপ করা হয়, সেই সব দেশে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ করাদন্ডের আদেশ অনুসারে কঠোর পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ।

আবার মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন (The Eropean convention on Human Rights)[397] এর ৪ নং অনুচ্ছেদে এ দাস প্রথা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

(১) কোন ব্যক্তিকে দাসত্বে (alavery) বা বশ্যতায় (servitude) আবদ্ধ করা চলবে না।

(২) কোন ব্যক্তির নিকট হতে জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রম" বলতে নিম্নোক্ত কোন কাজকে বুঝাবে না

---

৩৯৫ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

৩৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

৩৯৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) এই কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে আরোপিত সাধারণ আটকাদেশের অধীনে অথবা অনুরূপ আটক হতে শর্তাধীনে মুক্তি পাওয়া অবস্থায় যে কাজ করা আবশ্যক

(খ) যে কোন রূপ সামরিক কাজ (military service) অথবা যেসব দেশে বিবেকজনিত আপত্তির conscentious objection (বিবেকের দোহাই দিয়ে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার) নীতি স্বীকৃত সেইসব দেশে অনুরূপ আপত্তিকারকদের ক্ষেত্রে, বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের পরিবর্তে অন্য যে কাজ আদায় করা হয়

(গ) সম্প্রদায়ের জীবন ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি হুমকি প্রদান করে এমন কোন জরুরী অবস্থায় বা বিপর্যয়কালে যে কাজ আদায় করা হয়

(ঘ) স্বাভাবিক পৌর দায়িত্বের (civil obligations) অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজ অথবা সেবা (service)।

মানবতার জন্য কলংকময় ক্রীতদাস প্রথা

সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক অসাম্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে দাস প্রথার জন্ম দিয়েছে। সেই থেকে একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর, সবলকে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে। যার পরিণতিতে সমাজে দেখা দিল দাসত্ব ও প্রভুত্ব অর্থাৎ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্র্যের উপর ধনীর শোষণ, শাসিতের উপর শাসকের নিপীড়ন।

দাস প্রথা প্রমাণ করে যে সমাজ ব্যবস্থার এক স্তরে বহুসংখ্যক মানুষের শ্রমের উপর জীবন যাপন করে এক শ্রেণীর পরশ্রমভোগী ক্ষমতাশালী মানুষ। দাসদের শ্রমকে পুঁজি খাটিয়ে তারা মুনাফা লুটে, তাদের শ্রমকে শোষন করে তারা সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করে।

পরাধীনতার গ্লানি আর নিজের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে যাদের জীবন প্রভুর পদতলে সমর্পিত থাকে সে সকল দুর্ভাগা বঞ্চিত মানুষকে দাস বা ক্রীতদাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বস্তুত: দাসপ্রথা হচ্ছে এমন একশটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার মালিক একশ্রেণীর মানুষের হাতে কুক্ষিগত থাকে অন্যএক শ্রেণীর মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, শক্তি, সামর্থ প্রভৃতি। এক পক্ষ হচ্ছেন প্রভু, অন্য পক্ষ হচ্ছেন দাস। দাসদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। দাসরা প্রভুর ইচ্ছায় ও খেয়াল খুশীমত জীবিকা নির্বাহ করবে। প্রভুর নির্দেশ পালনই হবে দাসদের জীবনের একমাত্র ব্রত। দাসরা পণ্য সামগ্রির মতই ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। মানবেতর প্রাণী, কি তার চেয়েও অধম বিবেচনা করা হয় দাস-দাসীকে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও কলঙ্কজনক ঘটনা হচ্ছে দাস প্রথা। দাস প্রথা যতটা কলঙ্কজনক তার চেয়েও জঘন্য এবং লোমহর্ষক ব্যবস্থা হচ্ছে দাস ব্যবসা। মানুষ, যাকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব, তাকে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসার পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; এটা কল্পনারও অতীত। অথচ এই ব্যবস্থাটাই চলেছে দীর্ঘদিন ব্যাপী।

মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের পূর্বে ক্রীতদাস-দাসীদের অবস্থা এমনও ছিল যে, একটি ক্রীতদাস বা দাসীর একাধিক মালিক ছিল। শরীকরা যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের ওয়ারিশ হতো ঠিক তেমনি ক্রীতদাসীদে উত্তরাধিকারী হত। যেহেতু ক্রীতদাসদের সম্পদ জ্ঞান করা হত সেহেতু তারা ওয়ারিশের অংশ হয়ে যেত। এভাবে কোন একটি দাসের একটি অংশ যদিও বা আজাদ হয়ে যেত তখন অংশীদারের অধিকার হতে তারা মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ক্রীতদাসরা আজাদ বা স্বাধীন হতে পারত না। "মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্বে পৃথিবীর যে শহরগুলোতে কথিত সভ্যতার জোয়ার এসেছিল, সেখানেই ক্রীতদাস-দাসীদের ব্যবহার এতই জঘন্ন ছিল যে, উহার সংকলিত ইতিহাস আর একটি আলাদা পুস্তকে পরিণত হবে।"[৩৯৮]

ইসলামের অর্থাৎ কোরআনের আবির্ভাবের পূর্বে 'প্যাগন' সমাজ থেকে খ্রিস্টান সম্রাটদের কাছ থেকে যে দাস প্রথা আসে তাতে দুটো বিদ্রুপাত্মক বৈশিষ্ট্য ছিল। এর একটি ছিল দাসদের বিবাহের আইনগত স্বীকৃতির অনুপস্থিতি এবং অপরটি ছিল তাদের উপর মনিবদের অত্যাচার করার অধিকার।[৩৯৯]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগে ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান সমাজে দাস প্রথার প্রচলিত ব্যবস্থায় বহু দাসকে মনিবের হালের বলদ হিসেবে কায়িক ও কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে হতো।

ক্রীতদাস মানুষগুলোকে মনিবরা তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হাটে বাজারে বিক্রি করে তাদের প্রয়োজন মিটাতো। ঐ বিক্রির ব্যাপারে এমন অমানুষিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হতো যা এতই হৃদয় বিদারক যে তা ভাবতেও মন শিহরে ওঠে।

বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটি ক্রীতদাস পরিবারের স্ত্রী-পুত্র ও স্বামী নিয়ে যে সংসার তা হতে মালিক প্রয়োজন মনে করলে সন্তানটি একজনের কাছে এবং সন্তানের মাকে একটি হাটে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দিত। বহুক্ষেত্রে মাকে অথবা দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে দুইজন ভিন্নলোকের কাছে বিক্রি করে দিত যাতে মা সন্তানহারা এবং শিশুটি মাতৃহারা হয়ে পড়তো।

বহুক্ষেত্রে বাজার হতে ক্রীতদাসী ক্রয় করে মনিবরা তাদের সাথে যৌন মিলন করতো। বহু যুদ্ধ ঐ সময় এ কারণেই হতো যাতে পরাজিতদের সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজয়ীরা ভোগ করতে পারে। এহেন ভোগের ব্যাপারেও মালিক বা মনিবরা 'আজল' নামক এক অমানবিক প্রক্রিয়ায় ক্রীত দাসীদেরকে যৌন মিলনের সাধ থেকে বঞ্চিত করে দিত। ঐ আজল প্রথার দ্বারা মালিকরা তাদের যৌন সাধ পরিতৃপ্তির সাথে সাথে তাদের পুরুষাংগকে তুলে নিয়ে বীর্যটুকু স্ত্রী অংগের বাইরে ফেলে দিত। এটা এ কারণে করত যাতে ক্রীত দাসীদের পেটে সন্তান আসতে না পারে। কারণ সম্পত্তিতে সন্তানটির উত্তরাধিকারী হওয়া মালিকরা ভাল মনে করতো না। যদি ক্রীত দাসীদের পেটে মনিবদের বীর্যে সন্তান প্রসব হতো তখন সন্তানকে মনিবরা বিক্রি করে দিত। অথবা প্রয়োজনবোধে ঐ দাসীকে অন্যত্র বিক্রি

[৩৯৮] মো: সিরাজুল ইসলাম, জেলা জজ, *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্ক. ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ২৪

[৩৯৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করা হত। ঐ রূপে ক্রীত দাসীকে আরবী ভাষায় ঐ সময়ে 'উম্মে ওলাদ' বলে অভিহিত করা হতো। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) এসে এ ধরনের বিক্রিকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

"প্রত্যেক মানুষই তার মনের মতো কাজ করতে চায়। মনের মতো কাজ চাইলেই পাওয়া যায় না, তার পরও মানুষকে তার নিজের ইচ্ছেমত পছন্দ করার অধিকার দিতে হয়। কাউকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজে খাটানো মানবিকতা বিরুদ্ধ। দাস প্রথার মধ্যে এসব অমানবিক বিষয়গুলো রয়েছে বলেই দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা অমানবিক প্রথা।"[৪০০]

দাস প্রথা ও বর্তমান বিশ্ব

সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মানুষ অর্জন করেছে অনেক কিছু। এক অসহায় মানুষকে উদ্ধারের জন্য ঝাপিয়ে পড়ে অন্য মানুষ। নির্যাতিত মানুষের অধিকারের জন্য চিৎকার করে ওঠে এই মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা যখন মানবতার জয়ধ্বনি তুলছি তখনও পৃথিবীর লোকচক্ষুর অন্তরালে দাসপ্রথা বহুদেশে বিদ্যমান। আগে যেভাবে মানুষ বিক্রি করা হতো হাটে বাজারে এখন হয়তো তেমনটি হয় না। কিন্তু একজন দাসকে যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে হতো অনেক লোক এখনও এই অবর্ণনীয় দুখঃ কষ্টের স্বীকার। দারিদ্র্যের অসহনীয় নিষ্পেষণে স্নেহের সন্তান বিক্রি, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দলিলে আবদ্ধ মানুষের লাঞ্ছনা, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি দাসত্বেরই নামান্তর।

এ প্রসঙ্গে গাজী শামছুর রহমান বলেন "উপনিবেশিকতার এক জঘন্য অভিশাপ হিসেবে দাসপ্রথা আজো আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নারীর অবস্থা তো আজো দাসির মতো। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা অধিকাংশ পরোক্ষ দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। অনেক দেশে এমনকি পশ্চিমের উন্নত দুনিয়ায়ও চাপের মুখে বা অসুবিধায় ফেলে নারীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে বহুদেশে ব্যাপক মুনাফা লাভ এবং বিপুল পরিমাণ কালো টাকা অর্জনের জন্য নারীদেহকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"[৪০১]

বর্তমান বিশ্বের প্রাচীন ও সনাতন ধর্মের অধিকারী ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে জাতের ও মতের এত বিভেদ বিদ্যমান যে উহা কোন অবস্থায় মানবতার অনুকূল নয়। ভারতে হরিজন সম্প্রদায়ভূক্ত মানব গোষ্ঠীকে বর্ণহিন্দুরা মানবতার মানদন্ডে বিচার করে না।

এ প্রসঙ্গে এ সিদ্দিকী কর্তৃক লিখিত "ধর্ম নিরপেক্ষ" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ভারতীয় দলিত হরিজনদের নেতা ডঃ বি, আর অম্বেদকরের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। ডঃ অম্বেদকর ১৯৩০-১৯৩১ সনে বিলেতের এক গোল টেবিল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– "১৯৩০ সালে একদল হরিজন রাজপুত্রদের মত পোশাক পরিয়ে তাদের এক বরকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিল। বর্ণ হিন্দুরা এটাকে 'অচ্ছুতদের ধৃষ্টতা' হিসেবে গণ্য করে তাদের প্রতি ১১টি নির্দেশ করেছিল।"[৪০২] নির্দেশগুলো হচ্ছে-

১. হরিজনরা হাঁটুর নিচে কাপড় পরতে পারবে না।

২. কোন হরিজন রমনী স্বর্ণালংকার পরিধান করতে পারবে না।

---

৪০০ প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪

৪০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪০২ এস, এ সিদ্দিকী "ধর্ম নিরপেক্ষ"। উদ্ধৃতি, মো: সিরাজুল ইসলাম জেলা জজ, *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. মেয়েরা তামা বা পিতলের পাত্রে পানি বহন করতে পারবে না। তারা কেবল মাটির কলসি ব্যবহার করবে।
৪. হরিজনদের ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করতে পারবে না।
৫. হরিজনদের ছেলেমেয়েরা কেবল বর্ণ হিন্দুদের পশু চরাবে।
৬. হরিজন নারী ও পুরুষরা বর্ণ হিন্দুদের নিকট হতে জমি ইজারা নিয়ে চাষাবাদ করতে পারবে না।
৭. বর্ণ হিন্দু জমিদারদের কাছে হরিজনরা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। অন্যথায় সেচের জন্য তাদের কোন পানি দেয়া হবে না।
৮. সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুরুষরা এবং মেয়েরা অনাহারে নিরাস মিরাসদার বর্ণহিন্দুদের কুলিগিরি করবে।
৯. অনুষ্ঠানাদিতে ভারতীয় কোন সংগীত ব্যবহার করা চলবে না।
১০. বরযাত্রা বা বিবাহ মিছিলে ঘোড়া ব্যবহার করা যাবে না। শুধু তাদের ঘরের দরজা পাল্কী হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। কোন অভিপ্রায়েই হরিজনরা যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না।

"বর্ণ হরিজনদের প্রতি এহেন বৈষম্যপূর্ণ আচরণ দেখে ভারতের একজন নাম করা সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার কর্তৃক লিখিত 'Why Harijon Embrace Islam' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "বর্ণ হিন্দুদের অমানবিক আচরনই খুঁজে পেয়েছে মানবতার ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যায়ন।"[৪০৩]

এখনও অনেক দেশে অনির্ধারিত সময়ের জন্য কাজ করার চুক্তি করা হয়। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষ টাকা কর্জ নেয় এবং এই মর্মে চুক্তি করে টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ করে যাবে। বছরের পর বছর চলে যায়, টাকা শোধ হয় না। ফলে মানুষকে দাসের মতো কাজ করেই যেতে হয়। এটাকে দলিল সৃষ্ট দাসত্ব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৪০৪]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট মেয়েদের জোর করে কাজে খাটানো হচ্ছে। তাদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আমাদের দেশের সীমাহীন দারিদ্র এবং ক্ষুধার তাড়নার সুযোগ নিয়ে পোশাক শিল্পে ছোট ছোট মেয়েদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করানো হচ্ছে। অনভিপ্রেত অবস্থার চাপে পড়ে নিজেকে অথবা নিজের সন্তানদেরকে কোন কঠিন শ্রমের কাজে বাধ্য করাকেও একরকম দাসত্ব বলা যেতে পারে। যেখানে মুক্ত মানসিকতার অভাব, যেখানে অসংগত বাধ্যবাধকতা সেখানেই আমরা দাসত্বপ্রথার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। অতএব পদ্ধতির বদল হলেও দাসত্ব আজো আছে এই সমাজে বিদ্যমান।

দাস প্রথাজনিত ব্যবস্থা উচ্ছেদ ও দাসদের অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের ভূমিকা

জ্ঞানের অভাবে যুগে যুগে যখনই মানবতার বিপর্যয় এসেছে তখনই আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলদের পাঠিয়ে ইসলামের বিধি ব্যবস্থায় মানবতার মান দন্ডকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) কেও সেই বিধি ও ব্যবস্থার ব্যবহারিক বিষয়াদি দিয়ে পাঠিছেন, যাতে মানবতা উহার পূর্ণতায় ফিরে আসতে পারে। আর তাইতো আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কর্মপদ্ধতির দ্বারা মানবতা বিরোধী দাস প্রথাকে উৎখাত করে গেছেন।[৪০৫]

৪০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৪০৪ গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, পৃ. ১৪৫
৪০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক ইসলামিক যুগ, ইতিহাসে যা আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ হিসেবে পরিচিত, তা ছিল এক বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেই যুগের সামাজিক অবক্ষয় এবং পশ্চাদপদতার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে দাসপ্রথা। দাসপ্রথা ছিল আরবদের সামাজিক ইতিহাসের এক কলঙ্কিত দিক। দাস-দাসিরা ছিল বিক্রয়যোগ্য পণ্য। প্রকাশ্যে হাটেবাজারে তাদের পশুর মতো বেচাকেনা করা হতো। যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো। এই অবস্থা আরব উপদ্বীপে হঠাৎ করে একদিনে নয় বরং হাজার বছর ধরে চলতে চলতে দাসপ্রথা আরবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল। এমনি নাজুক অবস্থায় আকস্মিকভাবে একটি নিষেদাজ্ঞা জারি করে দাসপ্রথা নির্মূল করা সম্ভব ছিল না তাই একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় ইসলাম দাসপ্রথা নির্মূলের প্রয়াস চালিয়েছে।[৪০৬]

যুদ্ধ ছিল দাসত্বের অন্যতম উৎস। যুদ্ধ বিপুল পরিমাণ স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে বন্দি করতো। তাই ইসলাম অন্যায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ করে। শুধু তাই নয় চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যারা বন্দি হয়েছে সে সব বন্দিকে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদান অথবা অন্য কোন সহজ শর্তে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছে। এতে করে দাসের ক্রমবর্ধমান হার কমতে থাকে।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যক্তিজীবন ছিল দাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড বিদ্রোহ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পনের বছর আগেই তিনি যখন আরবের ধনাঢ্য মহিলা খাদিজাকে বিয়ে করেন তখন স্ত্রীর বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ ও দাসদাসির তিনি মালিক হন। এরপর তিনি সম্পদের সিংহভাগ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করেন আর সকল দাসদাসিকে আযাদি দান করেন। এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু উদাহরন পেশ করতে পারি -

"যায়েদ বিন হারিস নামে এক গোলাম থেকে যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে। কিছুদিন পর উক্ত যায়েদের পিতা এবং পিতৃব্য মক্কায় এসে যায়েদকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করার প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (সা.) বলেন, যায়েদ মুক্ত, সে ইচ্ছা করলে তাদের সাথে যেতে পারে, এজন্য কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যায়েদ তাঁদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং সে জানায় বর্তমানে সে তার পূর্বতন অবস্থা থেকে ভাল আছে। অতপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার ফুফাত বোন জয়নব বিনতে জাহাস-এর সঙ্গে যায়েদ বিন হারিসের বিয়ে সম্পন্ন করেন। যদিও এই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যান তথাপি যায়েদ আজীবন রাসূলের অন্যতম নিবেদিত প্রাণ অনুসারী ছিলেন। অবশেষে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর যায়েদের পুত্র উসামা এবং উসামার পুত্র আবদুল্লাহর পিতা পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাহাদাত বরণ করেন। উল্লেখ্য ক্রীতদাস যায়েদ মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট থেকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেছিলেন।

ঘৃণ্য দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত করে দাসদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বিপ্লবাত্মক ভূমিকা রেখেছে। মহানবী (সা.) কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করাকে জঘন্য অপরাধ আখ্যা দিয়ে তা নিষিদ্ধ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "তিন ধরনের লোক আছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শেষ বিচারের দিন অভিযোগ উত্থাপন করব। একজন সে ব্যক্তি, যে মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করে, আরেক জন সে ব্যক্তি, যে তাকে (মুক্ত মানুষকে) বিক্রয় করে এবং অন্যজন সে ব্যক্তি, যে দাস বিক্রির অর্থ খায়।"[৪০৭]

---

৪০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

[৪০৭] মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *মানবাধিকার ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

Dhaka University Institutional Repository

দাসপ্রথার বিলোপ সাধনে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কিছু কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় হিসেবে মহানবী (সা.) দাস-মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দাস-মুক্তিকে মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) স্বয়ং ৬৩ জন দাসকে মুক্তি দেন। তাঁর স্ত্রীর উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা (রা.) ৬৭ জন দাসকে মুক্তি দেন। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর (রা.) এক হাজার দাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দেন। বিত্তবান সাহাবী হযরত আবুদর রহমান (রা.) ত্রিশ হাজার দাস ক্রয় করে তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীও সাধ্যমত নিজেদের এবং তাঁদের ক্রয়কৃত দাসদের মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন। এভাবে ইসলাম প্রচারের ৩০/৪০ বছরের মধ্যে আরবের মারাত্মক দাস সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।[৪০৮]

হযরত মুহাম্মদ বিদায় হজ্জের ভাষণে ‘তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে’ এই নির্দেশ দিয়ে এবং ‘মনে রেখো তারাও তোমাদের মতো মানুষ’ এই তাগিদ দিয়ে ক্রীতদাসকে শুধু সামাজিক মর্যাদাই দেননি সেই সঙ্গে প্রকারান্তরে দাস প্রথার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। ইসলামের নবী নিজে দাসের প্রতি যে আচরণ করেছেন এবং অন্যদেরকে যে রকম আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেটা দাসকে দাসের স্তর থেকে আপন ভাইদের স্তরে উন্নীত করে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) হেকমতের সাথে ইসলাম পূর্ব দাসপ্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করেছেন। আর কোর’আন ও হাদীসের আকর্ষণীয় আয়াত দ্বারা সাহাবীরা শুধু দাস-দাসী প্রথার উচ্ছেদে উদ্বুদ্ধ হয়নি, অধিকন্তু সাম্যের মহান মানদন্ডে দাস ও অদাসরা একাকার হয়ে একাত্মবাদকেই সাফল্য জনকভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মানদন্ডের মূল্যায়নের কারণে এবং আলোচনাকে ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনে কোর’আন হাদীসের বাণী এবং সাহাবীদের আমলকে প্রাসংগিক পর্যায়ে উদ্ধৃত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা কোর’আনের বানী তুলে ধরতে পারি। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَفِي الرِّقَابِ “ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করবে।”[৪০৯]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে যে খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তন্মধ্যে ক্রীতদাসের মুক্তি জন্য অর্থ ব্যয় করাকে একটি বিশেষ পূন্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) জান্নাতের আশার বাণী দিয়ে বলেছেন–“হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আযাদ করবে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তা’আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তি দানকারীর এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমনকি তার গুপ্ত অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তি দাতার গুপ্ত অঙ্গকে মুক্ত করে দেবেন।”[৪১০]

সামাজিকভাবে স্মরনীয় করার প্রয়োজনে আল্লাহ স্পষ্ট করে মুসলমানদের বলে দিলেন– أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “সেই সব মেয়ে লোকদের স্ত্রীত্ব বরণ করে নাও, যারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত

---

[৪০৮] প্রাগুক্ত।

৪০৯ আল-কুরআন, ২ :১৭৭

৪১০ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, অনুবাদ, ও সংকলন, মাও, ওবায়দুল হক, মাও: শাব্বীর আহমাদ শিবলী, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা : সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খৃ.), কিতাবুল ইত্ক, হাদীস নং ১৫৪৬, পৃ.৬৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।"[৪১১] তদানীন্তন আরবে এবং তার পূর্বেকার সমাজে গোত্রীয় বর্ণ ও বংশীয় কৌলিন্যের মানসিকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য আল্লাহ মানুষকে তাকওয়ার ভিত্তিতে কৌলিন্যের কামনাকে বিলুপ্ত করতে গিয়ে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে দাস প্রথাকে তুলে নিলেন এবং বললেন, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "তোমাদের মধ্যে যারা জুরিহীন আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান, তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয় তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দিবেন।"[৪১২]

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন– وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "তোমাদের মধ্যে কেউ স্বাধীন ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করবে।"[৪১৩]

কৌলিন্যের শ্রেষ্ঠ শিরোমনি যাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কিছুই সৃষ্টি হতো না সেই মহান ব্যক্তিত্ব হুজুর (সা.) আল্লাহর আদেশে ক্রীতদাসীকে স্ত্রীতে বরণ করে নিয়েছিলেন। হুজুর (সা.) কে সেই অনুমতি দিয়ে আল্লাহ বলেন– يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহ্‌র তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি ফায়[৪১৪] হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্যে হতে যারা তোমার মালিকানাধীন দাসী হয়েছে।"[৪১৫]

আল্লাহ রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন– إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "অবশ্যই দাসীদের অনুমতি তোমার জন্য রয়েছে।"[৪১৬]

তাই মুহাম্মদ (সা.) ক্রীতদাসী হযরত ছাফিয়া (রা.) কে স্ত্রীত্বে বরণ করে সাম্যের যে আদর্শ রেখে গেছেন তাতে তার অনুসারীদের পক্ষে দাসদের প্রতি অমর্যাদাকর কোন নীতি প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কথিত কুলীন মানুষেরা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরকে গরু, ছাগলের মত শুধু হাটে বাজারে বিক্রিই করতো না অধিকন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাদেরকে অসামাজিকভাবে অত্যচার করতো। একই আদম (আ.) থেকে আসার কারণে তারও যে সৎভাব ও সদাচরণের প্রশ্নে সংসারে, সমাজের অন্য পাঁচজনের ভাল ব্যবহারের দাবীদার ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ বলেন– وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে, নিকটাত্মীয় ইয়াতীম ও মিসকিনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয় প্রতিবেশীর পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের এবং তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।"[৪১৭]

---

৪১১ আল-কুরআন, ৪ :৩

৪১২ আল-কুরআন, ২৪ : ৩২

৪১৩ আল-কুরআন, ৪ : ২৫।

৪১৪ "যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয় সেগুলো فئ যা সাধারণ কোষাগারে জমা করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবিত থাকাকালীন সেগুলো তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকত।" উদ্ধৃতি : তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনুল কারীম*, বাংলা অনুবাদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৫তম সংস্ক.১৪২৮ হি./২০০৭ খৃ.).পৃ.৬৮৫

৪১৫ আল-কুরআন, ৩৩: ৫০

৪১৬ আল-কুরআন, ৩৩:৫২

৪১৭ আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐ বাণীর সমর্থনপুষ্ট হাদীসকে পাশে রাখলে আমরা অনুধাবন করতে পারব যে, দাস-দাসীদের প্রতি মানবতাজনিত আচরণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় হুজুর (সা.) কত যত্নবান ছিলেন। যেমন, "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাসদাসীকে খাবার ও পরার দিতে হবে এবং তাদের সাধ্যের অতীত কাজের ভার দেয়া যাবে না।"[৪১৮]

হযরত আবুযর গিফারীর (রা.) জীবন থেকেও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি মারুর ইবনে সুয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– " আামি আবুযর গিফারীকে দেখলাম, তিনি এক জোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন। তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরে আছেন। ঐ বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এক ক্রীতদাসকে গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সা.)এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তখন নবী (সা.) আমাকে বললেন, "তুমি কি তার মায়ের কথা বলে গাল দিয়েছ? তারপর বললেন, তোমাদের ভাইরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে ভাই থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে দেবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করতে দেবে। আর তাদের উপর তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দিওনা। এতদসত্ত্বেও কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য কর।"[৪১৯]

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের ক্রীতদাসদের প্রতি দয়া ও সদাচরণের আদেশ প্রদানে ইসলাম ক্রীতদাসদেরকে এমন উচ্চ মার্গে নিয়ে গেছে, যেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপন পিতা-মাতা ও ক্রীতদাসদাসী একই মানে উন্নীত হয়ে সাম্যের স্মরণীয় ইতিহাস রেখে গেছেন।[৪২০]

শুধু পারিবারিক পরিবেশে উঠা-বসাই নয়, অধিকন্তু দাসদাসীদের সাথে এক সাথে বসে খানাপিনার তাগিদে হাদিস এসেছে। যেমন হযরত আবু হুরয়রাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের কারো জন্য যখন খাদেম খানা তৈরি করে আনে, তখন সে যেন তাকে (খাদেমকে) নিজের সাথে বসায়, আর খাদেম যেন তার সাথে খায় কেননা সে উহার তাপ ও ধুঁয়া সহ্য করেছে। অবশ্য খানা যদি সামান্য হয় তবে যেন দুই এক লোকমা হলেও তার হাতে দেয়।"[৪২১]

মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে একে অপরের মান ইজ্জত এমন কি পরস্পরের জীবনের যেন কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য তারা প্রকৃতিগতভাবে চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু মানুষ শয়তানী সত্ত্বার অনিষ্ট থেকে নিজেদের রক্ষা না করতে পেরে বহুক্ষেত্রে একে অপরের জীবনপাত করে থাকে। এ অহেতুক এবং অন্যায়ভাবে এহেন হত্যাকে ইসলাম কোন অবস্থায়ই স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে না। বরং ইসলাম এহেন হত্যার প্রতিরোধে কেসাস বা রক্তপাতের নির্দেশ দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিয়েছে যে এহেন হত্যার কাফফারা স্বরূপ শুধু রক্তমূল্যই নয়, অধিকন্তু একজন মুমিন দাসকে আজাদ করে দিতে হবে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ "যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে তার কাফফারাস্বরূপ তাকে এক মুমিন

৪১৮ মুসলিম ।

৪১৯ বুখারী, প্রাগুক্ত । উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩৫৯ প্রাগুক্ত।

৪২১ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে তার গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীকে রক্তমূল্য দিতে হবে।”[৪২২]

দাসদাসীরা জীবিত হলেও তাদের গোলামীর কারণে তারা মনিবদের অমানবিক আচরণে মৃতপ্রায় মানুষ। সুতরাং একটি অযাচিত মৃত্যুর জন্য আর একটি মৃতসত্ত্বার আজাদ করার অর্থই হলো তাকে জীবন দেয়া। মৃত্যুর কাফফারা তো জীবনই হতে হবে। আর আল্লাহ এ বিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন জীবনের তথা ক্রীতদাসীদের মূল্যায়ন।

দাসদাসীদেরকে তাদের ত্রুটির জন্য সময় অসময় মারপিট করা তখনকার আরব সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ক্রীতদাসরাও যে মানুষ এবং তাদেরও যে ত্রুটি হতে পারে এ বিবেচনা না থাকায় ক্রীতদাসদাসীদেরকে নির্মমভাবে অত্যাচারের ইতিহাস আছে। ইসলাম ও উহার নবী মুহাম্মদ (সা.) শুধু গোলামীর মুক্তির মুল্যায়নই রাখেন নি, অধিকন্তু ক্রীতদাস-দাসীদেরকে যেন শারীরিক অত্যাচার করা না হয় সে বিষয়েও বিবেচনার বাণী রেখেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে বিনা অপরাধে আপন দাসদাসীকে দণ্ডদান করেছে অথবা তাকে চড় মেরেছে কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।”[৪২৩]

এ ব্যাপারে মুসলিম শরীফের আর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যেখানে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, “আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় পেছন হতে আওয়াজ শুনলাম, রাখুন আবু মাসউদ! তুমি উহার উপর যতটা ক্ষমতাবান আল্লাহ তোমার উপর ততোধিক ক্ষমতাবান। আমি পেছন দিকে ফিরলাম এবং দেখলাম তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে এখন হতে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। তখন হুজুর (সা.) বললেন: শুন, যদি তুমি তা না করতে আগুন তোমাকে জ্বালাতো অথবা বলেছেন আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো।”

উপরের উদ্ধৃত কোর'আনের কাফফারা প্রশ্নে দাসমুক্তির বিষয়টি আমাদেরকে একটু মুখ্যভাবে বিবেচনা করতে হবে। দাসপ্রথা মানবতা হত্যার শামিল। দাসদের গোলামীর জীবন জীবন্ত মৃত্যুর মত। তাই একটি অবৈধ হত্যার বিনিময় রক্তমূল্যের সাথে আল্লাহ এহেন কাফফারার মাধ্যমে আর একটি জীবনের সৃষ্টি করে দাসপ্রথাকে কতই না সুন্দরভাবে উৎখাত করে নিলেন।

পারস্পরিক চুক্তি ভঙ্গের কারণে দাসমুক্তি যেভাবে কাফফারা হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছে, ঠিক ঐ একই ভাবে কাফফারা হিসাবে দাসমুক্তি মূল্যায়িত হয়েছে আল্লাহর সাথে চুক্তি ভঙ্গের কারণে। আজকের মত ইসলামপূর্ব ও পরের যুগেও মানুষ কথায় কথায় আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল। অথচ কসমের মাধ্যমে কর্মের যে অঙ্গীকার সে করে বসে, উহা বহুক্ষেত্রেই পালিত হয় না। আরবের ঐ সময়ের সমাজে এহেন ‘কসম’ একটি কু অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যা সর্বাবস্থায় পালিত না হবার কারণে কসমের গুরুত্ব অবহেলিত হয়ে আল্লাহর সাথে কসমের চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা বেড়ে গিয়ে কর্মের অঙ্গীকার সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হবার কারণে পারস্পরিক সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং একটি প্রতারণার প্রবর্তন শুরু হয়ে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হতে শুররু করলো। তাই সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে অহেতুক কসম ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে অন্যান্য

৪২২. আল-কুরআন, ৪ : ৯২

৪২৩ মুসলিম , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বিধানের সাথে দাসমুক্তির বিধান করে বলে দিলেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

" তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না , কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অত:পর ইহার কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবারপরিজনকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ নাই তার জন্য তিন দিন 'সিয়াম' পালন। এটা তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও।"[৪২৪]

আশরাফুল মাখলুকাত বিশেষণটির অবমূল্যায়নে যে অমানবিক আচার আচণের সুত্রপাত, সেগুলোর সংশোধন ক্রীতদাস-দাসীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতই যেন আরাধ্য ছিল। তাই 'যিহারের' প্রশ্নেও দাস-দাসীর মুক্তির আয়াত এসেছে।

তদানীন্তন আরব সমাজের মানুষের মধ্যে 'যিহার'[৪২৫] নামক একটি কু-অভ্যাস বা মানসিকতা বিরাজমান ছিল। আজও এদশের কিছু সংখ্যক মুর্খ মুসলমানদের মধ্যে এ যিহারের মানসিকতা ফুটে উঠে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে কলহে অবতীর্ণ হয়। যিহার অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা। স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে কলহের কারণে রাগের মাথায় বলে থাকতো "তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত হারাম"। একজন মু'মিনের পক্ষে এহেন জঘন্য মানসিকতার সংশোধনের জন্য আল্লাহ সেখানেও কাফ্ফারা হিসাবে দাসমুক্তির বিধান দিয়ে দাসমুক্তির উপর ঐ প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। যিহারের পরে কোন মু'মিন যদি আবার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই একটি দাস মুক্ত করতে হবে। আর সে যদি দাসমুক্ত করতে অপরাগ হয়, তবে তাকে তার হীন আত্মার চিকিৎসার জন্য একাদিক্রমে দুই মাসের রোজা রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন– وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে , পরে নিজেদের সেই উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে।"[৪২৬]

আল্লাহ ভাল করেই জানতেন যে দাসপ্রথা নিশ্চয় উঠে যাবে। কিন্তু শয়তানের বিভ্রান্তিকর পরিবেশের কারণে যিহারের কু-অভ্যাসের সংশোধনের জন্য আল্লাহ বিকল্প বিধান হিসেবে বলেছিলেন– فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "আর যে দাস পাবে না, সে যেন ধারাবাহিকভাবে দুটি মাস রোজা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক ইহা করতেও অক্ষম, সে যেন ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়।"[৪২৭]

---

৪২৪ আল-কুরআন, ৫ : ৮৯

৪২৫ ظهر শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ, জাহিলীযুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে বলত 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠসাদৃশ্য' তা হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বরল।(যদিও ইসলামে এটি দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না,তবে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়)। উদ্ধৃতি, আল-কুরআনুল কারীম(ঢাকা : ই.ফা.বা.১৪২৮ হি./২০০৭ খৃ,), পৃ.৯০৪

৪২৬ আল-কুরআন, ৫৮ : ৩

৪২৭ আল-কুরআন, ৫৮ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুর'আনের আয়াতের বাস্তবায়নের প্রয়োজনে তাঁর জীবদ্দশায় দাস-দাসীদের অভিভাবকত্বের ভূমিকা পালন করে গেছেন। ঐ অভিবাবকত্বের কারণে দাসদের মুক্তির প্রয়াসে এবং মুনিবদের পাপের প্রতিদান দিতে বহু ধরনের কাফফারার ব্যবস্থা শুধু মূল্যবোধকে উল্লেখযোগ্যভাবে জাগ্রত করার এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল।[৪২৮]

আসলে ঐ কাফফারার বিধান মানসিকভাবে মালিকদেরকে আঘাত করে মনস্তাত্বিকভাবে সংশোধনে এহেন দর্শনের ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, আশরাফুল মাখলুকাত যে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল উহাকে তারা অবমূল্যায়ন করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তাই কাফফারার মাধ্যমেই দাসদাসীদের মুক্তি মূল্যায়িত হয়েছে মানবতায়।

মুহাম্মদ (সা.) এর আমলে এবং তার পূর্বেকার যামানার সমাজব্যবস্থায় মালিকরা দাসীদেরকে তাদের যৌনভোগের জন্যই ব্যবহার করতো না, অধিকন্তু তারা তাদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করাতে বাধ্য করতো। কুর'আনুল কারীম এহেন মানসিকতার সংশোধনের জন্য আয়াত নাযিল করে বলে দিয়েছেন: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "তোমাদের দাসীদেরকে নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না, যখন তারা নিজেরাই চরিত্রবতী থাকতে চায়।"[৪২৯]

কাফফারার করণিক বিধান ব্যতিরেকেও যদি কোন দাস এবং তার মালিকরা তাদের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায় অর্থাৎ কোন দাস বা দাসী তাদের মালিক হতে যদি মুক্তির জন্য মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করে এবং মনিব তা কবুল করে, তখন উভয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র লিখে দাস বা দাসী মালিকের গোলামী হতে মুক্তি পেতে পারে। সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন- وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্য হতে যারা চুক্তিপত্রের দরখাস্ত দেবে তাদের সাথে চুক্তিপত্র কর, তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।"[৪৩০]

এহেন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মালিকদের গোলামী হতে মুক্তির প্রয়োজনে মালিক ইচ্ছা করলে বিনিময়কৃত কিছু অর্থ মাফও করতে পারে। অথবা অন্য কোন মুসলিম কিংবা রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকেও ঐ দাস ও দাসীদেরকে অর্থ দিয়ে মালিকদের কাছ হতে আজাদ করে দেয়ার উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলেন- وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ "(তাদের মুক্তির জন্য) আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছে তা হতে তাদেরকে দান করবে।"[৪৩১]

আরবের তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় গরু-ছাগলের মত হাটে বাজারে দাসদাসীদের এবং প্রয়োজনবোধে এদের শিশু বাচ্চাদেরকে আলাদাভাবে বিক্রি করে দিত, যেমনি করে আমাদের দেশের মানুষ গরুক রেখে গরুর বাচ্চাকে অথবা বাচ্চাকে রেখে গরুকে বিক্রি করে দেয়। মানব শিশু এবং তাদের এহেন বিক্রি যে কতটা অমানবিক উহার বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে (ব্যক্তি) সন্তান আর তার

৪২৮ মোঃ সিরাজুল ইসলাম , প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬
৪২৯ আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩
৪৩০ আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩
৪৩১ আল-কুরআন, ২৪: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

মাকে পৃথক করেছে (অর্থাৎ মা ছাড়া সন্তান বেচেছে অথবা সন্তান ছাড়া মাকে বেচেছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এবং তার প্রিয়জনদেরকে পৃথক করবেন।"[৪৩২]

ক্রীতদাস প্রথা মূলত অনধিকার সর্বস্ব একটি জুলুমী ব্যবস্থা। "এ ব্যবস্থাটি সাধারণত মানুষের পৈশাচিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, যা ক্ষমতাশীলদের সংঘাত থেকে অথবা যুদ্ধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। সৃষ্টির আদি থেকে যুগে যুগে, দলে দলে গোত্রে গোত্রে এবং জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, সেই যুদ্ধে বিজিতদের বশ করে রাখার একটি মানসিকতাই মূলত ক্রীতদাস প্রথা।"

ক্রীতদাস প্রথা কয়েকটি কারণে সমাজে স্বভাবসিদ্ধ হয়েছিল যার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জৈবিক কারণগুলো অন্যতম। যেমন-

প্রথমত: যেহেতু ক্রীতদাসদাসীদেরকে বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন সম্ভব ছিল, তাই অর্থনৈতিক স্বার্থেই প্রথমত বিজিতদেরকে বশে রাখার অভিলাষে ক্রীতদাস ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত: দক্ষিণ হস্তের অধিকরণের দরুন যখন বিজিতরা একবার সামাজিকভাবে ক্রীতদাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। তখন সামাজিক মূল্যবোধের কারণে মনিবদের মানসিকতার একটি বৈষম্যের বিবর্তন মনিব ও ক্রীতদাসদের মধ্যে একটি বিরোধের মান বিবেচিত হয়ে ক্রীতদাসরা নিম্নমানের জীব হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। কালের বিবর্তনে এ ব্যবস্থাটির পরিবর্তন কোর'আন পূর্ব জামানায় সম্ভব হয়ে না উঠার কারণে সামাজিকভাবে বংশানুক্রমে তারা মনিবের গোলাম হিসেবে মনিবের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

তৃতীয়ত: জৈবিক যৌনাচার, বিজয়ী মনিবদের একটি অদম্য কামনায় বিজিতদের স্ত্রীলোকদের ক্রীতদাসীদের মর্যাদা দিয়ে তাদের সাথে যৌন মিলন একটি স্বাভাবিক বিষয়ে রূপ নেয়। মুহাম্মদ (সা.) এর হাতে কলেমা পড়ার পরেও কোন কোন মনিবরা তাদের দাসীদের সাথে স্ত্রীদের মত সহবাস করে চলছিল। এহেন সহবাসকে তারা অপরাধ মনে না করে বরং তাদের অধিকার মনে করতো।[৪৩৩]

বহুক্ষেত্রে যুদ্ধগুলো এ জন্যও করা হতো, যাতে তারা তাদের প্রতিপক্ষ মেয়েদেরকে হস্তগত করতে এবং তাদেরকে দাস বা দাসী বানাতে পারে। এ ব্যাপারে তৎকালীন আরবের জাহির-বিন-আবি-ছালমার একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, তারা যখন রবীয়বাসীদের উপর আক্রমণ চালায় তখন তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে বড় বড় চুলওয়ালা মেয়েদেরকে বাঁদি বানিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সকল মেয়েরা সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতো এবং তাদের মিষ্টি মুখের লালা সূর্যের আলোয় ঝকঝক করতে থাকতো।[৪৩৪]

এমনিভাবে হারেজ-বিন-হালিঝা নোমান-বিন-মানদারের একটি আক্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমরা বনু তামিমের উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং মাহে হারামে উহাদেরকে গিয়ে ধরে ফেললাম এবং তাদের মেয়েদেরকে বাঁদি বানালাম।"

বহুক্ষেত্রে ঐ সকল ক্রীতদাসীদের সাথে 'আজলের' ভিত্তিতে সহবাস করতো যাতে ক্রীতদাসীদের পেটে সন্তান জন্ম না নেয়। কারণ সন্তান পালনের ঝুঁকি এবং তাদেরকে মনিবের সম্পত্তিতে

৪৩২ তিরমিজী। উদ্ধৃতি: মো: সিরাজুল ইসলাম জেলা জজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮
৪৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯
৪৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকারী করা মনিবরা সমীচীন মনে করতো না। তাছাড়া সন্তান সম্ভবা ক্রীতদাসীদেরকে হাটে বাজারে বিক্রি করা ঝামেলাবহুল হওয়াতে যৌনমিলন মূলত আজলের ভিত্তিতে স্বাভাবিক করে নিলেও মানবিক মূল্যায়নে ইসলাম উহাকে স্বীকার করে নেয়নি। তাই ইসলাম ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনমিলন বৈবাহিক সূত্রে এবং সন্তানের উত্তরাধিকারী শর্তে এমন কতগুলো বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে দেয়, যাতে পরবর্তীকালে ক্রীতদাসীদের সাথে অবৈধ যৌনমিলন আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মুহাম্মদ (সা.) কোর'আনের আলোকে যুদ্ধের নীতি, যুদ্ধবন্দিদের বণ্টনের নীতি বেধে দেয়ার ফলে যুদ্ধে লব্ধ ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনমিলন যৌনাচার না হয়ে বরং বৈবাহিক সূত্র সম্বন্ধে এমন হয়ে গেল যে যুদ্ধেলব্ধ মেয়েলোক বিনিময়ের বিকল্পে কারো না কারো স্ত্রীতে পরিণত হয়ে গেল। মোহাম্মদ (সা.) তাঁর নিজের জবিনাচরণ দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে "হযরত জোয়ায়রিয়া (রা.) ছিলেন যুদ্ধবন্দি। অন্য বন্দিদের মত তিনিও বণ্টন হন এবং সাবেত-বিন- কায়েসের ভাগে পড়েন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হতে অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে তার মনিব কায়েসের নিকট হতে মুক্তি নিয়ে মোহাম্মদ (সা.) এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জোয়ায়রিয়া (রা.) ছিলেন একটি গোত্রপতির কন্যা এবং সেই গোত্রের সহস্রাধিক লোক সাহাবীদের (রা.) হাতে বন্দী হন। সাহাবীগণ (রা.) যখন জানতে পারলেন যে জোয়ায়রিয়া (রা.) এর সাথে মোহাম্মদ (সা.) এর বিবাহ হয়েছে তখন তারা মহানবী (সা.) এর সম্মানে স্ব স্ব দাসদাসীদের মুক্ত করে দেন। হযরত আয়শা (রা.) তখন বলছিলেন যে, "জোয়ায়ারিয়ার (রা) সাথে মোহাম্মদ (সা.) এর বিবাহ হওয়াতে বনি মুসতালেক গোত্রের শত শত পরিবার আজাদ হয়ে গিয়েছিল। একটি গোত্রের জন্য জোয়ায়রিয়ার (রা.) মত ভাগ্যবতী মহিলা অন্তত আমার চোখে পড়েনি।"[৪৩৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্য একজন স্ত্রী ছিলেন হযরত সাফিয়া (রা.)। তিনি ছিলেন বনি নজির গোত্রের সর্দার হোয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। খয়বর যুদ্ধে সাফিয়ার স্বামী কেনানা নিহত হয় এবং সাফিয়া বন্দি হন। হুজুর (সা.) সাফিয়াকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে তারই সুপারিশে নজির গোত্রের বন্দিদেরকে আজাদ করা হয়। নজির গোত্রটি ছিল ইয়াহুদী। আর ঐ বিবাহের দ্বারা ইসলামের আর একটি বিজয় সূচিত হলো এবং এতে ইয়াহুদীদের একটি বিশেষ অংশ ইসলাম গ্রহন করে মুসলিম হয়ে যায়। অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে যেখানে যৌনাচারের জুলুম ছিল, সেখানে মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুর'আনের আয়াত যে ব্যভিচারহীন এবং সাম্যের সমাজ গড়েছে তার তুলনা অন্য কোন ব্যাবস্থায় হতে পারে না।

মোহাম্মদ (সা.) একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে দ্বীনের মূল নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। সংস্কারকদের জীবন উপমার উপকরণ না হলে সমাজ তা গ্রহণ করতে চায় না। তাই মোহাম্মদ (সা.) এর একাধিক ক্রীতদাসী বিবাহ আল্লাহর অনুমোদন ও উপমার উপকরণে সংঘটিত হয়েছে। মোহাম্মদ (সা.) যদি ক্রীতদাসীদের বিবাহ না করতেন; তবে মোহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীদের জন্য মানবতার মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রীতদাসী বিবাহ হারাম হয়ে যেত।

---

৪৩৫ উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ (সা.) এর আদর্শের অনুসারী সাহাবীদের জীবনে দাসদাসীদের ভাই-বোন অথবা জামাই-স্ত্রীতে বরণ করে আত্মীয়তার বন্ধনে আত্মার মানুষ হয়ে গেছেন এবং বহুক্ষেত্রে ক্রীতদাসদাসীদেরকে আজাদ করে সমাজের অন্য পাঁচজন সম্মানীয় ব্যক্তিদের সমান করে দিয়েছেন। ক্রীতদাসীদের সম্মান কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি। যা দ্বারা প্রমাণিত হবে মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কোরআন কত উচ্চ দর্শনে দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে।

ঘটনাটি ছিল হুজুর (সা.) এর নাতি হযরত হোসাইন (রা.) সংক্রান্ত। হযরত হোসাইন (রা.) সেদিন খেতে বসেছিলেন। ঐ সময় একজন দাসী- পরিচারিকা খাবার পরিবেশন করছিল। পরিচারিকা গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে হযরত হোসাইন (রা.) এর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তার হাত থেকে গ্লাসটি পড়ে গেল। পরে গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল এবং ছিটকে পড়া পানি ভিজিয়ে দিল হযরত হোসাইন (রা.) এর জামা কাপড়। বিরক্ত হোসাইন (রা.) খুব রাগান্বিত দৃষ্টিতে পরিচারিকা দাসীর দিকে তাকালেন। জ্ঞানী পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ কোর'আনের এই আয়াত আবৃত্তি করলেন, "আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্রোধ সংযত করে এবং লোকদের ক্ষমা করে।" হোসাইন (রা.) শান্ত হলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। পরিচারিকা কোর'আন মজিদ থেকে আবার আবৃত্তি করলেন: "আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।" ঐ আয়াত শুনে হযরত হোসাইন (রা.) চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন, 'দাসবৃত্তির শৃঙ্খল থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।'[৪৩৬]

মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে আসা ওহীর আধ্যাত্মিকতা যখন সুমহান সাম্যের সংগতি বেজে উঠলো, তখন ঐ সংগীতের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিমোহিত হয়ে যখন ক্রীতদাসরাও ইসলাম গ্রহন করে মনিবদের মর্যাদায় মূল্যায়ন হতে থাকলো তখন বহু মনিবের যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো তাতে বহু ক্রীতদাসকে অত্যাচারিত হতে হয়েছে। তবুও তাঁরা ঈমানহারা হয়নি। এ প্রসঙ্গে হযরত খাব্বাব (রা.) কে উল্লেখ করা যেতে পারে। "হযরত খাব্বাব (রা.) ছিলেন একজন স্ত্রীলোকের ক্রীতদাস। স্ত্রীলোকটি যখন জানতে পারলো যে, তার ক্রীতদাস খাব্বাব মোহাম্মদ (সা.) এর ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন বিচিত্র উপায়ে তাকে শাস্তি দিতে লাগলো। প্রথমে তাকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে আগুন ঝরা রোদে শুইয়ে রাখতো। গরমে তার শরীর সিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ঐ শাস্তিতেও যখন তাঁর মত পরিবর্তন হলো না, তখন তাকে খালি গায়ে মরুভূমির গরম বালুতে শুইয়ে রাখা হতো। এতে তার দেহের মাংস পর্যন্ত গলে যেতো। মাঝে মাঝে লৌহ শলাকা দিয়ে তার মুখে ও মাথায় দাগ দেয়া হতো। এমন কি অমানবিকভাবে খাব্বাবকে জ্বলন্ত অংগারের উপর শুইয়ে রাখা হতো। কিন্তু কোন শাস্তি তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারলো না। হযরত ওমর (রা.) যখন খলিফা হলেন, তখন একদিন হযরত খাব্বাবকে কোরাইশদের নির্যাতনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত খাব্বাব (রা.) তাকে কোমর খুলে দেখালেন। চমকে উঠে ব্যথিত হৃদয়ে ওমরকে বললেন: "আমার মনিব আমাকে জ্বলন্ত অংগারের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখতো, ফলে আমার কোমরের মাংস গলে যেত। প্রতিদিন এরূপ করায় আমার কোমর এরূপ পাতলা ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।"[৪৩৭]

৪৩৬ আবু সোহায়েব, উদ্ধৃত, মো: সিরাজুল ইসলাম, জেলা জজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৪৩৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সা.) এর কাছে দাসপ্রথার ব্যবহার যে কত ঘৃণিত ছিল তা নিম্নে হাদিস থেকেও আমরা অনুধাবন করতে পারি । যেমন-"হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির দুশমন হবো। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। আজাদ মুক্ত মানুষ বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়ে পুরোপুরি কাজ আদয় করে নিয়েছে। কিন্তু তাকে মজুরী দেয় নি।"[৪৩৮]

ইসলাম মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কিভাবে এবং কত মহত্ত্বের ও মহানুভবতার দ্বারা সফলতা অর্জন করেছিল তার আর এক ইতিহাস আমরা তুলে ধরতে পারি। ঘটনাটি হযরত ওমর বিন আব্দুর আজিজের খেলাফতের আমলে। তিনি খলিফা নির্বাচিত হবার পর প্রাসাদের দিকে চলছেন। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে দাঁড়ানো আছে সৈন্যদল। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? উত্তর এলো, এরা আপনার দেহরক্ষী সৈন্য। খলিফা বললেন, প্রয়োজনমত এদের পাঠিয়ে দাও। আমার দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। জনগণের ভালবাসাই আমার প্রতিরক্ষা। প্রধান সেনাপতি সশস্ত্র সালাম জানিয়ে তার নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে ওমর বিন আব্দুল আজিজ প্রসাদে ঢুকলেন। দেখলেন সেখানে আটশত দাস তার অপেক্ষায় দন্ডায়মান। জিজ্ঞেস করে জানলেন যে এরা তারই সেবার জন্য। খলিফা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, এদের মুক্ত করে দিন। আমার সেবার জন্য আমার স্ত্রীই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী তার হুকুম তামিল করলেন।[৪৩৯]

মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীদের এই যে মানব মূল্যবোধ এটা সম্ভব হয়েছে হুজুর (সা.) এর মহান আদর্শ ফলে ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় 'কেসাস' অর্থাৎ বিনিময়ের বিধান বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হুজুর (সা.) ক্রীতদাসদের ব্যাপারে সেই 'কেছাছের' বিধান বিবেচনা না করে বরং আরও কঠোর মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে তার আপন ক্রীতদাসকে হত্যা করবে আমরা তাকেই হত্যা করবো এবং যে আপন দাসের অঙ্গ ছেদন করবে আমরা তার অঙ্গ ছেদন করবো।'

উল্লেখিত কোর'আনের আয়াত ও হাদীসের পরে এ কথা বলার আর অবকাশ থাকলো না যে, ইসলাম দাস প্রথাকে আদৌ প্রশ্রয় দিয়েছে, বরং একটি ব্যাধিকে ব্যতিক্রমধর্মী চিকিৎসায় নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় কামিয়াব হয়েছেন। এ কারণে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আজ দাসদাসী ব্যবহারের প্রচলন নেই বললেই চলে।

অধিকন্তু ক্রীতদাসদাসীদের একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তাঁরা শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের ছায়াতলে তাঁরাই শুধু শান্তির স্মরণিকা স্বাদ পেয়েছিলেন তা নয়; অধিকন্তু তাঁরা সুদূর আরব থেকে এ উপমহাদেশে ইসলামের তবলিগ করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম গ্রন্থের লেখক বলেন-"উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম পরিবার যারা ১২০০ সাল হতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন করেছেন তাদেরকে ইতিহাস দাসবংশ বলে আখ্যায়িত করলেও তারা তাদের সুশাসনের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তীকালে ঐ দাসবংশের অনুসারী হিসেবে ১২৯০-১৩২০ সাল পর্যন্ত খিলজী, ১৩২০-১৪১৩ সাল পর্যন্ত তোগলক ১৪০১-১৫২৬ সাল পর্যন্ত লুদি, ১৫৩৯-১৫৫৫ সাল পর্যন্ত সুর বংশ এবং ১৫২৬-১৫৩৯ ও ১৫৫৬-১৭৫৫ সাল পর্যন্ত মুঘলরা এ ভারতে শাসন

৪৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩
৪৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন বলে আজ এ উপমহাদেশে প্রায় ৭০/৮০ কোটি মুসলমানের বাস। যে ইসলামকে গ্রহণ করে নিজকে ধন্য মনে করি, সেই ইসলামের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা এ ক্রীতদাসদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। কারণ ইসলাম ইনসাফ এবং সাম্যের যে শিক্ষা দিয়েছে ইহা তারই প্রতিফলন।"[৪৪০]

সাধারণ এবং সকলেই যে ইসলামের বিধানে সমান এ মূল্যবোধটুকু প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আবির্ভাব ইসলামী শাসনের সেই খেলাফত আমলে ঐ মৈত্রীর মূল্যায়ন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উহার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"হযরত ওমর (রা.) খেলাফত আমলের গাসসান গোত্রের সর্দার জাবালার কাবাগৃহ তাওয়াফের সময় জনৈক গরীব মুসলিমের পায়ে জাবালার ইহরামের কাপড় জড়ায়ে পড়ে। ফলে জাবালা ক্রোধান্বিত হয়ে সজোরে ঐ ব্যক্তিকে থাপ্পর মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এই গরীব মুসলিম হযরত ওমর (রা.) এর দরবারে বিচার দিলে খলিফা ওমর (রা.) জাবালাকে তলব করে। তখন জাবালা আসে এবং ঐ গ্রাম্য মুসলিমকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখে ঘৃণাভরে বলে, 'ঐ গ্রাম্য একজন ক্ষুদ্র মানুষ আমার সামনে কি মর্যাদা পেতে পারে?' তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, 'প্রথমত: তুমি হারামশরীফেই এ দুর্ব্যবহার করেছো। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কাছে তোমরা উভয়ই সমান। সুতরাং তুমি যা করেছ তার শাস্তি বরণ করতেই হবে। কারণ ইসলামের বিচার হলো দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। জাবালা বলল, 'যে ধর্মে বড় ছোটর পার্থক্য নেই সেই ধর্মে আমি থাকতে চাই না।' তখন হযরত উমর (রা.) জাবালাকে মুরতাদ বলে মৃত্যুদণ্ডর জন্য প্রস্তুত হতে বলে এবং একদিনের সময় দিয়ে তাওবা করার পর জাবালাকে মুসলমান হয়ে দাঁত দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে। ঐ একদিনের অবকাশ পেয়ে জাবালা পালিয়ে রোমের সম্রাট কায়সারের নিকট চলে আসে।"[৪৪১]

ইসলাম দাসদের যোগ্যতা অনুসারে সমাজের অনেক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দাসের নেতৃত্বে অনেক মনিব মালিককে পরিচালিত হতে দেখা গেছে। ক্রীতদাস বেলাল ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। যায়েদ বিন হারিসের নেতৃত্বে পবিত্র কোর'আন সংকলিত হয় এবং তিনি রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উসামা বিন যায়েদ সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন হযরত আবুবকর (রা.) এর খেলাফত কালে। এমনিভাবে ইসলামের ইতিহাসে অনেক ক্রীতদাস শুধু সমাজে সম্মানজনক স্থানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং তাদের উন্নত মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ও নিষ্ঠা দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। ইসলাম দাসদেরকে অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে পণ্যদ্রব্যের স্তর থেকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের স্তরে উন্নীত করেছে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ফিকহ একাডেমীর ঘোষিত মানবাধিকার দলিলে ১১ নং ধারায় দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকারের বলা হচ্ছে মানুষকে দাস করা যাবে না, গোলাম করা যাবে না। সবধরণের উপনিবেষবাদ নিসিদ্ধ। "(ক) প্রতিটা মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। কাইকে দাসত্বে আনা , লাঞ্ছনা বা অবমাননা করা, শেষণ করা বা তাকে হীণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার (Exploit) করার

৪৪০ মো: সিরাজুল ইসলাম, জেলা জজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

৪৪১ উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার করো নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে বশ্যতা (Subjugation) স্বীকারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

খ) দাস প্রথা সবচেয়ে কুৎসিত রূপ হিসেবে পরিগণিত সব ধরনের উপনিবেশিকতা (Colonialism) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উপনিবেশিকতার শিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বীয় স্বীয় লক্ষ্য নির্ধারণের অধিকার। প্রতিটি রাষ্ট্র ও জনগণের কর্তব্য এসব মানুষকে তাদের যাবতীয় উপনিবেশিক কুপ্রভাব, এবং দখলদারিত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার সংগ্রামে সমর্থন যোগানো। দুর্দশাগ্রস্ত এসব দেশে ও জনগণের অধিকার রয়েছে তাদের স্বীয় পরিচয় সংরক্ষণ ও তাদের সমস্ত বিত্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার।

বর্তমানে দাসত্ব ও দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা অনেকে মুখে বললেও বস্তুত জিইয়ে রাখতে চায়। আমেরিকা তার সভ্যতা গড়তে, নতুন ইমারাত-কল-কারখানা তৈরীর জন্য আফ্রিকা থেকে বহু সংখ্যক দাস আমদানী করে। দেশটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ থেকে এখনও শ্রম ও মেধা আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমেরিকা "Declaration of Independence" (4 July 1776) এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে Claude M. Lightfood যে মন্তব্য করেন তাতে উপরোক্ত কথাটির প্রমাণ মেলেঃ "Black remained slaves until about 80 years later, women did not receive the right to vote until 112 years later and the working class did not get the legal right ot organise and collectively bargain until 150 later."[৪৪২] কিন্তু ইসলাম কখনই দাস দিয়ে সভ্যতা গড়তে চায়নি এবং চায়না। মুহাম্মদ (সা.) দাসদের শুধু মুক্তি দিতেই বলেননি, তাদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতেও বলেছেন।[৪৪৩]

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Bosworth Smith তাঁর "Mohammed and Mohamadanism" গ্রন্থে বলেন,

"It recognised individual public liberty, secured the person and property of the subjects and postered the growth of all civic virtues. It communicate all the privileges of the conquering class to those of the conquered hwo conformed of its religion, and all the protection of citizenship to those who did not. It put an end to old custom that were of immoral and criminal character. It abolished the inhuman custom of burying the infant daughters alive, and took effective measures for the suppression of the slave-traffic."[৪৪৪]

আমরা উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে অনুধাবন করতে পাড়ি যে, মানবাধিকার বিশেষ করে, দাসদের অধিকারের উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাষণ ও চুক্তিসমূহ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

---

৪৪২ Claude. M. Lighfood righs U.S. style from Clolnical Times thrroush The new Deal(New york : International Publishers, 1977), p. 16.

৪৪৩ ড.এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী ও মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে বন্দিদের অধিকার প্রসঙ্গ

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগত ভাবে স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা আল্লাহ কর্তৃক দেয় নিশ্চয়তা। কোন ব্যক্তিকে কেবল সন্দেহের বশে কারাদণ্ড দেয়া, বিনা বিচারে ছলচাতুরির মাধ্যমে নিরাপরাধকে বন্দি করে রাখা ইসলাম সমার্থন করে না। এক মাত্র ন্যায়বিচারের তাগিদ ব্যতীত ইসলামে কাউকেও বন্দি করার ব্যবস্থা নেই। আর বন্দিদের কিছু অধিকার সংরক্ষনের বিধান রয়েছে ইসলামে। আর তাইতো বন্দিদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে। মদিনার সনদে ৩ নং ধারায় বন্দির অধকার সম্পর্কে বলা হয়েছে "পূর্বের নিয়ম অনুসারেই মুহাজির কুরাইশরা নিজদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দির মুক্তিপণ দিবে।" তায়েফ চুক্তিতে বলা হয়েছে "তাদের কাছে যদি এমন কোন বন্দি বা ক্রীততাস থাকে- যাকে তার মুনিব বিক্রি করে দিয়েছে, তা হলে তার সে বিক্রি বিশুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে সব বন্ধীকে বিক্রি করা হয় নি , তাদের মুক্তিপণ হবে ছয়টি উটনী যা দুটি কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে"।

ইসলামী মানবাধিকার বিষয়ে কায়রো ঘোষণায় বলা হয়েছে " (ক) বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া , তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অসংগত। কাউকে কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা বা তার মানহানি করা ও তার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা তাকে কোন রকম অমর্যাদা করা যাবে না"। ইসলামের পূর্ব যুগে যুদ্ধ বন্দিদের মেরে ফেলা হত অথবা বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করা হত অথবা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করা হত। ইসলাম বন্দিদের মুক্তি দিতে এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে বলেন - وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا "আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দেয়"।[৪৪৫] বর্তমানে এই ধারণা মানবাধিকারের সনদে স্থান পেয়েছে। যুদ্ধবন্দিদের প্রতি (UHRD আচরণের বিধান প্রনীত হয়েছে , যুদ্ধবন্দিদের অধিকার হিসেবে। যুদ্ধ বন্দিদের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে তা জাতিসংঘ সনদে বর্ননা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯ এ বলা হয়েছে " কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক, অথবা নির্বাসন করা যাবে না। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদে : ৯

(১) প্রত্যেকের স্বাধীনতা এবং দৈনিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। কাউকে স্বেচ্ছাচারমূলক আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না।

(২) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে, গ্রেফতারের সময় তাকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন করতে হবে; এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তাকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।

---

[৪৪৫] আল-কুর'আন, ৭৬ : ৮

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃত অথবা আটক কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে কোন বিচারক কিংবা আইনের দ্বারা বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে এবং অনুরূপ ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিচার অথবা মুক্তি পাবার অধিকারী।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলে আদালতে কার্যাধারা গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে, যাতে আদালত অবিলম্বে তার আটককের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং উক্ত আটক আইনবিরুদ্ধ হলে তার মুক্তির আদেশ দিতে পারেন।

(৫) কোন ব্যক্তি অন্যায় গ্রেফতার অথবা আটকের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎযোগ্য অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

(১) স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত সকল ব্যক্তির প্রতি মানবোচিত এবং মানব ব্যক্তিত্বের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মানসূলভ আচরণ করতে হবে।

(২) (ক) ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দণ্ডিত অপরাধী ব্যক্তিগণ হতে পৃথক রাখতে হবে এবং নিরপরাধ হিসেবে তাদের সঙ্গে পৃথক আচরণ করতে হবে।

(খ) অভিযুক্ত তরুণদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখতে হবে এবং তাদের যথাসম্ভব দ্রুত বিচার করতে হবে।

(৩) কয়েদীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা থাকবে এবং অনুরূপ ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় লক্ষ্য হবে। কয়েদীদের সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসিত করা। তরুণ অপরাধীদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী থেকে পৃথক রাখতে হবে এবং তাদের বয়স ও আইনগত মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের সাথে উপযুক্ত আচরণ করতে হবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ : ৫

(২)গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে যে, ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সে ভাষায়, গ্রেফতারের কারণ এবং তার বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(৩)এই পরিচ্ছদের (১) (গ) পরিচ্ছদের বিধানাবলী অনুসারে গ্রেফতারকৃত বা আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্বর কোন বিচারক অথবা আইনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে এবং তার যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিচার পাবার অথবা বিচার সম্পন্ন হওয়ার সাপেক্ষে মুক্তি রাভের অধিকার থাকবে। অনুরুপ মুক্তি বিচারের জন্য হাজির হওয়ার নিশ্চয়তার শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হলে তিনি (অইনগত) কার্যধারা গ্রহণ করতে পারেন। এই কার্যধারার মাধ্যমে কোন আদালত কর্তৃক তার আটকের বৈধতা সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং যদি আটক আইনসম্মত না হয় তবে তার মুক্তির আদেশ দেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী লঙ্ঘন করে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ফলে তিনি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে তার ক্ষতিপুরণ লাভের বলবৎযোগ্য অধিকার থাকবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে আদিবাসী বা সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গ

সংখ্যালঘু বলতে মূলত একটি দেশের অধিকাংশ জনগণের চেয়ে বিভিন্ন দিক থেকে যারা সংখ্যায় অল্প বা কম থাকে তাদেরকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সংখ্যালগু বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন ধর্মীয়, ভাসাগত, বর্ণগত, Ethnic বা নৃতাত্ত্বিক, নির্বাসিত শ্রমিক/কর্মচারী, উদ্বাস্ত, গৃহহীন ব্যক্তি, জাতীয়তাহীন ইত্যাদি।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ সংখ্যালঘু নাগরিকদের জন্য জিযিয়া কর ধার্য করা হয়। জিযিয়া হল সেই সম্পদ যার উপর সে নিরাপত্তার। যিম্মাদারীর আওতাভূক্ত হওয়ার চুক্তি সম্পাদন করে।[৪৪৬] সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে প্রস্তুত হবে, তারা রাষ্ট্রের নিকট হতে পূর্ণ রিরাপত্তা লাভের গ্যারান্টি পাবে। এ নিশ্চয়তার বিপরীতে তাকে একটি কর দিতে হবে, তাই জিযিয়া । এটা সংখ্যালঘুদের জন্য কোন বিবেচনাই অপমানকর নয়। এটা বিশেস কর যা কেবল সংক্যালঘুদের হতে আদায় করা হয়। যাকাত মুসলমানদের নিকট হতে আদায় করা হয় শরঈী শর্তযুক্ত বলে। অন্যদিকে অমুসলিমদের জন্যও জিযিয়া কর শরঈী নির্দেশ ক্রমেই দিতে হয়। ইসলামী জীবন বিধানকে সকল মানবীয় মতবাদের উপর বিজয় করার মহান যে ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে , এ কার্যক্রমের একটি অংশ হল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্পষ্ট ঘোষণা, “যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দয়েরকারী , তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি লড়ব।”[৪৪৭] বিয়য়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে রাসূল (সা) এর চুক্তিসমূহে। যেমন-“রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত তায়েফবাসীদের একটি আদিবাসী সম্প্রদায় ছিল ছকীফ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তিতে বলা হয়েছে, “ছকীফের গোটা উপত্যকাই ‘হেরেম’ (আল্লাহর সম্মানে সম্মানিত নিষিদ্ধ এলাকা।) সেখানকার বন্য, কাঁটা জাতীয় বৃক্ষ কাটা, সেখানে শিকার করা, যুলুম চুরি এবং যাবতীয় অপকর্ম নিষিদ্ধ। ওজ- উপত্যকায় ছকীফদেরই হক সবার্ধিক। তায়েফ ভুমিতে সামরিক অভিযান চালানো যাবে না। কোন মুসলিম বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসিদের উচ্ছেদ করতে পাবে না। তারা নিজেরা তাদের তায়েফ উপত্যকায় যা ইচ্ছে তাই করবে, যেমন ইচ্ছে ইমারত নির্মাণ করবে। পশু-পখীদের যাকাত আদায়ের জন্য তাদেরকে তাহশীলদারদের নিকট সমেবেত হতে হবে না। তাদের নিকট থেকে উশর আদায় করা হবেনা। তাদেরকে যুদ্ধে যেতে হবে না বা তাদের থেকে যুদ্ধ কর নেয়া হবে না। তারা মুসলিমদের একটি জামায়াতরূপেই গণ্য হবে। এবং মুসলিমদের মধ্যে

[৪৪৬] ইসলামী প্রবন্ধঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৯৯,), খ. ১১, পৃ. ৫৭৮
[৪৪৭] সুনানে আবু দাউদ, পৃ. ৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে।’[৪৪৮] ইসলামী রাষ্ট্রের এ সমস্ত নাগরিক সম্পর্কে ফিকহবিদ সবাই একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সেই অধিকার , মুসলিমরা যতটুকু অধিকার ভোগ করেন। তবে কেবল বিশ্বাসও দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের সাথে কোন মিল নেই , কেননা ইসরাম তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর বহাল থাকার পূর্ণ আযাদী দিয়েছে। উল্লেখ্য ইসলামী রাষ্ট মূলত সকল মানুষের জন্য সকল বৈধ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হতে শুরু করে জীবনের নিরাপত্তা, মালিকানার নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের অধিকার, বিবেক বিশ্বাসের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার সহ সকল অধিকারই এর অর্ন্তভূক্ত। প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম অদিবাসী ও সংখ্যালঘুদেরকে সমাজের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। তাদের ব্যাপার ইসলামী আইনবিদরা নীতিমালা ঠিক করেছেন, তা হল ‘আমাদের জন্যে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদের উপরও তাই।[৪৪৯] ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত কোন অধিবাসী বা সংখ্যালঘু নাগরিককে যদি কোন মুসলিম অবৈধ ভাবে হত্যা করে তবে এ অন্যায় হত্যার জন্য তার উপর কিসাসের আইন প্রযোজ্য হবে।[৪৫০] বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্নিত, তিনি বলেন যে নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ (সংখ্যালঘু) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল সে জান্নাতের কোন গন্ধও পাবে না। সাইয়ীদ রশীদ রিযা (রা.) বলেন ইসলামের দৃষ্টিতে জিযিয়া সে ধরণের কর নয় যা কোন দেশের বিজয়ী বাহিনী বিজিত দের উপর সাধারণ ভাবে ধার্য করে থাকে। বিজয়ীরা ধার্য করে থাকে বড় পরিমাণের জরিমানা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পরিপূরনার্থে। জিযিয়া মূলত খুবই সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হয় এবং তাদ্বারা সেই প্রয়োজন পুরণ করা হয় যা তাদের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে সরকারকে ব্যয় করতে হয়।[৪৫১]

ইসলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত মানবধর্ম, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় এর নির্দের্শ ও প্রতিশ্রুতিগুলো এ কথারই প্রমাণ করে। তাই দেখা যায় বার বার দুনিয়ার অমুসলিম জনতা মুসলিম বিজীকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তারা স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিজয়ীদের জন্য নগরীর ফটক খুলে দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল ওয়াদা পূরণকারী, দয়াশীল, ন্যায় বিচারকারী বিজয়ী মুসলিমদের অধীনতা কল্যাণ বৈ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনবে না।[৪৫২] রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধুমাত্র একটি সুখী সমৃদ্ধি বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য চুক্তিসমূহে আদিবাসি সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। পরবর্তীতে জাতিসংঘ সনদ, ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা, ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজরৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার চেষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশী সংখ্যা লঘুদের অধিকার আদায়ের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন-

১) ১৯৬৫ সালে জতিসংঘ েিষত সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন।

---

[৪৪৮] আবু উবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল(কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারীয়া, ১৪০১)। তাবাকাতে ইবনে সা'াদ, খ.৩, পৃ.৩৩ ও ৫৩; মাকতুবাতে নবভী সাইযদ মহবুব রিযভী, পৃ. ২৩২-২৩৮

[৪৪৯] ড. আব্দুল করিম যায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

[৪৫০] আব্দুল্লাহ জাবেদ, মাযাহেরে হক জাদীদ, *শরহে মেশকাত*(দেওবন্দ : ইরাদাহ্ ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬), খ. ৪, পৃ. ২৭০-২৭২

[৪৫১] ইউসুফ কারযাভী, *শরীয়াতুল ইসলাম*(বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি.), পৃ.২২৭-২৮

[৪৫২] ইবনে কাইউম জওযী, *আহকামু আহলুয যিম্মাহ*(বৈরুত : দারুল ইরম লিল মালায়িন, ১৯৮১), খ. ১, পৃ.৩২০

Dhaka University Institutional Repository

২) ১৯৮১ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত "Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belif)

৩) Declaration on Race and Racial Prejudice (UNESCO, 1978)

মানবাধিকার কমিশনের সহযোগী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথা সংখ্যালঘুদের অধিকার পরীক্ষা করার জন্য স্বাধীনচেতা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে "Tha sub-commission on the prevention of discrimination and protection of Minorities" গঠন করা হয়।

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আরোও অনেক আর্ন্তজাতিক দলিল প্রনয়ন করা হয়। যেমন-

১) গণহত্যা নিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন,১৯৪৮

২) The Declaration of the Principle of International Cultural Co-operation (UNESCO, 1966);

৩) International Convention on the Protection of the Rights of all Migration Workers and Members of the their Families.

৪) The Convention Relating to the Status of Statalessness Person

৫) Convention relating to the status of the refugees.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি বলবৎকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবাধিকার বাস্তবায়নে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নেয়া বাস্তব পদক্ষেপসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়নের চিত্র

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি বলবৎকরণ

রাষ্ট্রের সংবিধানে ও চুক্তিতে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করার পাশাপাাশি তাকে কার্যকর করার ব্যবস্থা এবং উক্ত অধিকার লংঘীত হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদি এ উদ্দেশ্যে কোন সহজ ও ফলপ্রসু পদ্ধতি সংবিধানে না থাকে তা হলে মৌলিক অধিকার শুধু স্বীকৃতই হয়, বাস্তবতা পায়না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাষণ ও চুক্তিসমুহ এ ক্ষেত্রে যথার্থতার পরিচয় দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবিয়ানা মিশন পরিচালনায় মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা মানবাধিকারসমূহ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে যতটা না সম্পৃক্ত তার চেয়ে বেশী সম্পৃক্ত ব্যক্তি এবং সমাজের সাথে। ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন মানেই মানবাধিকার বাস্তবায়ন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবাধিকার রক্ষায় সমাজের গণমানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্য সুশীল সমাজকে সজাগ করতেন। তাইতো আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে উদ্ভাসিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতি বলবৎকরণ ও বাস্তবায়ন দেখতে পাই। ইসলাম মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ইসলামের সোনালী ইতিহাসে তার সফল বাস্তবায়নও করেছে। ইসলামে মানবাধিকার সমূহ বাস্তবায়নের পশ্চাতে খোদায়ী সার্বভৌমত্ব কাজ করে। তাই মানুষ খোদাভীতির কারণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্যে মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ ছাড়া ইহকালীন শান্তির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর খলিফা হিসেবে তার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার সমূহ বাস্তবায়ন করা, নতুবা তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে ইসলাম শুধু মুসলিম এবং অ-মুসলিমদের জন্য কিছু মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ সমস্ত অধিকার যদি কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে উহা বলবৎ করণের বিধানও দিয়েছে। এ অধিকার সমূহ বলবৎকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদালতের মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে পরকালে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। কেননা ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার ব্যপ্তি ইহকাল থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত। আর ইসলামী আইনে মানবাধিকারের ধারণা পরকালের জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে প্রস্তুত হয়েছে। "যদি ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার অধিকার বলবৎকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে।"[১]

ইসলাম নাগরিকদের যে সমস্ত অধিকার ও হক নির্ধারণ করে দিয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও সংরক্ষণ করা। কেননা- মৌলিক অধিকারগুলো অলঙ্ঘনীয় । মানুষের পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, ও বাসস্থান এ পাঁচটি বস্তু না হলে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন সম্ভব নয়।

[১] এ.বি.এম মফিজুল ইসলাম পাটওয়ারী ও মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবাধিকার বাস্তবায়নে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নেয়া বাস্তব পদক্ষেপসমূহ

সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কতগুলো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা এখানে আলোচনার দাবী রাখে। যেমন-

১. **‘হিলফুল ফুযুল’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা :** মহানবী (সা.) আগমনের সমসাময়িককালে যাদের হাতে সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের কোন স্বচ্ছ ধারনা ছিল না বলে প্রতিনিয়ত তাদের হাতে মানবাধিকার ভূলণ্ঠিত ও পর্যুদস্ত হচ্ছিল। জাহেলিয়ার যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগে থাকতো এবং এ সবের কারণে অসংখ্য নারী হতো বিধবা, আর ইয়াতিম হতো অগণিত সন্তান, যুদ্ধ বন্দী হওয়ার পর দাস হতো অনেক নর-নারী ও শিশু। পরবর্তিতে তারা মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হতো। মহানবী (সা.) মানবাধিকারের সংরক্ষণের জন্য জীবন প্রভাতে তথা কিশোর বয়সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ান এবং এই বিপর্যয়কর অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য মাত্র ১৭ বছর বয়সে মানবাধিকারের কতিপয় ধারা সংযোজনপূর্বক কয়েকজন উন্নতমনা যুবক নিয়ে ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে একটি সেবা সংস্থা গঠন করেন যার মূল বক্তব্য ছিল - ‘সমাজ হতে অশান্তি দূর করা, পথিকদের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং কোন অত্যাচারীকে মক্কায় আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়া।’[২] মহানবী (সা.) যৌবনের দাড়প্রান্তে দাঁড়িয়ে হিলফুল ফুযুল গঠনের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাংগঠনিক ভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের সনদ যেন অনেকটা হিলফুযুলের অনুকরণেই প্রণীত হয়েছে।

২. **বায়‘আতুল আকাবার শপথ :** মদিনায় হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জ উপলক্ষে মদীনা হতে মক্কায় আগত খাযরাজ গোত্রীয় লোকদের আল-আকাবা নামক স্থানে যে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ করান তাতে মানবাধিকারের মৌলিক কতিপয় ধারা লক্ষ্য করা যায়। মহানবী (সা.) বলেন, “তোমরা আমার হাতে এ বিষয়ে আনুগত্যের শপথ(বা’আত) কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা-ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে মনগড়া কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না।”[৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উক্ত বাণীতে ধর্ম পালনের অধিকার, সম্পদের অধিকার, মানমর্যাদা ও সম্ভমের অধিকার এবং জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. **মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :** ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহর নির্দেশেই প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হয় মদিনায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় এসে মসজিদুন নববী গড়ে তুলেন মসজিদুন নববীকে কেন্দ্র করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকারের সংরক্ষণে উদ্যোগী হন এবং মানবাধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয়।

৪. **মদীনা সনদের প্রবর্তন :** বহুজাতিক ও বহুধর্ম ভিত্তিক অঞ্চল মদীনার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রধান হিসাবে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের প্রথম বর্ষে একটি লিখিত সনদ প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে এটি ‘মদীনা সনদ’ নামে প্রসিদ্ধ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম

---

[২] ড. আ.ক.ম আব্দুল কাদের, *সীরাতু সায়্যিদিল মুরসালীন*(চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০০১ খৃ.), পৃ. ৩৫-৩৬

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বোখারী (র.), *সহীহ বুখারী*(দিল্লী : কুতুবখানা রশিদীয়া, খ.১, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত সংবিধান। আরবী ভাষায় জারীকৃত এই সনদে ৫৩ টি ধারা বিদ্যমান ছিল যার অনেকগুলো ধারাই ছিল মানবাধিকার বিষয়ক। এখানে বলা হয়েছে যে মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদি , খিষ্টান এবং ইয়াসরিব ও কুরাইশের সকল মুসলিম জনগোষ্ঠি একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং সকলে সমান নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ভোগ করবে। কউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, রাসূলুল্লাহর (সা.) পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিত কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না। ইয়াহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও সস্বাধীনতা ভোগ করবে, বহি:শত্রু দ্বারা মদীনা আক্রান্ত হলে একে রক্ষা করার জন্য সকলে সম্মিলিত প্রায়াস চালাবে। এভাবে 'সমাজের সকল শ্রেনীর নাগরিকের জীবন সম্পদ, সম্ভ্রম ও ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ সম্প্রদায়ের লোকদের পারস্পারিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে রচিত মদীনা সনদ বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান বা শাসনতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা লাভ করে'।[৪] উল্লেখ্য যে মদীনার সংবিধান এভাবে আল্লাহর আইন ও নির্দেশ অনুযায়ি দীনভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলে এবং অতি দ্রুত সমগ্র আরব এবং এর পর সারা দুনিয়ার বিশাল অংশে এটা বিস্তৃত হয়। এভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার সকল দিকে, সকল দেশে, সমাজে, সকল জনপদে। মদীনা সনদকে সামনে এনে ইসলাম এক বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (perfect and complete life system) উপহার দেয় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে সমগ্র সৃষ্ট জগতের জন্য। ইসলামের বাণী ও বাস্তবতা তাই সর্বজনীণ (universal)। [৫]

৫. **ইসলামিক অর্থ ব্যাবস্থা প্রবর্তন :** ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই ইসলাম যাকাতকে স্থায়ীভাবে ফরয করে দিয়েছে। মানবাধিকার বাস্তবায়নে রাসূল (সা.) বলেন, "ইহা (যাকাত) ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে।"

৬. **প্রতিকার মূলক যুদ্ধ নীতি :** মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) কে আল্লাহর অনুমতিক্রমে অনেক গুলো যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হয়েছে। আর সবগুলো যুদ্ধ ছিলো প্রতিকার মূলক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তিকে সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপনের লক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষ্যম।"[৬] মানবাধিকার বাস্তবায়নে যুদ্ধের নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এভাবে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "তোমাদের কি হয়েছে তোমারা কেন যুদ্ধ করছো না"[৭] আবার যুদ্ধ করতে যেয়ে যেন সীমা লজ্ঘনের মাধ্যমে মানবাধিকার বিপর্যস্ত না হয় এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন– وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করো কিন্তু সীমা

---

[৪] Dr. Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahor : Shah Muhammad Ashraf, 1981.), p.4

[৫] ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *মদীনা সনদ একটি গভীর পুনঃনিরীক্ষা*(ঢাকা : বর্ষা প্রাইভেট রিমিটেড, জুলাই,২০১৩ খৃ.), পৃ. ৬১

[৬] আল-কুরআন, ২২ : ৩৯

[৭] আল-কুরআন, ৪ : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

লঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘন কারীদের পছন্দ করেন না।"[৮] রাসূলুল্লাহর (সা.) এর যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধ্যমত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুর আগ্রাসী শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। মক্কা বিজয় অভিযানে এই নীতি অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বদা মজবুত রাখতেন, যাতে শত্রুপক্ষের মুসলিম শক্তির উপর আক্রমণের মনোবল চিরতরে ভেঙ্গে যায়।

৭. **যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধি চুক্তিসমূহ :** রাসূলুল্লাহর (সা.) সন্ধি চুক্তিসমহে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । মহানবী (সা.) যুদ্ধ করেছেন শান্তির দূত হিসেবে শান্তির জন্য, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাইতো দেখা যায় যখনই যুদ্ধবিরতির চুক্তি প্রস্তাব এসেছে তিনি তাৎক্ষণাৎ তাতে সম্মত হয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি তার জলন্ত ও কালজয়ী উদাহারণ। পরবর্তীতে মক্কাবিজয়ের ক্ষেত্রেও হুদায়বিয়ার সন্ধি সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাত্হুম মবীন বা সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কুর'আন মজিদের এরশাদ হয়েছে– إن فتحنا لك فتحًا مُبِينًا "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"[৯] মানবাধিকার বাস্তবায়নে মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার চুক্তি সহ অনেক চুক্তি করেছিলেন।' রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবের বিভিন্ন প্রবাবশালী গোত্রের সাথে যেসব চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন , সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ত্রিশটি চুক্তির মূল পাঠ অবিকলভাবে হাদিস গ্রন্থসমুহে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্তত তিনশো গোত্রপতির সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের সাথে শান্তি চুক্তি মেনে নিতে সম্মত করেছেন।'[১০] বস্তুত বিশ্বে শান্তি, সৌহার্দ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সন্ধি চুক্তিসমূহ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

৮. **মক্কা বিজয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা :** মানবাধিকার বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয়েছে মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সা.) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে। যেমন মক্কা বিজয়ের পর শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি যেভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেন বিশ্বের ইতিহাসের এর কোন তুলনা নেই। বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশের সাথে সাথে মহানবী (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন "আমার ও আমার অনুগামীদের প্রতি অমানুষিক দুর্ব্যবহারের জন্য আজ তোমাদের তিরস্কার করছিনা। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন, তিনি পরম দয়ালু।"

৯. বিদায় হজ্জের যুগান্তকারী ভাষণ : বিদায় হজ্জে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর (সা.) এর ঐতিহাসিক ভাষণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। কোন আন্দোলন কিংবা সংগ্রামের মুখে নয়, কোন চাপের মুখে নয়, কোন চাপের কাছে নত স্বীকার করে নয়, সম্পূর্ণ নবুওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে স্বত:স্ফুর্তভাবে প্রদত্ত এই ভাষণে তিনি মানবাধিকার বিষয়ে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন তা অবিস্মরণীয়। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক এই ভাষণে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রদানের বিষয়টি জাতি সংঘের The Universel Diclaration of Human Rights 1948 এর ৩,৬,ও ১৭ নং নং

---

[৮] আল-কুরআন, ২ : ১৯০

[৯] আল কুরআন, ৪৮ :১

[১০] মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী (সম্পাদিত), *রাসূলুল্লাহর (সা.) এর হুদায়বিয়ার সন্ধি*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল- ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মানবাধিকার বিষয়টি UDHR এর ১৬ নং এং International Covenent of Civil and Political Rights(ICCPR) এর ২৩ নং অনুচ্ছেদে স্থান লাভ করে। ভাষণে বিধৃত ইসলামী ভ্রাতৃতবোধ UDHR এর ১ নং অনুচ্ছেদে মানুষের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে দাসদাসীর অধিকারের কথা যা UDHRএর ৪নং অনুচ্ছেদ এবং ICCPRএর ৮ নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বস্তুত মানব জাতির ত্রাণকর্তা বিশ্বনবীর (সা.) আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক পরিস্থিতিতে যখন সমগ্র মানবজাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন হত মানবাধিকার। তদানিন্তন মিসর, ভারত, ব্যবিলন, নিনোভা, গ্রীস ও চীনে সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রোম ও পারস্যে সভ্যতার পতাকা উড়ছিল। সেই রোমান ও ইরানী সভ্যতার বাহ্যিক জাকজমক চোখ ঝলসে দিত। অথচ নয়নাভিরাম প্রসাদের অভ্যন্তরে চলতো মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ লোমহর্ষক জুলুম ও নির্যাতন।

রাজা বাদশাদের ক্ষমতার পালা বদলেও উত্থান পতন নিত্যনতুন বিজেতাদের আবির্ভাব এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে পরিস্থিতির সাময়িক যে পরিবর্তন ঘটতো তাতেও সাধারণ মানুষের কোন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হতোনা। প্রত্যেক পরির্তনের পর সাধারণ মানুষ আরো বেশী করে শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হতো। যে শক্তিই ক্ষমতার রঙগমঞ্চে আবির্ভুত হতো সে সাধারণ মানুষকেই শোষণের হাতিয়ার বানিয়ে তাদের রক্তকে পুঁজি করে এবং তাদেরই শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকা পোক্ত করতো এবং বিজয় ও কর্তৃত্ব অর্জনের পর সে পূর্বসূরীদেরও বড় জুলুমবাজ ও বড় শোষকে পরিণত হতো। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘাত, সংঘর্ষ সংঘটিত হতো ধর্মীয় উপদলগুলো পরস্পরের রক্ত ঝরাতো, আর এ সব দাঙ্গা হাঙ্গামায় দলিত মথিত হতো। মানুষের মানবিক মর্যাদা লাঞ্চিত ও ভুলুণ্ঠিত মানবাধিকার। যখন সারা বিশ্ব জুড়ে ইতিহাসের ভয়াবহতম বীভৎসতম অরাজকতা দেখা দিল, তখন সেই অরাজকতার ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আকস্মিকভাবে জেগে উঠল মানবতার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, বিশ্ববাসীর আলোর মশাল। তার আলোকিত শাসন সমকালীন সামাজিক বিপর্যয়ের অন্ধকারের বুক চিরে চতুর্দিককে করলো উৎভাসিত।

মানবজাতির ত্রানকর্তা এই মহামানব পরিপূর্ণ সমাজ সচেতনতা সহকারে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তনের সাধনাকেই নিজের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সা.) এর মহান আন্দোলন এক অন্য বিপ্লব সংঘঠিত করার মাধ্যমে যে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার মূল কালেমার ও মানবাধিকারের চেতনা ও প্রেরণা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকল প্রতিষ্ঠান ছিল একই রঙে রঞ্জিত ও একই ভাবধারায় উজ্জবীতি।

মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়নের জন্য মানবতার মুক্তি দূত বিশ্বনবী (সা.) যে বিপ্লব সংঘঠিত করেন, তার প্রাণশক্তি হিংস্রতা ও বল প্রয়োগ ছিল না বরং হিতকামনা, ভালবাসা ও মানবাধিকারের চেতনা ছিল তার চালিকা শক্তি।

রাসূল (সা.) দশবছর মদীনায় কাটান, তার পূর্বের সময়টি ছিল সাংঘাতিক রকমের জরুরী অবস্থার আওতাধীন। মদীনার বাইরে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্র মদীনার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য নানা

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে নানা দিক থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। টহল দেয়ার জন্য মদীনা থেকে ছোট ছোট সেনা দল পাঠানো হতো। রাতের বেলা সাময়িক প্রহরা বসানো হতো।

সামরিক শিবিরের মত জীবন যাপন করা হতো। তদুপরি ইয়াহুদী ও মোনাফেকদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র জনজীবনকে করে তুলত দুর্বিসহ। কখনো যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র, কখনো মুসলিম সমাজকে খন্ড-বিখন্ড করা ও মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বাধানোর ষড়যন্ত্র। কখনো রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বকে ব্যর্থ ও বিফল করার ষড়যন্ত্র এমনকি কখনো কখনো স্বয়ং রাসূল (সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও পাকানো হতো । এর চেয়ে মারাত্মক অবস্থা আর কি হতে পারে।

রাসূল (সা.) এমনি প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেছেন ব্যক্তি জীবনে ও নবীয়ানা জীবনে। আর তাইতো রাসূল (সা.) কখনো এক নায়ক সূলভ ভূমিকাও পালন করেননি। কোন জরুরী অবস্থা সূলভ আইন ও জারী করেন নি। কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে কারাগারে পাঠাননি। জরুরী অবস্থাকালীন সংক্ষিপ্ত আদালত ও বসাননি। চাবুক মেরে মানুষের চামড়াও তোলেন নি। কারো উপর জরিমানাও আরোপ করেননি। কোন নাগরিকের ওপর আল্লাহর আইনের অতিরিক্ত বোঝাও চাপাননি। সমালোচনা ও ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারও হরণ করেননি। কারো ওপর কোন বিধিনিষেধ ও আরোপ করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনোই মানবাধিকার লঙ্ঘন করেননি। তাঁর অন্তরে যে খোদা প্রেম ছিল তারই আরেক রূপ ছিল প্রগাঢ় মানব প্রেম। মক্কা বাসীগণ যখন দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো, তখন তাদেরকে তিনি মদিনা হতে শস্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন এবং পাঁচশত মুদ্রাও পাঠিয়েছিলেন। অথচ এই মক্কা বাসী রাসূল (সা.) এর পরিবারও অনুসারীদের নিয়ে 'শি'আবে আবু তালিব' নামক স্থানে অবরোধ করে রেখেছিল।

বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ বন্দীদের 'উহু' আহ্ শব্দ কানে যাওয়া মাত্র তাঁর ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ায় এবং তাৎক্ষণিক তাদের বাধন ঢিল করে দেওয়ার ঘটনা থেকেও তাঁর মানব দরদী স্বভাব আঁচ করা যায়।

মক্কা বিজয়ের সময় তার অভাবণীয় আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। মানবাতার এই মুক্তির দূত একজন পরিপূর্ণ বিজেতা হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যারা বিশ বছর ধরে লড়েছে তাঁর সামনে একেবারেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। অন্য কেউ হলে প্রতিটি আক্রমণের প্রতিশোধ নিত। ব্যাপক গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে তবেই ছাড়তো। লাশের স্তুপ না ফেলে কিছুতেই যেতনা । আরব সমাজের সর্বজন স্বীকৃত রীতি প্রথার কথাই অথবা নৈতিকতার অথবা আইনের কথাই ধরা যাক না কেন সব কিছুর বিচারেই মক্কাবাসী ছিল ঘোরতর অপরাধী। ধর্ম ও রাজনীতির উভয় দিক দিয়েই তাদের ন্যায্য প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রানদন্ড। কিন্তু বিজয়ের মুহূতে রাসূল (সা.) এর হৃদয় মানব প্রেমে বিগলিত হয়ে গেল এবং কোরেশদের অত্যাচার অজ্ঞতাভুক্ত করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন-

"তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর কোন অভিযোগ নেই । যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন"

ঐতিহাসিক গিবনের ভাষায় বলা যায় ' In the long history of the world there is no instance of magnamity and forgivness which can approach those of Muhammad (s) when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all.[১১]

[১১] অধ্যাপক হাসান আব্দুল কায়্যূম, *শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.), সীরাত স্মরণিকা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মদ(সা.)এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়নের চিত্র

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল মুসলমানদের আদর্শ ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন গোটা মানব জাতির আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" বলুন, হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল।"[১২] শান্তি দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সারা জীবনে ইসলামী আদর্শকে প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানবাধিকারের বিষয়টি তাঁর কথায়, কাজে, অনুমোদনে তথা সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। যার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই–

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের বিভিন্নকর্মকান্ডে মানবাধিকার বাস্তবায়ন : যেমন-

(ক) **ব্যক্তিগত দিক :** কাউকে কোন স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা দিতে চাইলে নিজের সহযোগীদের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে নিজের জামাই আবুল আস যুদ্ধবন্ধী হয়ে এলে তার মুক্তিপণ হিসাবে হযরত যয়নব যে হার পাঠান তা ছিল খাদীজার (রা.) স্মৃতি। ঐ হার ফেরত দেয়ার জন্য রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের অনুমতি চান। "জারান নামক স্থানে হোনাইনের যুদ্ধ বন্দিদের মুক্ত করার আবেদন জানাতে একটি প্রতিনিধি দল এল এবং রাসূল (সা.) এর দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন জানালো। ততক্ষনে যুদ্ধ বন্দিদের ভাগ বাটোয়ারা সম্পন্ন হয়ে গেছে। রাসূল (সা.) নিজ গোত্র বানু হাশেমের অংশের বন্দিদের মুক্তি দিতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু অবশিষ্টের সম্পর্কে বললেন যে, সাহাবাদের প্রকাশ্য সমাবেশে তোমরা আবেদন জানাও। সাহাবাগণ যখন জানতে পারলেন যে রাসূল (সা.) নিজ গোত্রের অংশের বন্দিদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন তখন সবাই বন্দীদেরকে ছেড়ে দিল। এরূপ ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ জবরদস্তিমূলক কাজ সম্পন্ন করতেন না।"

(খ.) **রাজনৈতিক দিক :** রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় তিনি নিজের জন্য কোন অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি, কারো বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশ ও নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করেননি। নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য কোন স্বৈরাচারী আইন জারী করেননি। মদীনায় সব সময়ে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করত। ইয়াহুদী ও মোনাফিকদের নিত্য নতুন চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হত। তবুও কাউকে তিনি গ্রেফতার বা হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেননি। কারো চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী কোন আদেশ জারি করেননি। কোন সংক্ষিপ্ত আদালত বসাননি। আর বেত্রাঘাত করেও কারো চামড়া খসাননি। কাউকে রিমান্ডের আদেশ দিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেননি। বাক-স্বাধীনতা বন্ধ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেননি। বরঞ্চ মানুষকে সমালোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিভিন্ন মত অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁর মহৎ পরামর্শকে গ্রহণ না

বাংলাদেশ, ১৪১৫ হি.), পৃ.৩৮

[১২] আল-কুরআন, ৭ : ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

করার অধিকার ও দিয়েছেন। এসব অধিকার কেবল কাগুজে অধিকার ছিল না। লোকেরা এ সব অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ ও ভোগ করেছে। অনেক সময় রাসূল (সা.) নিজের মূল্যবান মত পরিত্যাগ করে অন্যদের মতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

(গ) **অর্থনৈতিক দিক :** অর্থনৈতিক দিকটি আমরা বিবেচনা করতে পারি। রাসূল (সা.) নিজের লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যকে কুরবানী করলেন তা থেকে উপার্জিত সমস্ত পুঁজি এই মহৎ কাজের জন্য উৎসর্গ করলেন। আর যখন সাফল্যের যুগ এল তখন অঢেল ধন-সম্পদ আর্তমানবতার পুনর্বাসনে স্বহস্তে দান করলেন। নিজের জন্য ক্ষুধা দারিদ্র্য ও অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিলেন। নিজের পরিবারের পরিজনের জন্য একটুও সঞ্চয় রেখে গেলেন না তাদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে কোন স্থায়ী ক্ষমতার গদিও রেখে গেলেন না এবং চাকর, নকর, রংবেরঙের বাহন,জন্তু ও বিলাসী সামগ্রী দিয়ে বাড়ী ভরে তুলেন নি।

২. **যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাদিকার বাস্তবায়ন :** মহানবী (সা.) মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন যুদ্ধ বন্দিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। জাহেলী ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দীরা বিজেতা পক্ষের করুণার পাত্র হত। সাধারণত তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন ও অসদাচারণ করা হতো এবং তাদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা হত। এমনকি আজকের সভ্য যুগেও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে পাশবিক আচরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাসূল (সা.) যুদ্ধ বন্দীদের নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করনে। তদেরকে আরামে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। কোন কোন সাহাবী এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজে খেজুর খেলে বন্দীদেরকে পেট পুরে উন্নত মানের খাবার খাওয়াতেন। হযরত মুস'আব ইবনে উমাইয়ের (রা.) এর ভাই বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী আবু আযীয স্বয়ং বর্ণনা করেন- "যে সমস্ত আনসার আমাকে তাদের গৃহে আবদ্ধ রাখেন, যখন সকাল বা সন্ধ্যা হয় তখন খাবার নিয়ে আসতেন তখন আমার সামনে তারা রুটি দিয়ে নিজেরা খেজুর খেতেন। তাতে আমি খুবই লজ্জা পেতাম। আমি তুলে নিয়ে তাঁদের হাতে দিয়ে দিতাম; কিন্তু তারা তাতে হাতও লাগাত না। আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এর এক মাত্র কারণ ছিল এই যে, রাসূল (সা.)তাদের কে বন্দীদের সাঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[১৩] এবং যে সব বন্দীদের কাপড় চোপড় কম থাকতো তাদেরকে কাপড় দেয়া হতো।

৩. **ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার চেতনার বাস্তবায়ন :** ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার চেতনার সফল বাস্তবায়ন হয়েছিল। ইসলামী আন্দোলন যুক্তি বলে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, গোত্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার বিপরীত একটা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলেছিল। অসংগঠিত মানব গোষ্ঠীগুলোকে সংঘবদ্ধ করেছিল এবং নৈরাজ্যবাদী ও আইন মেনে চলতে নারাজ একটি সমাজের স্থলে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাষ্ট্র তৈরী করেছিল। মানবাধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দখলদার ব্যক্তির সহিত জেহাদ করা। আর ইসলামে জেহাদের তাত্বিক দিক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নয় যে, কেবল আক্রমণ চলালেই, মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেই বাধ্য হয়ে তার মুখামুখী হতে হয়। বরং ইসলাম এ

---

৭. তাবারী, পৃ.১৩৩৮। উদ্ধৃতি, আল্লামা শিবলী নো'মানী(রহ.) ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ দেয় যে 'ইসলামী বিপ্লবের আহ্বায়কগণ একদিকে তাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি ইঞ্চি জমি, তার যাবতীয় সহায় সম্পদের এবং নাগরিকদের প্রাণ সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজেরদের জান ও মালের সর্বাত্মক কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবে। অপর দিকে আল্লাহর কোন বান্দা বা কোন মানব গোষ্ঠীকে জুলুম শোষণ, অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার মাধ্যমে বিপ্লব সাধনের জন্য বিপ্লব বিরোধী শক্তিগুলোকে উৎখাত করবে। তাইতো আমরা দেখতে পাই মানবাধিকার বাস্তবায়ন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মে দীক্ষিত পরিসরে অমুসলিমদেরকে দিয়েছে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা । ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার জন্য তরবারী ধারণ করেননি, বরং আন্দোলন, সামগ্রিক জীবন বিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে তরবারী ধারণ করেছিল।

৪. **নারী অধিকার বাস্তবায়ন :** মানব সব্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসেবে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীক্রতি দেন, পরিবার ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণ আকারে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির যিনি প্রবক্তা তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। নারীর প্রকৃত মুক্তি, তার স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) এক অন্যন্য সাধারণ দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন যা বর্তমান নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির ধারণার চেয়ে বহুগুণে উন্নত, পরিণত ও সুদূর প্রসারী। প্রখ্যাত লেখিকা নাসিমা খাতুন তার একটি গবেষণা নিবন্ধে বিসয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'Within the twenty-tree yrars during which the prophet Muhammad (peace be upon him!) promulgated the Message of Islam, the position of woman was raised from the loest degradation to the greatest hights of esteem, honour and respect'।[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত নারী স্বাধীনতা ও নারী মর্যাদাকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও জীবনাদর্শের সাথে তুলনা করে মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট বলেন, He (Muhammad) was probably of womens rights the world has ever seen.[১৫]

৫. **শিশু অধিকার বাস্তবায়ন:** শিশুর খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি শিমুকে জাগতিক , নৈতিক, অধ্যাত্মিক, পারিপার্শ্বিক, শিষ্টাচার, আক্বীকা, খাতনা, সুন্দর একটি নাম নির্ধারণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষায় উজ্জীবিত করা প্রতিটি পিতামাতার অন্যতম দায়িত্ব। নবী (সা.) বলেন- 'কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।'[১৬]

৬. **ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকার চেতনার বাস্তবায়ন :** ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকারের বাস্তবায়ন করেছিলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যেমন 'মদিনার

---

[১৪] Nasima Khatun, *The ststuse and righyts of Women in Islam,* Social Science Review, A Journal of the Faculty of Social Science,(Dhaka : University of Dhaka, VOL-XVI, No 1, June 1999), p.410

[১৫] সৈয়দ আলী আশরাফ, *সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সীরাত স্মরণিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাতেশ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ২৩

[১৬] আল-হাদী। উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তহশীলদার যখন খায়বরের ইয়াহুদীদের কাছে রাজস্ব আদায় করতে গেল, তখন তার বণ্টনের নির্ভুলতা দেখে তারা সাক্ষ্য দয়ে যে, এটাই যথার্থ ন্যায় বিচার যার উপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে।' ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সকলের সাথে সমান ব্যবহারের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

يَ

[redacted] أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাক এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে সুবিচার কর তাকওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।"[৮] অন্যত্র আল্লাহ বলেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ

[redacted] عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষী হও। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। আর ধনী কিংবা গরীব যাই হোক– তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের বশবর্তী হয়ে ন্যায় বিচার থেকে বিরত থেক না।"[৯]

৭. **আইনের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সাম্যের অধিকার বাস্তবায়ন :** আইনের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সাম্যের অধিকার বাস্তবায়নে মহানবী (সা.) বলেন : "কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ শাসকই আল্লাহ নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটে উপবেশনকারী্ পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে অত্যাচারী শাসক।" কোন উচ্চ আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কারাদণ্ড দেয়া যায় না। কেননা ব্যক্তিকে কেবল সন্দেহের বশে কারাগু দেয়া, বিনা বিচারে ছলচাতুরির মাধ্যমে নিরাপত্তাবন্দী করে রাখা ইসলাম সমর্থন করে না। এই অধিকার বাস্তবায়নে আমরা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। হাদীসে এসেছে "একবার রাসূলে করীম (সা.) মসজিদে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আমার প্রবিবেশীদের গ্রেফতার করা হয়েছে? রাসূল (সা.) লোকটির প্রশ্ন শুনেও স্থিরভাবে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি পুনরায় দাঁড়িয়ে হুজুরের প্রতি একই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। কিন্তু এর পরেও তিনি তাঁর বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছিলেন। লোকটি তৃতীয় বারের মত উঠে আবারো একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। ঘটনাক্রমে যে পুলিশ অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট লোকদের বন্দী হয় তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর রাসূল (সা.) এই বলে রায় দিলেন যে, বন্দি লোকদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। এটা প্রশাসকের জন্য অস্বাভাবিক নয় যে, প্রশাসনিক গোপনীয়তা জনতার সম্মুকে প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু

৮ আল-কুরআন, ৫ : ৮

৯ আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তবুও অফিসারের দায়িত্ব ছিল উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এই বলে অবহিত করা যে, অভিযোগ সম্পর্কে প্রশাসন খুবই সতর্ক কিন্তু তাই বলে তা জনতার সম্মুখ প্রকাশ করা যাবে না। প্রশাসনের উপযুক্ত ও যথার্থ কারণ থাকতে পারে লোকটিকে আটক রাখার। উত্তর দানে তাঁর ব্যর্থতা এটাই প্রমাণ করে যে, বন্দিরা সবাই নির্দোষ।"

৮. **মানবাধিকার বাস্তবায়নে জিম্মীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন :** মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। "আনসারদের বানু যাফর গোত্রের 'তো'মা' (طعمة) নামক এক ব্যক্তি এক আনসারীর লৌহ-বর্ম চুরি করে। অতঃপর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে তা এক ইয়াহুদির নিকট গচ্ছিত রেখে তার উপর চুরির অপবাদ আরোপ করে। গোত্রের লোকেরা তাকে বাঁচানোর জন্য এক বাক্যে ইয়াহুদীর উপর চুরির অপবাদ আরোপ করে। তারা মহানবীর (সা.) এর নিকট তো'মার (طعمة) ঈমানদার হওয়া এবং ইয়াহুদীর মুশরিক হওয়ার ভিত্তিতে তার সাফাই গ্রহণ না করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পীড়া পীড়ি করে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে মামলার রায় প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ওপর ওহী নাযিল করেন এবং ঘটনার মূল রহস্য তাঁর সামনে তুলে ধরেন। আল্লাহ তা'আলা নিরপরাধ ইয়াহুদীর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারী মুসলিমকে কঠোর সর্তকবাণী শুনিয়ে বলেন: "হে নবী! আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি যেন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন তদানুসারে লোকদের মধ্যে ফয়সালা করতে পর। আপনি প্রতারক ও দুর্নীতিবাজদের সমর্থনে বিতর্ককারী হবেন না। আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে আপনি তাদের সাহায্য করবেন না। আল্লাহ প্রতারক ও পাপিষ্ঠদের পছন্দ করেন না। এরা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের অপকর্ম লুকাতে পারে কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সেই সময় তোদের সাথে থাকেন যখন তারা রাতের বেলা গোপনে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে পরামর্শ করে থাকে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহর আওতাধীন। হ্যাঁ তোমরা এ সব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে পার্থিব জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে, কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের কে উকীল হবে? কেউ যদি কোন পাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের উপর জুলুম করে এবং তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজে অন্যায় বা পাপ কাজ করে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তির উপর দোষ চাপায় সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফয়সালা করেই ফেলেছিল যদিও আসলে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কাউকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারতনা। আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার জানা ছিল না। অপনার উপর রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।[১০] আমরা উপরোক্ত আয়াত থেকে অনুধাবন করতে পারি যে, একজন নিরপরাধ

১০ আল কুরআন, ৪ : ১০৫-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে সে মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা এবং তাকে যে অপরাধ সে করেনি তার শাস্তি দেয়া আল্লাহর নিকট মারাত্মক অপরাধ এবং তিনি ওহী নাযিল করে কিভাবে এক মুসলিম ও তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে এক ইয়াহুদীকে নিরপরাধ ঘোষণা করলেন! এমনি প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূল (সা.) এই জিম্মীদের ব্যাপার বলেন: "সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর জুলুম করবে অথবা তাদের অধিকার খর্ব করবে অথবা তাদের সামর্থের অধিক তাদের উপর বোঝা চাপাবে অথবা তাদের অসম্মতিতে তাদের নিকট থেকে কিছু আদায় করবে– কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি নিজেই বাদী হব।"[১১]

৯. **সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বাস্তবায়ন :** সংখ্যালঘুদের অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসকারী অনুগত প্রতিটি সংখ্যালঘুর জান ও মালের নিরাপত্তার বিধান করা ইসলামী সরকার ও প্রতিটি মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। নজরানবাসীদের সঙ্গে নবী করীম (সা.) যে চুক্তি করেছিলেন তাতে অত্যন্ত পরিষ্কার করে তিনি বলেছেন "এদের জন্য আল্লাহর ও তার রাসূলের জামানত দেয়া হচ্ছে যে, তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত এবং অধীনস্থ সকলের জন্য।"[২২] ইসলামী রাষ্ট্র চরম আদর্শবাদী রাষ্ট্র হওয়ার জন্যই সংখ্যা লঘুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে নযীর বিহীন উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। সংখ্যা লঘুদের পূর্ণ আযাদীর সঙ্গে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। নজরান বাসীদের সঙ্গে নবী করীম (সা.) যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন এতে স্পষ্ট করে বলেছেন "তাদের ধর্মীয় স্থাপনা সরানো যাবে না। তাদের ধর্মীয় সন্যাসীদেরকে উক্ত্যক্ত এবং গীর্জার চাবি রক্ষককে তাঁর কাজ হতে পদচ্যুত করা হবে না।"

১০. **অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন :** অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নে ইসলাম বদ্ধপরিকর। মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্যই শরী'আত যাকাত, ফিতরা, কুরবানী, কাফফারা প্রভৃতির ফরয ও নফল দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ফারায়েয বা শরী'আতের উত্তরাধিকার বিধি দ্বারা মেয়ে সন্তানসহ সকল সন্তানের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে এবং এত সব সত্ত্বেও কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার লাভ বিঘ্নিত না হওয়ার জন্য ইসলাম রাষ্ট্রকে যাকাত ছাড়াও অন্যবিধ কর আরোপের ক্ষমতা দিয়েছেন। এমনকি কোন ব্যক্তি ঋণী অবস্থায় মারা গেলে তার ঋণ শোধের দায়িত্বও ইসলামে সরকারের উপর বর্তায়। মহানবী (সা.) এই অধিকার বাস্তবায়নে বলেন–"যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায়, তার ঋণ শোধের দায়িত্ব আমার তথা সরকারের।"

১১. **অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন :** শারীরিক বিকলাঙ্গতা, আয়ের উৎসের অভাব অথবা আল্লাহর রাহে মিশনারী কাজে নিয়োজিত হবার দরুন যারা অর্থনীতি ও জীবন যাপনের প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে গেছে, ইসলাম তাদের সামাজিক সুবিচারের নীতি অনুযায়ী যাকাত, ফিতরা প্রভৃতি দ্বারা সে সব পিছনে পড়া লোকদের মাঝে বন্টন করে। এটা সমাজের কৃপার আকারে নয় বরং তাদের ন্যায্য পাওনা হিসেবেই দেয়া হয়ে থাকে।

---

১১ আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ। উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত,পৃ.২৯৮

২২ কিতাবুল আমওয়াল। উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আল কুর'আন গোটামানব সমাজকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি আর্দশ সমাজে পরিণত করার পথ নির্দেশ দান করেছেন। শুধু সাদকা, যাকাতই নয় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ফরয যাকাতের পরও ন্যূনতম জীবিকা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য তার নাগরিকদের উপর কর আরোপ করার অধিকার রাখে। মানবাধিকার বাস্তবায়নে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। শরহে শেরআলী কিতাবে ইমাম তথা সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

১. তিনি কোন দরিদ্রকে দরিদ্র রাখবেন না।

২. কোন ঋণীকে ঋণী থাকতে দেবেন না।

৩. কোন দুর্বলের সহায়তা না করে বা অত্যাচারিতের সাহায্য না করে থাকবেন না।

৪. কোন জালিমকে দমন না করে ছাড়বেনা।

৫. কোন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র না দিয়ে থাকবেন না।[১৮] নাগরিকের ন্যূনতম জৈব অধিকার থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও নাগরিক যাবতীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে আল কুর'আন, যেমন বলা হয়েছে- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "যে স্বচ্ছল, সে যেন কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাকে আর যে অভাবগ্রস্থ, সে যেন সংযত হারে গ্রহণ করে।"[১৯] নবী করিম (সা.) বলেন, যে আমাদের কোন (সরকারী) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার প্রাপ্য হলো-

১. যদি তার স্ত্রী না থাকে তবে সে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

২. যদি ঘর না থাকে, ঘর তৈরী করতে পারে।

৩. যদি তার বাহন না থাকে, একটা বাহন নিতে পারে।

৪. যদি তার সেবক না থাকে একজন সেবক নিতে পারে।

তার বাইরে কিছু করলে তা নগদ অর্থই হোক আর উটই হোক কাল কিয়ামতে তহবিল তসরুপকারী চোরের বেশে আল্লাহ তাকে উঠাবেন।[২০] সুতরাং ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় যেমন একজন নাগরিক তার ন্যূনতম জৈব প্রয়োজন সামগ্রী পাবে, তেমনি একজন সরকারী কর্মচারীও প্রয়োজনের অধিক সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।

১২. **ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার বাস্তবায়ন :** ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার বাস্তবায়নে ইসলাম দাস মুক্তির উৎসাহ দিয়েছিল এবং দ্বার উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল। নবী করীম (সা.) নিজে ৬৩ জনকে, হযরত আয়েশা (রা.) ৬৭ জনকে, হযরত আব্বাস (রা.) ৭০ জনকে হযরত উমর (রা.) ১০০০ জনকে, ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) ৩০,০০০ দাসকে মুক্ত করেছিল। মুক্ত মানুষকে দাসে পরিণত করার বিরুদ্ধে হযরত (সা.) এর কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।[১৭]

---

১৮ মাও.নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১৯ আল-কুরআন, ৪ : ৬

২০ কিতাবুল আমওয়াল বরাতে , মাও. নূর আজমীর রচনাবলী, পৃ. ৯৭। উদ্ধৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, পৃ.১২০

১৬ সম্পাদনা পরিষদ,*ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খৃ.), পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

১৩. **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল, অভিবাসণ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তণে অধিকার বাস্তবায়ন** : ইসলাম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল, বসতি স্থাপন, দেশত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির অধিকার গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা ও পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মক্কা ও মদীনার মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে, কূফা, দামেস্ক, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

মানবাধিকার বাস্তায়নে খেলাফাতে রাশেদা : মানবাধিকার বাস্তবায়নে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা.)এর খেলাফত কালের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা)এর খেলাফতকালে মুসলিমদের দুর্নাম গেয়ে ব্যঙ্গ কবিতা পাঠকারী এক নারীর দাঁত উপড়ে ফেলা হয়। তিনি এ কথা জানতে পেরে গভর্ণর মুহাজির ইবনে উমায়্যাকে লিখে পাঠান: আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমানদের দুর্নাম করে যে নারী ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াত তার সামনের পাটির দাঁত তোমরা উপড়ে ফেলেছ। এই নারী যদি মুসলিম হয়ে থাকে তবে তার জন্য ভৎর্সনা ও তিরস্কারই যথেষ্ট ছিল, তাকে নির্যাতনের চেয়ে হালকা শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। আর যদি সে জিম্মি হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রে তার শিরক এর মত মহাপাপ যখন বরদাশত করা হচ্ছে সেখানে মুসলিমদের দুর্নাম আর কি? আমি যদি এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে তোমাদের সতর্ক করে থাকতাম তবে তোমাদের ঐ শাস্তির প্রতিফল ভোগ করতে হত।”[১২] দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) অন্তিম শয্যায় জিম্মীদের সাথে সদাচরণ সম্পর্কে চিন্তা করতেন। আততায়ীর তরবারীর আঘাতে চরমভাবে আহত হয়ে দুর্বল ও শান্ত হয়ে পড়েছেন এই অবস্থায় তিনি জিম্মিদের সম্পর্কে অসিয়ত করেছেন। “আমার পরে যিনি খলিফা হবেন আমি তাঁকে এই অসিয়ত করছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সব লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের সাথে কৃত চুক্তি মেনে চলতে হবে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যাবে না।”[১৩]

মানবাধিকার বাস্তবায়নে খেলাফাতে রাশেদার পরবর্তী শাসকগণ

মহানবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই নয়, বরং বানু উমায়্যা, বানু আব্বাস, এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকগণের যুগেও অমুসলিম সংখ্যালঘু সাম্প্রদায় নিজেদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাত্তা ভোগ করে আসছিল। একথার স্বীকৃতি দিয়ে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারী ওয়াট লিখেছেন : “অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে উত্তম আচরণ করেছে। তাদের সাথে সদাচরণ ছিল মুসলমানদের জন্য মহত্ত্ব ও মর্যাদার বিষয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জিম্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল সরকারের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রত্যেক অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিক চুক্তি অনুযায়ী মাল অথবা নগদ অর্থ বাৎসরিক জিযইয়া বাইতুল মালে জমা করত। এ ছাড়া তাদেরকে মাথাপিছু করও পরিশোধ করতে হতো। এর পরিবর্তে তারা

১২ ড.মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, সিয়াসী ওয়াসীকাজাত, পৃ.২১৭। উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইলামে মানবাধিকার, পৃ.১৩২

১৩ আবু ইউসুফ ,কিতাবুল খারাজ(করাচী : ১৯৬৬ খৃ), পৃ.৩৮৭। উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ করত এবং তারা মুসলিমদের মতই অভ্যন্তরীণ অপরাধ থেকেও নিরাপদ থাকার সুযোগ লাভ করত। যে সব প্রদেশে জিম্মীদের বসবাস ছিল সেখানে তাদের থেকে জিযইয়া আদায় করা এবং মুসলমানও জিম্মীদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করা ছিল শাসকের অন্যতম দায়িত্ব। প্রত্যেক সংখ্যালঘু নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নির্ধারিত জিযইয়া ও ট্যাক্স আদায় এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিধান কার্যকর করাসহ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দায়িত্বশীল ছিল।"[১৪] মানুষ হিসাবে মুসলমানরা যেসব অধিকার লাভ করে, অমুসলিমরাও তা লাভ করে থাকে। মুসলিমদের অধিকার যভাবে অবিচ্ছেদ্য এবং হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে, ঠিক অমুসলিমদের অধিকারও অবিচ্ছেদ্য ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে। মানবাধিকার বাস্তবায়নে কুর'আন ও সুন্নাহর বিধান ও খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত পেশ করে বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে পারে তবে অমুসলিমরা ও ঐ সব উৎসের বরাত দিয়ে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে পারে। বিজিত এলাকায় ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের অধিকার নিশ্চিত করা হত। এ প্রসঙ্গে Stern. S.M বলেন- "ফাতিমী রাজবংশের রাজত্বকালে সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সিনাই এলাকার খৃস্টান পাদ্রীদের ও ইয়াহুদীদের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে এবং তাদের উপর কিছু কর আরোপ করলে তারা রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্বেকার চুক্তিপত্রের কপি সমূহ পেশ করে আব্দূল মজিদ আল হাফেজের উযীর বাহরান, এবং ফাজরের উযীর আল- আব্বাস ও তলাইর নিকট থেকে নিজেদের অনুকূলে ডিক্রি লাভ করে। উক্ত চুক্তিপত্রে শাসকের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা পূর্বেরকার চুক্তিপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। সাথে সাথে এই নির্দেশও জারি করা হল যে, নতুনভাবে আরোপিত সকল প্রকার কর প্রত্যাহার করতে হবে এবং খৃস্টান ইয়াহুদীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও তত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে।"[১৫] এই ধরনের নজির আববাসী সময়ে এবং তাদের পরবর্তী যুগসমূহেও পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুসলিম অমুসলিম সমানভাবে নিরাপত্তা লাভ করত।

গবেষণার এ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, রাসূল (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে যে সকল মানবাধিকারের কথা বলেছেন, সে সকল অধিকার তিনি তাঁর নবীয়ানা জীবনে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ভাবে যথাযথ বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং খেলাফাতে রাশেদা ও পরবর্তী মুসলিম শাসকগণও যতাযথ বাস্তবায়ন করেছিলেন যার প্রায়োগিক যর্থাথতা রয়েছে।

১৪ Mortgomery, watt w. *The Majsty that was Islam*(London: Sidwick & Jackson, 1974), p.47

১৫ Stern S.M *Fatimid Deeress*(London: Faber and Faber, 1964), p.35

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি, ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের নৈতিক, আইনানুগ প্রয়োগ ও সংরক্ষণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ
বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে মানবাধিকারের অবস্থা কেমন। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা প্রচারের পর তার সফল বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো কনভেনশন, নেয়া হয়েছে অনেক পদক্ষেপ, গঠিত হয়েছে অনেক সংস্থা ও সংগঠন। সকল সম্মেলন, সংগঠন, সংস্থা ও কনভেনশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকারের বাস্তবায়ন। বাস্তব অবস্থা খুবই হতাসাজনক। আজো পৃথিবীর দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে মারাত্মক ভাবে। শুধু তাই নয় এই লংঘন কোন কোন ক্ষেত্রে এত মারাত্মক, ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর কল্পনার অতীত। মায়ানমার, সিরিয়া, মিশর এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি এবং অশিক্ষা এশিয়ার অধিকাংশ মানুষের নিত্যসহচর। পরনির্ভশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক দেশের অর্থনৈতিক স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে। অনেক দেশেই স্বাবলম্বী ও স্বকীয় সত্তা নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি অবিশ্বাস, জনপ্রশাসন বিচ্ছিন্ন সরকার , আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সুবিধাদী শাসকদের কারনে এশিয়ার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস নিতান্তই স্বল্প। দারিদ্র্য নিরসনের যথার্থ প্রয়াসের পরিবর্তে এসব দেশে সমরাস্ত্র আমদানির প্রতিযোগিতা চলে তীব্র ভাবে। পারমানবিক সমরাস্ত্র ক্রয়ের এই মনোবৃত্তি এশিয়ার দেশে দেশে অস্ত্র মজুতকরণ বৃদ্ধি করছে যা সাধারণ মানুষের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। অথচ সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি; তারা বুলেট চায় না, চায় খাবার।

মিয়ানমারে মানবাধিকারের পরিস্থিতি

মায়ানমারের (বার্মা) মানবাধিকার পরিস্থিতি এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক আকার ধারণ করেছে। মায়ানমারের রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এত বেশি এবং জাতিগত শুদ্ধ অভিযানের প্রবণতা এত প্রবল যে, সেখানকার আরাকান অঞ্চলের লক্ষ্যাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম মৃত্যুর আতংক নিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক বর্মী নাগরিক পাশ্ববর্তী দেশে থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। বর্মী সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষন এবং গণহত্যার অভিযোগও রয়েছে। বস্তুত এশিয়ার এই দেশটিতে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে তেমন সুখকর বলা যায় না। মায়ানমার সরকারের মানবাধিকার রক্ষার কোন তাগিদও নেই।

বিদ্রহীদের ব্যাপক আটক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। সরকার এবং কাচিন স্বাধীনতা সেনার (KIA) এর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতে হাজার হাজার বেসামরিক লোক বাস্তুভিটাচ্যুত হয়েছে। সরকার টেরিটরীতে বাস্তুচ্যুত বেসামরিক লোকদের মানবিক সাহায্য অস্বীকার করেছে। কাচিনের সংঘাত এলাকায় বিচারবহির্ভূত হত্যা কাণ্ড, যৌন সহিংসতা, নির্যাতন, জোরপূর্বক শ্রম ও বেসামরিক এলাকায় নেভিগেশন চলছে। মারাত্মক জাতিগত সংঘাতের সহিংসতা, আরাকান জাতিগত বৌদ্ধ ও জাতিগত রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দে বাস্তুভিটাচ্যুত হয় প্রায় ১,০০,০০০

Dhaka University Institutional Repository

লোক। রেহিঙ্গা এলাকায় এবং আরাকান রাজ্যের 'সিত্তে' বাস্তুভিটাচ্যুত ক্যাম্পে ক্রমবর্ধমান হত্যাকাণ্ড, পেটানো এবং বাস্তুচ্যুত করা হয়।

জোরপূর্বক শ্রম আই. এল.ও এর সঙ্গে সম্মত হয়ে ২০১৫ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে শিশু সৈন্যদের নিয়োগ অব্যাহত এবং বেশ কিছু রাষ্ট্রে সশস্ত্র গ্রুপে এবং বিভিন্ন রংরুটে শিশু সৈনিকদের ব্যবহার অব্যহত রেখে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে করেছে আরো প্রশ্নবিদ্ধ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর রিপোর্ট মোতাবেক-"প্রায় ৫,৫০,০০০ বাস্তুচ্যুত লোকের মধ্যে ৪,০০,০০০ লোক বার্মায় আছে। অতিরিক্ত ১,৪০,০০০ শরনার্থী থাইল্যান্ডে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ৩০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিম শরনার্থী বাংলাদেশের শরনার্থী শিবিরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের অস্থায়ী শিবিরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ২,০০,০০০ জাতিগত রোহিঙ্গা মুসলিম মানবেতর জীবন যাপন করছে। দেশটিতে জাতিগত সংঘাতে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্মার নিরাপত্ত বাহিনী এবং আরাকানদের বৌদ্ধ উভয়ে পশ্চিম বার্মায় জাতিগত সংঘাতের সহিংসতা চলাকালে গণহত্যা ধর্ষণ এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রায় ১,০০,০০০ লোককে গ্রেফতার করে ব্যাপকভাবে অগ্নি সংযোগ করে বাস্তুচ্যুত করে। আরাকান রাজ্যে প্রায় ১৭ টি শহরে হত্যাকাণ্ড, মুসলিমগ্রাম পোড়ানো এবং রোহিঙ্গা এবং অরোহিঙ্গা মুসলিমদের বাস্তুচ্যুত করে।[১]

মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাইখান রাজ্যের একটি গ্রামে জঙ্গি বৌদ্ধরা ছুরি ও দা দিয়ে কুপিয়ে ৪০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করেছে। মানবাধিকার সংস্থা 'ফোর্টি রাইটস' এর কর্মীরা সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ পান বলে জানিয়েছেন। জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার সংস্থার প্রধান নাভি পিল্লাই এক বিবৃবিতে এ ঘটনায় অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন। প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদে নারী ও শিশুসহ নিহতের সংখ্যা ৭০ জনের মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর রাইখানদের সহিংসতায় ২০০ জনের বেশি নিহত হন। তাদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্য।[২]

আফগানিস্তানে মানবাধিকারের পরিস্থিতি

আফগানিস্তানের অনেক এলাকায় বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে তালিবান নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাই ২০১২ সালের হিসাবমতে প্রায় ৪০০০ নারী ও মেয়েশিশু বিয়ে বহির্ভূত সেক্স তথা 'নৈতিক অপরাধের জন্য কারাগারে এবং বন্দিদের আটক করে বন্দি রাখা হয়। সশস্ত্র দ্বন্দ ক্রমবর্ধমান হয় দেশটিতে। আফগানিস্তানের যুদ্ধে বেসামরিক হতাহত লোকদের সংখ্যা ৩০৯৯ জন। তাদের মধ্যে নিহত হয় ১,১৪৫ জন এবং ১,১৯৫৪ জন আহত। ২০১১ সালে প্রথম ৬ মাসে ৩৬৫৪ জন হতাহতের মধ্যে ১,৫১০ জন সামরিক এবং ২১৪৪ জন বেসামরিক লোক হতাহত হয়। জাতি সংঘের মতে তালেবানদের লক্ষ্য ছিল যোদ্ধা ও বেসামরিক সৈনিকদের, কখন কখনও ইচ্ছকৃত লক্ষ্য বস্তু ছিল বেসামরিক লোক। সরকারের নিরাপত্ত বাহিনী বেসামরিক

১ http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/burma, Visited on 3 -12-2014

২ **' দৈনিক নয়া দিগন্ত', ২৫ জানুয়ারী, ২০১৪**

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের নির্যাতন করেন, চাদাবাজি, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ ও হত্যা করে। এছাড়া ২০১২ সালের প্রথম ৬ মাসে তালেবানরা ৩৪ টি হামলা করে স্কুলের কর্মী ও শিক্ষাকর্মকর্তাদের নির্যাতন করে। এসব হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদের এবং সুইসাইড বোম্বারদের নিয়োগ অভ্যহত রাখে। ইউ এন. রিপোর্টমত কাবুলের ‘তাজিক’ এবং ‘হাজেরাদের’ মধ্যে জাতিগত সহিংসতা প্রতিবেশী পাকিস্তানকে জর্জরিত করেছে যা ক্রমবর্ধমান জাতিগত বিবাদের পুনর্বারকরণ মাত্র।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ সালে তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক গোলোযোগ এড়ানোর জন্য সেদেশ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে আসে ১০০ বেশি তাজিক। আফগানিস্তানে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। বস্তুত সোভিয়েত অগ্রসানের পর থেকে সেদেশে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণহানী ঘটেছে। আল কায়েদাকে ধ্বংশ করার জন্য   আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমন করেন ২০০০ সালে। উদ্বাস্ত জীবনের মত অসহনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে অসংখ্য সদস্যগণকে। এটাও মানবাধিকার লংঘন। উদ্বাস্তরা শীত ও অনাহারে মারা গেছে বলে আন্তর্জাতিক রেড কোর্স কমিটি জানিয়েছে।[৩]

ভারতে মানবাধিকার পরিস্থিতি

ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতন্ত্রের দেশ। মানবাধিকার লংঘণ মোকাবেলার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সমৃদ্ধ সুশীল সমাজ, স্বাধীনগণমাধ্যম, এবং একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকার পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। স্বাস্থ সেবা ও শিক্ষার উন্নত এক্সেস, ক্ষুধা নিবারণ বাস্তবায়ন করতে অনেক নারী শিশু, দলিত তথাকথিত অস্পৃশ্য, আতিবাসী সম্প্রদায়, ধর্মীয় সংখ্যা লঘু, প্রতিবন্ধীদের যৌন হয়রানী, প্রান্তিক সংখ্যালগুদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত আছে। জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর পূর্বে নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত নির্যাতন, মধ্য ও পূর্বভারত এলাকায় মাওবাদী বিদ্রোহের সম্পূর্ণ ক্ষতিকর, পরিবেশগত প্রভাব ফেলেছে এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘিত হতে পারে। ২০১২ সালে মাওবাদী সংক্রান্ত সহিংসতায় ৯৮ বেসামরিক লোক সহ ২৫৭ জনের মৃত্যু হয়। জুন ২০১২ তে ‘ছিত্তামগড়’ রাজ্যে নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক একটি রাত্রে অপারেশনের সময় ১৯ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর উত্তর রাজ্যের সহিংসতা হচ্ছে একটি গুরুতর মানবাধিকার লংঘন যা নিরাপত্তা বাহিনীর (AFSPA) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- রাজ্য সরকার কর্তৃক ২,৭৩০ টি মৃত্যুদেহ ও ডি.এন.এ পরীক্ষার জন্য কল প্রত্যাখান করেন যা জুলাই ২০১১ সালে উত্তর কাশ্মীরের ৩৮ সাইটগুলো থেকে অচিহ্নিত সমাধি থেকে পাওয়া যায় একটি পুলিশ ইনভেষ্টিগেটিভ দলের মাধ্যমে। আর এটা ছিল বলপূর্বক অন্তর্ধানের যা থেকে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড বলে বিশ্বাস করা হয়। অসম সহিংসতার মাধ্যমে মানবাধিকার লজ্ঞন হচ্ছে। জুলাই ২০১৩ আদিবাসী ‘বোডো উপজাতি’ এবং মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে সহিংসতার জন্য ‘কোকরাঝড়ে’ ৯৭ জনের মৃত্যু হয় এবং ৪৫০০০০ জন লোক বাস্তুচ্যুত হয়। ভারতের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থান করা হচ্ছে, যেমন ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বাকস্বাধীনতা অধিকার বিধিনিষেধ সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন, ইন্টারনেট সেন্সরশিপ বিধি ব্যবহৃত। ইন্টারনেট পরিসেবা প্রদানকারী এবং সার্চইঞ্জিন হিসেবে মধ্যস্থতাকারীদের

---

[৩] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/afghanistan, Visited on 2-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

আপত্তিকর বলে গণ্য করা প্রয়াশই সংস্কারের সমালোচনা সংরক্ষণ ৩৬ ঘন্টার মধ্যে বিষয়বস্তু মুছে ফেলা ইত্যাদি। মূলত এর মাধ্যমে মানুষের বাক স্বাধীনতার অধিকার লংঘিত হচ্ছে।

ভারতে শিশু অধিকার লজ্ঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভারতের শিশু পাচার, গৃহহীনতা, জোরপূর্বক শ্রম ও অপরাধ শিশুশ্রমের বিপজ্জনক অবস্থা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সঠিক এক্সেস ছাড়াই নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। যা মানবাধিকার লংঘন। ভারত অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুদের অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বে প্রথম স্থানে আছে। সরকারি হিসাব মতে 'শিশুদের অন্তত ৪০ শতাংশ যৌন হয়রানীর স্বীকার হচ্ছে। ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট কাশ্মির প্রদেশটিতে দীর্ঘদিন থেকে প্রেসিডেন্টের শাসন জারি রয়েছে। যেখানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ,গণহত্যা এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। ভারত সরকার কাশ্মিরের জনগণের মৌলিক অধিকারকে স্থগিত করে রেখেছে অনেক দিন থেকে। ভারতের মানবাধিকার কর্মী এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস কর্মীদের অবাধ গতিবিধিকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কাশ্মীরের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ভারতের নারী ও মেয়ে শিশু এমন কি প্রতিবন্ধি যৌন নির্যাতিনের সহিংসতায় বেড়ে গিয়ে বর্তমান পর্যন্ত অব্যহত রয়েছে। রিপোটে বলা হয়েছে যে, সরকারী তদন্তে এবং পুলিশের হেফাজতে যৌননিপিরণের নালিশ অব্যহত আছে। যেমন জুন ২০১২ সালে 'পিংকি প্রামাণিক' নামে এক জন প্রখ্যাত ক্রিড়াবিদ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়।[8]

চীনে মানবাধিকারের পরিস্থিতি

মানবাধিকার গ্রুপ 'এইচ আর ডব্লিউ' তার এক প্রতিবেদনে জানায় চীন কয়েদিদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য যে সব পথ অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি ছিল বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত, অস্বস্তিকর অবস্থায় শৃঙ্খলিত রাখা, ক্ষুদ্র অন্ধকার সেলে রাখা, ঘুমোতে না দেয়া এবং প্রচন্ড শীত বা গরমে মধ্যে রাখা। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় চীনের কয়েদিদের পায়ে বেশি ভাগ সময়ে শিকল পরিয়ে রাখা হয়। চীনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা,গণতান্ত্রিক অধিকার সহ বিভিন্ন রকমের মৌলিক অধিকার সংকুচিত রয়েছে যা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি চীনে যথেষ্ট আশংখাজনক বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে। টেকশই অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি, নগরায়ন এবং একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে চীন ক্রমবর্ধমান। কিন্তু মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতি দেখতে পাওয়া যায়। চীনা মানুষ দ্রুত আধুনিকরণের দেশ হিসেবে তিন দশক থাকা সত্তেও সরকার মত প্রকাশের এবং ধর্মের উপর সীমিত স্বাধীনতা রয়েছে। সেখানে স্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ এবং মানবাধিকার সংগঠন ও বিচারিক প্রতিষ্ঠানের উপর পার্টি নিয়ন্ত্রণ, প্রেস, ইন্টারনেট, প্রকাশনা শিল্প সেন্সর করে থাকে। জাতিগত সংখ্যালঘু অঞ্চলে অত্যন্ত দমন নীতি ইনফোর্স করে। যাতে সার্বিক ভাবে মানবাধিকার লঙঘন হয়।

চীনে মানবাধিকার রক্ষকর্মীদের নিয়মিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পাবলিক অর্ডারের ভিত্তিতে পুলিশের হয়রানী, ফৌজদারী অভিযোগ, গৃহবন্দী, স্বল্পমেয়াদী আটক, শ্রমের মাধ্যমে পুনঃশিক্ষা অথবা কারাদণ্ডের সম্মুখিন হতে হয়। যেমন- নোবেল শান্তি পুরুস্কার বিজয়ী Liu Xiaobo রাষ্ট্র ক্ষমতা পরাভূত করতে Heilongjian প্রদেশে ১১ বছর তাকে বাক্যভাজন করতে হয়। তার স্ত্রী Liu Xia ডিসেম্বর ২০১০ থেকে নিখোঁজ হয়। ধারণা করা হয় তিনি তার স্বামীর পক্ষে প্রচার প্রতিরোধ হিসেবে তাকে রাজধানী বেইজিং এ গৃহবন্দী করা হয়েছে। ২০১৩ সালে আগাষ্ট মাসে বেজিং ১২জন কর্মীসহ 'হিউম্যান' প্রদেশে পেং নানলং নামক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১২ সালেও চীন বিশ্বের মধ্যে

[8] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/india, Visited on 12-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন এবং মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা রাষ্ট্রীয়ভাবে গোপন রাখা হয়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান প্রতি বছর ৫০০০ থেকে ৮০০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৫]
সাংবাদিক, ব্লগারদের আনুমানিক ৫৩৮ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে যা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনী গ্যারান্টির লঙ্ঘন। সরকারী নীতির সাথে অসঙ্গত পূর্ণ অনলাইন বির্তক সেন্সর দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবং ম্যানিপুলেশন স্বপক্ষে টুইটার, ইউটিউব, এবং ফেসবুক সহ সকল সামজিক মিডিয়ার অপারেশন ব্লক করা হয় যা মানবাধিকার লঙ্ঘন। ধর্মের স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক গ্যারান্টি হলেও চীনা সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে মসজিদ, গির্জা, মন্দির এবং মঠ অনুমোদন করতে ধর্মীয় র্চচা নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় সংস্থার আথির্ক প্রতিবেদন, ধর্মীয় কর্মীদের নিয়োগ, ধর্মীয় প্রকাশনা এবং শিক্ষালয় সরকারের পর্যালোচনা স্বাপেক্ষে পরিচালিত হয়, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা পালনে অনেকটাই অন্তরায়। চীনা সরকার জাতিগত সংখ্যালঘু এলাকায় নিরাপত্তার নামে ধর্মীয় কার্যক্রম প্রচন্ডভাবে সীমিত করেছেন যা মানবাধিকার লঙ্ঘন। নারী অধিকার আরো চরম পর্যায়ে রয়েছে। নারীর প্রজনন অধিকার এবং প্রজনন স্বাস্থ্য গুরুতর ভাবে চীনা পরিবার পরিকল্পনা প্রতিধানের অধিনে সংরক্ষিত থাকে। চীনা নারীদের বাধ্যগর্ভপাতসহ প্রসাশনিক নিষেধাজ্ঞা, জরিমানা এবং দমনমূলক ব্যবস্থা আরোপ চালাতে সম্প্রতিক বছর গুলোতে নিগ্রহ জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ক্রমবর্ধমান। যেমন তিববত ও জনজিয়াং জাতিগত সংখ্যালঘু এলাকায় এনীতি প্রসারিত। তাছাড়া জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী পাচার সহ বিভিন্ন অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে যা আদম শুমারীর জেন্ডার ভারসম্যহীনতার ইঙ্গিত করে।[৬]

সিরিয়ায় মানাবধিকার পরিস্থিতি

সিরিয়া ২০১২ সালের বিদ্রোহে ক্রমবর্ধমান রক্তাক্ত পরিণতী হিসেবে সরকার বাহিনী প্রোসরকার বাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রাধীন এলাকায় বিচার বহির্ভূত হত্যা কাণ্ড , বন্দিদের নির্যাতন, বিরোধী বাহিনীর লোকদের অপহরণসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। বিরোধী দলের সুত্র মতে প্রায় ৩৪,৩৪৬ জন বেসামরিক লোক এ সংঘাতে নিহত হয়েছে। যুদ্ধের বিস্তর ও তিব্রতায় হাজার হাজার মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বা স্তচ্যুত হয়ে এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে আশ্রয় নিয়ে একটি ভয়ানক মানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সিরিয়ার নিরাপত্তাবাহিনী ও প্রো সরকার “Shabeha” মিলিশিয়া সারাদেশে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। রাজধানী দামেস্কে অনেক বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মে, ২০১৩ তারীখে ‘হোমস’ এর নিকটে সিরিয়ায় অন্তত ১০৮ অধিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আগাস্ট ২০১৩ তে সরকার প্রায় জনবহুল এলাকায় নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক বায়ুশক্তি প্রয়োগ ছাড়া ১৫ আগস্ট একটি জঙ্গি জেট বিমান নারী ও শিশুসহ প্রায় ৪০ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করে। নির্বিচারে গ্রেফতার, বলপূর্বক অন্তর্ধান, নির্যাতন, নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাযতে মৃত্যু এবং নিরাপত্তাবাহিনী নির্বিচারে প্রায় ১০,০০০ লোককে গ্রেফতার করেছে। বেআইনী ভাবে গ্রেফতার, বলপূর্বক অন্তর্ধান, নির্যাতনের স্বীকার হন বন্দীদের অনেকেই। বন্দিদের মধ্যে ২০ ও ২৫ এর কমবয়সী ছিল এবং নারী, শিশু ও বয়স্ক লোক এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ এর

[৫] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/china, Visited on 4-12-2014
[৬] ২০১০ আদম শুমারী অনুযায়ী প্রতি ১০০ নারীর জন্য ১,১৮,১৮ জন পুরুষ ।

Dhaka University Institutional Repository

মতে '২০১২ সালের অনেক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাযতে প্রায় ৮৬৫ জন বন্দী মারা যান।'[৭]

সিরিয়ায় পাশ্ববর্তীদেশ ইরাক, জর্ডান, লেবানন ও তুরস্কের প্রায় ৩,৪১,০০০ এর মধ্যে উদ্বাস্ত বর্তমান অবস্থান করে মানবেতর জীবন যাপন করছে। 'এইচ.আর. ডব্লিউ' এর প্রতিবেদনে বলা হয় 'জুলাই ২০১৩ হতে অক্টবর ২০১৩ পর্যন্ত সিরিয়ায় সশস্ত্র বাহিনী আলেপ্প, দিয়ার লডলিব, আলজোর, হোমস, লতাকিয়াসহ সমগ্র সিরিয়ার জনবহুল অঞ্চলে ৩৫টি ক্লাষ্টার বোমা ফেলিয়ে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে।' প্রতক্ষদর্শীদের মতে- সংঘাত চলাকালে সিরিয়ায় সরকারবাহিনী ও প্রো মিলিশিয়া বাহিনী সাধারণ লোকদের বাড়ীতে আক্রমনের সময় যৌন সহিংসতা চালায়। তাদের যৌন সহিংসতার স্বীকার হয়েছে নারী, পুরুষ, বালক বিশেষ করে ১২ বছরের কিশোরী মেয়েরা। বিগত বছরে সিরিয়ার সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তাবাহিনী শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন করে অমানবিক অবস্থায় ফেলে শিশুদের আটক করে রাখেন। রাস্তায় শিশুদের গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রেসিডেন্ট আসাদ নিরাপত্তাজনিত কারনে আটক রেখে প্রায় ৩৫০০ সিরিয়ানকে ১৯৯১ সালে সাধারণ ক্ষমা করার পরেও হাজার হাজার সিরীয় এখনো রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে সে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রয়েছে। এখনো অনেক যায়গায় হাজার হাজার বন্দি এমন অবস্থায় আছেন যে, তাদের সাথে বহির্বিশ্বের কোন সম্পর্ক নেই।

২০১৩ সালে ফেব্রুয়ারীতে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী সারা দেশে অশান্ত শহরগুলোতে বিশেষ করে 'বাবা আর্মরের' আশেপাশে হোমস্, পশ্চিম সিরিয়ার শত শত মানুষকে নির্বিচারে গোলা বর্ষণ এবং স্নাইপার আগুনে ফেলে গণ হত্যা পরিচালনা করে। আগাস্ট ২০১৩ সিরিযা সরকার প্রায়ই জনবহুল এলাকায় বেসামরিক লোকদের নির্বিচারে হত্যা করে। ১৫ আগস্ট জেট ফাইটার থেকে ২টি বোমা ফেলে নারী শিশুসহ বেসামরিক লোককে হত্যা করে। ১০টি বেকারীর সামনে রুটির জন্য দাড়িয়ে থাকা লোকদেরকে এলাপাতারী গুলি করে হত্যা করে।

ফেব্রুয়ারী ১৬, ২০১৩ সিরিয়া এয়াফোর্সের কেন্দ্রীয় Intelligance Unit 'Syrian Centre for Median and Freeland of Expression (SCM) সিরিয়ার কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে ৭ নারীসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীর প্রতিবেদন মোতাবেক ২০১২ সালে অন্তত ৪৬৫ জন বন্দীকে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাযতে মারা যান।

সিরিয়ার সরকারবাহিনী সংঘাতের সময় আটক নারী ও পুরুষের সাথে যৌন সহিংসতা করেছে। সশস্ত্র মিলিশিয়ারা আবাসিক এলাকায় ও বাড়িতে হামলার সময় নারী ও ১২ বৎসরের তরুনীদের যৌন নির্যাতন করে। সরকারবাহিনী বাড়িতে এবং রাস্তায় শিশুদের গুলি করে। সরকার বাহিনী ও বিরোধী বাহিনী আটক কৃত শিশুদের নির্যাতনের জন্য স্কুলকে ব্যারাক ও আটক কেন্দ্র এবং স্নাইপারের পোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করে। জাতীসংঘের মহাসচীব বান কি মুন এর হিসেবে 'জুলাই ২০১৩ সালে ১,০০,০০০ মানুষ এ সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং যুদ্ধের তীব্রতায় লাখ লাখ মানুষ অভ্যান্তরীনভাবে বাস্তচ্যুত হয়েছে অথবা প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় খুজঁছে যা একটি ভয়ানক মানবাধিকার বিপর্যয় হয়েছে।[৮]

---

[৭] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/syria , Visited on 03-12-2014

[৮] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/syria , Visited on 12-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' এর তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক ২০১৩ সালে ৯ টির মধ্যে ৭ টি ঘটনায় দেখা গেছে সিরিয় সরকার বাহিনী ব্যালিষ্টিক মিসাইল দিয়ে জনবহুল এলাকায় আঘাত করেছে। ২০১৩ সালে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১০০ শিশুসহ কমপক্ষে ২১৫ জন নিহত হয়। ২-৩ মে,২০১৩ তে সরকারবাহিনী 'বায়দা' ও 'বেনিয়াস' শহরে ৪৫ জন নারী এবং ৪৩ জন শিশুসহ কমপক্ষে ২৪৮ জন মানুষ হত্যা করে। স্থানীয় কর্মীদের মতে ২০১৩ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাযতে কমপক্ষে ৪৯০ জন বন্দী মারা যান। ৪ আগাস্ট বিরোদী দলের জোট একটি ইসলামী জঙ্গি গ্রুপ দ্বারা একটি অপারেশনে লতাকিয়া গ্রামে ১৪ শিশু ৫৭ নারী ১৪ বয়স্ক পুরুস সহ কমপক্ষে ১৯০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

The UN office for the Coordination of Human Rights Affairs (OCHA) জাতি সংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সমম্বয় অফিসের মতে ২০১৩ সাল আনুমানিক ৪.২৫ মিলিয়ন সিরিয়াবাসী অভ্যন্তরীন ভাবে বাস্তচ্যুত হয়েছে। সরকার বাহিনী দেশে ৪৪টি হাসপাতালের মধ্যে ৩২ টি বন্ধ করে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে যানবাহন আক্রমণ, স্বাস্থ্য কর্মীদের সুবিধার উপর আক্রমন ও শত শত রোগীকে হত্যা করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (UNHRC) একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয় (The denial of medical care as a weapon of war is a distinc and chilling reality of the war in Syria) 'চিকিৎসা অস্বিকার যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে সিরিয়া যুদ্ধের একটি স্বতন্ত্র এবং হিম বাস্তবতা'।[১] UNHRC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশের নিবন্ধিতদের মধ্যে সিরিয়ার উদ্বাস্তদের ৭৫ শতাংশ নারী ও শিশু স্বাস্থ্যহানী, সহিংসতা, যৌন হয়রানী এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং ভয় অন্যান্য সমালোচনামূলক সেবা উদ্বাস্ত মহিলাদের চলাফেলা সীমিত করে। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় প্রতিনিয়ত।

তুরস্কে মানবাধিকার লংঘন

Prosecutors এবং আদালতের বিচার কুর্দি হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী মানবাধিকার কর্মী, ছাত্র, সাংবাদিক এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে কারারুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

বাক স্বাধীনতা, মিডিয়ার সিমাবদ্ধতা এবং ন্যায় বিচার অধিকার গুরুতর লঙ্ঘন ছিল। তুরস্কের আদালত 'সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের অধীনে দীর্ঘায়িত কারাগারে আটক রাখে অনেক বন্দীকে। সম্প্রতিক তথ্য মতে মে, ২০১৩ বিচার মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান মোতাবেক ১,২৫,০০০ কারাগারের জনসংখ্যার ৪,৯৯৫ জনকে সন্ত্রাসবাদের অপরাধে অভিযোগে আনা হয়েছে । তুরস্কের সাংসদদের জন্য বৈবাহিক অবস্থায় সহিংসতা, পারিবারিক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ রক্ষায় নতুন আইন পাশ করলেও নারীদের অধিকার আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১১ সালে একটি তুর্কি বিমান বহিনী বিমান হামলায় ৩৪ জন কুর্দি গ্রামবাসীকে হত্যা করে যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিশু ও অল্প বয়সের ছেলে মেয়ে। তুর্কী সরকারের হিসাব মোতাবেক সিরিয়ার সংঘাতে তুরস্ক সীমান্ত শহরগুলোতে তুরস্ক ক্যাম্পে ২,০০,০০০ জীবন্তসহ প্রায় ৫,০০,০০০ সিরিয়া হোষ্টিং হচ্ছে। 'তুর্কী কর্তৃপক্ষ' নিয়মিত ভাবে সিরিয়ার বায়ুবীয় আক্রমণ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায়

[১] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/turkey , Visited on 10-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যান্তরীনভাবে বাস্তচ্যুত ক্যাম্পে হাজার হাজার শরনার্থী প্রতিরোধ করা সিরিয়ার গ্রামে তাদের অত্যাচার মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ব্যাহত করেছে। ফেব্রুয়ারী মাসে সিরিয়ার 'সিলাভগোজ আদান' সীমান্তে সীমান্ত-ক্রসিংয়ে গাড়ি বোমায় ১৮ জন নিহত হয় এবং মে,২০১৩ Reyhanli এর কাছে 'আদনা' শহরে বোমা হামলায় ৫২ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। পুলিশের দুর্ব্যাবহার এবং অধিক বল প্রয়োগ Taksim Gezi পার্কে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুলিশ বরাবরই অতিরিক্ত বল ব্যবহার, বন্দীদের পেটানো, জলকামান, রাবারবুলেট এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ করে। 'তুর্কী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিবেদন অনুযায়ী ১১ জনের চোখ হারিয়েছে।[১০]

আলজেরিয়ায় মানবাধিকার পরিস্থিতি

এপ্রিল,২০১১ জরুরী অবস্থা তুলে দিয়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নতুন আইন করা সত্বেও আলজেরিয়ায় মানবাধিকার সুরক্ষার উপর সামান্য অগ্রগতি হলেও সরকার কর্তৃপক্ষ সভা, বিক্ষোপ, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা সীমিত করেছে। ১৬ জানুয়ারী, ২০১৩ জঙ্গি গ্রুপ আল-কায়েদার 'লি বেলমোকতারা' নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি বাহিনী আলজেরিয়া-লিবিয়া সীমান্তের কাছে 'মেনাসে' ৮০০ মানুষকে জিম্মি করে। আলজেরিয়ার বিশেষ বাহিনী জিম্মিদের মুক্ত করার সময় অভিযান চলাকালে অন্তত ৩৭ বিদেশী বন্দীসহ সশস্ত্র সদস্যের ৩৭ জন নিহত হয়েছে। ২০১৩ সালে আল জেরিয়া কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান ইউনিয়ন সংগঠন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোপকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ইচ্ছামত ইউনিয়ন সদস্য , ট্রেড ইউনিয়নকে ঘেড়াও ও গ্রেফতার করে।[১১]

ইরাকে মানবাধিকার পরিস্থিতি

ইরাকের মানবাধিকারের পরিস্থিতি খুবই দুর্বল। বিশেষ করে বন্দী, সাংবাদিক এবং মেয়ে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বেশি। নিরাপত্তাবাহিনী বিচার মন্ত্রনালয়ের অধিনে ইচ্ছামত আটক, বন্দিদের নির্যাতন অব্যাহত আছে। ২০১২ থেকে নভেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে ১২৯ টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেখানে সমাবেশ করার অধিকার হরণ করা হয়েছে। ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনী, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের হুমকী, সহিংসতা, সাংবাদিকদের গ্রেফতার, সরকারের সমালোচনামূলক প্রচারমাধ্যমে ও সংস্থাসমূহ হয়রানীর শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ২০১৩ শত শত বেসরকারী লোক ও শত শত পুলিশ সহিংসতায় হত্যা হয়েছে। অনেক ইরাকি নারীরা সংঘাত, সাধারণ সহিংসতা স্থানচ্যুতির ফলে তাদের স্বামী হারিয়েছে। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা, যৌন শোষণ ও পতিতাবৃত্তি ও নারী পাচারের প্রবণতা বেড়েছে।[১২]

ইরানে মানবাধিকার পরিস্থিতি

'এ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের' প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১ সালে ইরানের কর্তৃপক্ষ ৬০০ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। ইরান মৃত্যুদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধের সংজ্ঞায় হত্যা, ধর্ষণ, ড্রাগ পাচার, সশস্ত্র ডাকাতি, গুপ্তচরবৃত্তি, পায়ুকাম এবং ধর্মত্যাগকে অর্ন্তভূক্ত করেছে। ইরান কর্তৃপক্ষ শিশু অপরাধীদের

---

[১০] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/turkey, Visited on 10-12-2014

[১১] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/algeria, Visited on 10-12-2014

[১২] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iraq, Visited on 10-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদণ্ড (১৮ বৎসরের কম বয়সী) কার্যকর করে বিশ্বের দৃষ্টি কেরেছে। ইরানে আইন করা হয়েছে যে, মৃত্যদণ্ডের জন্য বয়স মেয়েদের জন্য ৯ বছর এবং ছেলেদের বয়স হবে ১৫ বছর। ২০১২ সালের শেষ দিকে মৃত্যুদণ্ডের সারিতে ছিল ১০০ জন শিশু। ২০১০ জানুয়ারীতে অন্তত ৩০ জননের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ইরান কর্তৃপক্ষ 'আহফাজ কারুনের' জেলখানায় কম পক্ষে ১১জন ইরানী আরব পুরুষ এবং ১৬ বছরের একটি ছেলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। সেপ্টেম্বর ২০১২ এর হিসাবে অন্তত ২৪ কুর্দি বন্দী জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় আছে। আগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত ইরানের কারাগারে ৪৮ জন সাংবাদিক ও ব্লগার বন্দী আছে। ইরানী নারীরা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সন্তানের হেফাযত সংক্রান্ত ব্যাক্তিগত আস্থা বিষয়ে বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে।[১৩]

ইসরাঈল ও ফিলিস্তিনে মানবাধিকার পরিস্থিতি

এশিয়ার অমানবিক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচানা করেছে ইসরাঈল। ইসরাইলের হাতে সৃষ্ট ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডি ফিলিস্তিন। ইসরাঈল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে বসবাসরত হাজার হাজার প্যালেষ্টাই নিদের নৃশংসভাবে নির্যাতনের ও নিষ্পেষনের ষ্টিমরোলার চালাচ্ছে ইয়াহুদীরা। সাত বছরের নিষ্পাপ শিশুর বুলেটে বিদ্ধ লাশ আঁকড়ে ধরে ক্রন্দনরতা প্যালেস্টাইনি জননীর আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাশ আর্দ্র হয়ে ওঠে, বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ইসরাঈল, পশ্চিম তীর এবং গাজায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের গুরুত্ব লংঘন অব্যাহত। বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, রাজনৈতিক ভিন্নমত, ফ্রি সমিতি, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, বেসামরিক লোককে হত্যা। নভেম্বর ২০১২ তে জনবহুল এলাকায় ১৪০০ টি রকেট উৎক্ষেপন। পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোপকারীদেরকে আটক, সাংবাদিকদের ও স্বাভাবিক চলাফেলায় নিষেধ, ইসরাঈলী চেক পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত অবমুক্ত এবং বিচ্ছিন্নভাবে বাধাসহ 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্কে ফিলিস্তিনি' আন্দোলনকারীদের উপর কষ্টদায়ক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে। জাতি সংঘের রিপোর্ট অনুসারে সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত আন্দোলনে বিধি নিষেধ প্রায় ১,৯০,০০০ ফিলিস্তিনিকে নিকটতম শহরগুলতে যেতে সবচেয়ে সরাসরি কয়েকটা রুট ব্যবহার না করে অন্য রুট ব্যাবহার করতে বাধ্য করছে। ইসরাঈলের পূর্ব জেরুজালেমের প্রায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা বিচ্ছিন্নভাবে বাধা অব্যাহত। ইসরাঈল ৮৫ শতাংশ রুটে ভ্রমণ করা নিষেধাজ্ঞা জারী করে। UN রিপোর্ট অনুসারে ১১,০০০ ফিলিস্তিনিকে পশ্চিমতীরের মধ্যে জীবিকা এবং সার্ভিস করতে বাধ্য করা হয়। প্রায় ৫০ টি কৃষক ও ভূমি মালিকদেরকে তাদের ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মে, ২০১৩ জমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে 'ইসরাঈল সামরিক আদালত' শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার জন্য কাসেম তামিমি নামে এক ফিলিস্তিনি কর্মীকে ১৩ মাসের করাদণ্ড দিয়েছে যা অমানবিক। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ ইসরাঈল ১০১৪ জন মানুষকে বাস্তুচ্যুত এবং পূর্ব জেরুজালেমসহ 'ওয়েষ্ট ব্যাঙ্কে' ৫৬৮ টি ফিলিস্তিনি ঘর- বাড়ীসহ অনেক ভবন ধ্বংস করে। ইসরাঈল কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনিদের আহত, ফিলিস্তিনি মসজিদ, ঘর বাড়ী, জলপাই গাছ এবং অন্যান্য সম্পদ ধ্বংস করে ফেলে। ইসরাঈলে আনুমানিক ২,০০,০০০ অভিবাসী শ্রমিক রয়েছে যারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।[১৪]

---

[১৩] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iraq, Visited on 10-12-2014

[১৪] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/israel-and-palestine, Visited on 11-12-

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়ায় মানবাধকার পরিস্থিতি

২০১২ সালে নতুন আইন করে বেসরকারী সংস্থা এবং সমাবেশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করা হয়েছে। নতুন স্থানীয় আইনে 'লেসবিয়ান', 'গে', উভলিঙ্গ (এলজিবিটি) ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য,এবং উত্তর ককেশাসে অভিযান চালিয়ে নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। ৬ মে, ২০১৩ পুতিনের উদ্বোধনীর আগে মস্কোতে পুলিশ ও বিক্ষোপ কারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৮ মে, ২০১৩ পুলিশ প্রায় ১০০০ প্রতিবাদকারীকে আটক করে। সরকারী তথ্য মতে রাশিয়ার উত্তর প্রদেশ ককেশাসে এবং দাগেস্তানে ২০১২ এর প্রথম ৬ মাসে ১১৬ টি সন্ত্রাসী অপরাধ সংঘঠিত হয়। বিদ্রহীরা ৭ বেসরকারী ব্যক্তিসহ ৬৭ জন মানুষকে হত্যা করে। 'ককেশীন নট' কেটি স্বাধীন অনলাইন মিডিয়া পোর্টাল এর মতে ২০১৩ এর প্রথম ৯ মাসে উত্তর ককেশাস অঞ্চলে ৬৭ জন বেসামরিক লোকসহ ৩৭৫ জন মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় বেসামরিক ১১২ জন সহ ৩৪৩ জন। রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ ২০১৪ শীতকালিন অলিম্পিক এর জন্য শত শত 'সোচি' পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। সর্বাধিক বাসগৃহ মালিকরা ক্ষতিপুরণ পেলেও অনেক ক্ষেত্রে পরিমান অন্যায্য ছিল এবং অস্বচ্ছ ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে কর্তৃপক্ষ জোর করে ৬টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে কোন প্রকার ক্ষতিপুরণ ছাড়াই। ২৯ ডিসেম্বর- নগরীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে একটি এক আত্নঘাতী বোমা হামলায় ১৭ জন নিহত হয়। এর পরের দিন ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ভলগোগ্রাদ নগরীতে একটি ট্রলিবাসে বিষ্ফোরণে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত ও ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।[১৫] মস্কোর ৯০০ কিলোমিটার দক্ষিণে, উত্তর ককেশাসের ৬৫০০ কিলোমিটার ও সোচির ৭০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব ভলগোগ্রাদ অবস্থিত।[১৬]

মিসরে মানবাধিকার পরিস্থিতি

৩০ জুন, ২০১৩ মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোব ও প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসির গ্রেফতারের পর মিশরের পুলিশ বাহিনী অত্যধিক বল প্রয়োগ করে প্রায় ১,৩০০ বেসামরিক লোককে হত্যা করে এবং ব্রাদারহুডের ৩৫০০ সমর্থককে গ্রেফতার করে। নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন চালায় প্রতিনিয়ত। যেমন- জুন ২০১৩ তে 'পোর্ট সাঈদ' জেলখানার বাহিরে এক বন্দুকধারী দ্বারা ২ জন পুলিশ নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রায় ৩ দিনে ৪৬ জন কে হত্যা করা হয়। ব্রাদারহুডের বিরোধিদের মধ্যে সংঘষে ৩০ জুন এবং ৫ জুলাই এর মধ্যে দেশে প্রায় ৫৪ জন নিহত হয়।

৮ জুলাই ২০১৩৪ দুই নিরাপত্তা সদস্য নিহত হওয়ায় ৬১ জন প্রতিবাদী কে হত্যা করা হয়। ২৭ জুলাই পুলিশ ৯৫ জন প্রতিবাদিকে হত্যা করেন। ১৪ আগস্ট প্রধান মন্ত্রী Hazem Beblawy –এর নির্দেশে পুলিশ জোর করে ১০০০ মানুষকে হত্যা করে। ১৮ আগস্ট 'আল জাবাল' জেলখানার জেল পরিবহণে ৩৭ বন্দীকে অনৈতিকভাবে হত্যা করে। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় নিরাপতত্তাবাহিনীর ক্যাম্পে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বাহিরে ২৬৪ শিশুসহ ৪০০ প্রতিবাদকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১৪ আগস্ট পুলিশ ব্রাদারহুডের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারীদের

2014

[১৫] সূত্র : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ নয়াদিগন্ত রেজি: ৪০০৫ বর্ষ ১০ , সংখ্যা ২১৬

[১৬] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/russia, Visited on 10-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫০ জন গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকারীদের মধ্যে ১৫০ জনই শিশু ছিল। কায়রোর সামরিক আদালত সামরিক অফিসার লাঞ্ছিতের অভিযোগে মুসলিম ব্রাদারহুডের ৫১ জন সদস্যকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করেন।[১৭]

বাংলাদেশে মানবধিকার পরিস্থিতি

'এইচ.আর.ডব্লিউ' বিশ্বমানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে 'এক করুণ পশ্চাদমূখী' বলে অভিহিত করেছে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।"এট্র্যাজিটিক ব্যাকওয়ার্ড স্লাইড" শিরোনামে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চলা বিচার কাজ নিয়ে বিতর্ক, সরকার বিরোধীদের ওপর দমন-নীপীড়ন, শ্রম আইন ও শ্রমিকদের অধিকার , নরী অধিকার, বর্তমান সংকট নিয়ে আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা , দেশের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে প্রতিবেদনে।[১৮]

প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় - হেফাযতে ইসলামের সমর্থক ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে চলা "ভ্রান্ত" বিচারের বিরোধিতাকারীসহ বিক্ষোভকারীদের বিরূদ্ধে অনেক সময়ই সরকার "সহিংস ও অবৈধ" পন্থা গ্রহণ করেছে। আইনবহির্ভূত ভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন এসব ব্যক্তির বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগগুলো নিয়ে তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার।

পোষাক করখানার কয়েক দফা দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পর শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাও আর্ন্তজাতিক মানের চেয়ে বহু নিচে। মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়ে সংগঠনের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য বছরটি ছিল বিয়োগান্তক। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনাবশ্যকভাবে বিক্ষোভকারী, আইনশৃংখলা বাহিনী সদস্য ও সাধারণ পথচারী প্রাণ দিয়েছেন। ভিন্নমতালম্বীদের ওপর ক্রমবর্ধমান অসহিঞ্চুতা, বিরোধী ও সমালোচকদের দমনে চূড়ান্ত কঠোরতা।

প্রতিবেদনে বলা হয় -বাংলাদেশের সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের । আর সেটি চলে বছর জুড়ে। এসময় নিহত হন অন্তত ২০০ জন এবং আহত হন হাজারো ব্যক্তি। একাত্তরের মানবতাবিরোধি অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) রায় ঘোষণাকে ঘিরে প্রাথমিক বিক্ষোভের শুরু হয়। তবে ৫ জানুয়ারীর সাধারণ নির্বাচন বর্জনে প্রধান বিরোধীদলীয় জোটের সিদ্ধান্তে সহিংসতা চলতেই থাকে। সরকারের সমালোচনা করার জন্য গ্রেফতার করা হয় একটি পত্রিকার সম্পাদককে।

এপ্রিলের ২০১৩ রানা প্লাজা ধ্বংসে এগারো শতাধিক পোষাক কর্মীর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সরকার তৈরী পোষাক ও অন্যান্য কারখানার কর্মীদের জীবন মানের উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক চাপের মুখে জুলাইয়ে শ্রম আইনে আনা সংশোধনীতে শ্রমিক সংগঠনের

---

[১৭] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/egypt, Visited on 11-12-2014

[১৮] প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারী ২০১৪, বুধবার, রেজি নং ডিএ, ১৮৮০, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৭৮, সম্পাদক, মতিউর রহমান, ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে নেয়া হলেও সংগঠন করার স্বাধীনতা রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে তা ব্যর্থ হয়।[১৯]

মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলা ও বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে সমস্যা এখনো অসমাপ্তই রয়ে গেছে। এই বিচারের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ থাকার মধ্যেও অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে ব্রাড অ্যাডামস মন্তব্য করেন, "এ সরকার গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারা ক্রমান্বয়ে আরো বেশি স্বেচ্ছাচারী ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।"[২০]

২০১৩ সালে সবচেয়ে বিপর্যয়কর ঘটনা হচ্ছে 'রানা প্লাজার' ভবন ধ্বসে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত ও অসংখ্য শ্রমিক আহত ও চিরতরে পঙ্গু হওয়ার ঘটনা।এছাড়া ২৯ আগস্ট মাদারীপুর শহরের যৌন পল্লীতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট এবং যৌনকর্মী মারধর ও লাঞ্ছিত করাসহ তাদের নিজস্ব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার ঘটনা জীবন ও অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। গুম বা গুপ্তহত্যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন।

দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর গুম বা হত্যা বিষয়ে প্রকাশিত খবরের পরিসংক্ষখ্যান অনুযায়ী ২০১৩ সালে গুমের শিকার হয়েছে মোট ৫৩ জন। এর মধ্যে ৫ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে, ৩ জন পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে মাত্র ২ জন মুক্তি পেয়েছেন এবং বাকীদের এখন পযর্ন্ত খোঁজ মেলেনি।

২০১২ বিভিন্নরাজনৈতিক দলের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষ. ক্ষমতাসীনদের সাথে বিরোধীদলের এবং রাজনৈতিক দলের অভ্যান্তরীন কোন্দল সহ মোট ৮৪৮টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটে।

এসব রাজনৈতিক সংঘাতে মোট ৫০৭ জন নিহত এবং প্রায় ২২,৪০৭ জন আহত হয়, নিহতের মধ্যে ১৫ জন পুরিশের সদস্য এবং দুজন বিজিবির সদস্য রয়েছে।২০১৩ সালে মোট ৮১২ জন নারী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী ৮৭ জনকে হত্যা করা হয় এবং আত্নহত্যা করে ১৪ হন।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন এবছরে ভারতের সীমান্ত প্রহরী বিএসএফদের গুলিতে নিহত হয়েছে অনেক নিরীহ নাগরিক। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০১৩ সালে সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন সহ মোট ৩৩৫ টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন ২৬ জন। শারিরীক নির্যাতনে আহত হয়েছেন ৮৪ জন এবং সীমান্ত থেকে অপহরণের শিকার হয়েছেন ১৭৫ জন। ২০১২ সালে তাজরীন গামের্ন্টসে অগ্নীকাণ্ডে ১১২ জন শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। ক্ষমতাসীনরা বিগত সরকারের সমালোচনা করে তাদের দায়িত্ব এরিয়ে যেতে চেষ্ঠা করে এবং অন্য দিকে বিরোধীদল ও কার্যকর কোন ভূমিকা পালন না করে শুধু মাত্র সরকারের সমালোচনা করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি

[১৯] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/bangladesh, Visited on 09-12-2014

[২০] প্রথম আলো, জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিনে অন্য কোন দেশের চেয়ে বেশি মানুষ কারারুদ্ধ করেছে। মৃত্যদণ্ড, নির্জন কারাবাস হিসেবে মানবাধিকার নীতি এবং প্রায় জাতিগত বৈষম্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৮২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, যা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের মধ্যে রেসিয়াল বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রেসিয়াল এবং জাতিগত সংখ্যালঘুরদের দীর্ঘ সামঞ্জস্যহীনভাবে মার্কিন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। যেখানে মার্কিন জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ কাউটিং আর অফ্রিকান আমেরিকানদের গ্রেফতার ২৪.৪ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব, বিচার পতি পরিসংখ্যান ব্যুরো আফ্রিকান আমেরিকান পুরুষদের প্রায় ৩.১ শতাংশ ল্যাটিন পুরুষ ১.৩ শতাংশ, সাদা পুরুষদের ০.৫ শতাংশ কারাগারে আছেন। তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনভাবে অপরাধমূলক রেকর্ড আছে সম্ভবত জাতিগত এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের সদস্যদের জন্য। প্রায় ২৫ মিলিয়ন অনাগরিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। সরকার তাদের ১০.৪ মিলিয়ন অনুমোদন ছাড়া দেশে। ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৯৬,৯০৬ জন নাগরিকের বহিষ্কার কার্যকর করে। হাজার হাজার কনিষ্ঠ বয়সের শিশু শত শত খামারে এ পর্যন্ত ঝুকিপূর্ণ কাজ, কীটনাশকের বিষক্রিয়া, মৃত্যুর মত ঝুকিপূর্ণ কাজ, বিশেষ করে ১৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ফসল উৎপাদন কাজে হাজার হাজার মানুষ আরো প্রতি বছর আহত হয়, বিদ্যমান ফেডারেল সুরক্ষা প্রায় প্রয়োগ করা হয় না। ফেডারেল আইন কৃষির বাইরে ১৮ বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য বিপদজনক কাজ নিষিদ্ধ।

নারী এ্যাক্ট (VAWA) বিরুদ্ধে সহিংসতা, দেশীয় এবং যৌন সহিংসতা ও ছদ্ম শিকার করার আইনি সুরক্ষার পরিসেবা প্রদানের প্রাথমিক ফেডারেল আইন একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন।

সামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০০০ জন নারী যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়। যৌন সহিংসতার অপর্যাপ্ত সামরিক তদন্তের পরে সমস্যা রয়ে যায়। কেননা যৌন নিপীরনের ২০ শতাংশের কম পুলিশের কাছে রির্পোট করা হলেও মানবাধিকার বাস্তবায়নে এসব রিপোর্টের ক্ষেত্রে সবসময় পর্যাপ্তরূপে তদন্ত করা হয় না।

যেমন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ পূর্বে ক্যালিফোনিয়া ও ইলিনয়ে যৌন নির্যাতনের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ফরেনসিক পরীক্ষা নেয়া হত না। সন্ত্রাস দমনে মানবাধিকার লজ্ঘন এর চিত্র আমরা দেখতে পাই। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সনে বারাক ওবামা ফিস্ক্যাল বছর ২০১২ (NDAA) এর জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স অনুমোদন আইন স্বাক্ষর করেন, আইনী চার্জ ছাড়াই সন্ত্রাসী সন্দেহভাজনদের অনিষ্ট কাজের জন্য আটক, বিদ্যমান সহিংসতাবাদ এবং সন্ত্রাস সন্দেভাজনদের প্রথমে সামরিক বাহিনী দ্বারা আটক করার পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দেন যা মানবাধিকার লংঘন এবং অনমনীয়। যেমন ১১ জানুয়ারীতে 'গুয়ানতানামো বে' এ সন্ত্রাস সন্দেহভাজন আটকানো বন্দীদের অধিকার লংঘন।

সি.আই.এ এর হেফাযতে বন্দীদের মৃত্যু, মসজিদ, মুসলিম ছাত্রদল এবং মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা নিউইয়ার্ক পুলিশ বিভাগের (NYPD) ব্যাপক নজরদারী এক্সপোজেরের পরে মানবাধিকারের লজ্ঘন করা হয়েছে। 'ড্রন বিমান' দ্বারা মার্কিনীরা নেভিগেশন নীতি ছিল শুধুমাত্র হত্যাকান্ডে নিয়োজিত থাকা যা মানবাধিকার ও মানবতা বিরোধী।

২০১৩ সালে মেরিল্যাণ্ডসহ ১৭টি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক অব কলম্বিয়া মৃত্যুদণ্ডকে বাতিল করে কিন্তু ৩২টি রাষ্ট্র এখনো মৃত্যদণ্ডাদেশ দেয়ার বিধান চালু আছে। ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ক্যারোলিনায় ৩৪ জন ব্যাক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। যা জাতিগত বিচারপতি আইন ২০০৯ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

রহিত ছিল। জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে এই বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ২০১৩ সালে। সাদা, আফ্রিকান আমরিকান, ল্যাটিন আমরিকানদের বেলায়ও জাতিগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ড্যাগ পাচার অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয় মার্কিন জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ, আফ্রিকান আমরিকানদের রাষ্ট্র বন্দি ৪১ শতাংশ এবং ফেডারেলদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্দিদের ৪৪ শতাংশ। ক্যালিফোনিয়ার কারাগারে ১৮ বৎসরের কম বয়সী তরুণসহ আনুমানিক ৩০,০০০ কয়েদী নির্জন কারা বাস করে। দীর্ঘায়িত নির্জন কারাবাস আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন হিসাবে গণ্য। আমেরিকার সারা শহর জুরে গৃহহীন মানুষদের লক্ষ করে ঘুরাফেরা করতে, বসতে এবং পাবলিক স্থানে বসতে নিষিদ্ধ আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয় যা অমানবিক। আমেরিকায় প্রায় ২৫ মিলিয়ন 'ননসিটিজেন' আছে যাদের মধ্যে প্রায় ১২ মিলিয়ন অনুমোদন ছাড়াই আছে। মার্কিন অভিবাসন আটক কেন্দ্রে সুবিশাল নেটওয়ার্ক এখন প্রায় প্রতি বছর ঝুলিতেছে ৪,০০,০০০ 'ননসিটিজেন' লোক। আমরিকায় হাজার হাজার শিশু খামারে কাজ করে। শিশু খামার কর্মীরা প্রায় ১০ ঘন্টার অধিক ও ঝুকিপূর্ণকাজ, কিটনাশক এক্সপোজার, নিকোটিন বিষক্রিয়া, তাপ অসুস্থতা, আঘাত, জীবনের দীর্ঘ অক্ষমতা এবং মৃত্যুর কাজ। ২০১২ সালে ১৬ বছরের কম বয়সী ৭৫ শতাংশ শিশু কাজ করে। সমকামী নারী পুরুষদের উচ্চ মাত্রায় যৌন সহিংসতার মুখামুখী হতে হয় । সরকারী হিসাব মোতাবেক ২০১২ সালে প্রায় ২৬,০০০ যৌন নিপীড়নের শিকার।[২১]

অস্ট্রেলিয়ায় মানবাধিকার পরিস্থিতি

জুলাই,২০১৩ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, অস্ট্রেলিয়া নাগরিক ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ৪০ জন শরনার্থীকে আটক করে এবং ১৪৩ টি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। অস্ট্রেলিয়া ভিসা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া আসার জন্য বাধ্যতামুলক আটকের চর্চা অব্যাহত আছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এর হিসাব মোতাবেক ১,০৭৮ শিশুসহ ৬৪০৩ জন মানুষ নিরাপদ অভিবাসন সুবিধায় আটক রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৩০,০০০ উদ্বাস্ত শরনার্থী তাদের ভিসা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য অপেক্ষায় দিনাতিপাত করছে।[২২]

সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি

একটি বিদ্রহী জোট যা 'Seleka' হিসেবে পরিচিত ১৪ মার্চ, ২০১৩ সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোসা Bozize কে জোর করে বহিষ্কার করে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী 'বানগুই' নিয়ন্ত্রন করে। এই 'সেলেকা' বিদ্রোহী গোষ্ঠী রাজধানীতে নির্বিচারে মানুষ হত্যাসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জরিয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে 'বানগুই' এবং রাজধানীর বাইরে হত্যাকাণ্ড এবং লুটপাটে দরিদ্র জনসংখ্যা নিঃস্ব ও গৃহহীন হয়ে পরেছে। সেন্ট্রাল আফ্রিকার 'সেলেকা' যোদ্ধাদের ভীতিতে মানবিক সাহায্য বিতরণ বাধাগ্রস্থ, সাংবাদিক ও সুশিল সমাজের কর্মীদের হয়রানীসহ মানবাধিকারের মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১২ আক্রমণাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে একটি শান্তিচুক্তি সরকারের নিকট পৌছায় পরে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র গ্রুপের অত্যাচারে মানবাধিকার উপেক্ষিত হয়। অনেক ঘরবাড়ী লুটপাট করে, এবং উভয় পক্ষের দ্বারা মানবাধিকার উপেক্ষিত হয় এবং নারী ও মেয়ে শিশু

---

[২১] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/united-states, Visited on 06-12-2014

[২২] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/australia, Visited on 13-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষিত হয়। সংঘর্ষে শত মানুষ নিহত হয়েছে এবং অনেক সম্প্রদায়কে মাটিতে পুতিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতি সংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে যুদ্ধের তীব্রতায় Bossagoa এর কাছাকাছি উত্তরে প্রায়১,১৭,০০০ বেসামরিক মানুষ সহ প্রায় ৩৬,০০০ শরনার্থী 'বোসাগোয়ার' একটি স্থানীয় স্কুল এবং ক্যাথলিক গির্জায় আশ্রয় নেয়। অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত শরনার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪,০০,০০০। সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের শরনার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬৫০০০ উদ্বাস্ত DRC(Democratic Republic of the Congo) এর অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেয়।[২৩]

পাকিস্তান মানবাধিকার পরিস্থিতি

২০১৩ পাকিস্তানের জন্য একটি হিংসাত্মক বছর ছিল। মে, ২০১৩ তে নেওয়াজ শরীফ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। নির্বাচন ছিল তালেবান এবং তাদের অনুমোদিত বাহিনীর দ্বারা অন্তর্ঘাত বোমা দ্বারা হত্যার লক্ষ্যবস্তু। ২০১২ এবং ২০১৩ তে ২২ জন পলিও টিকা কর্মী নিহত হয়। নির্বাচন প্রচার অভিযানের সময় অন্তত ১১০ জন নিহত হয় এবং ৫০০ জন আহত হয়। ২০১৩ সালে ৪০০ শিয়া সদস্য হামলায় নিহত হয়। বেলুচিস্তান প্রদেশের 'কায়েটায়' ২০০ মানুষ (শিয়া হাজারা সম্প্রদায়ের) নিহত হয়। জানুয়ারী ২০১৩ একটি আত্মঘাতি বোমায় ৯৬ জন জন শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হয় এবং ১৫০ জন আহত হয়। ফ্রেরুয়ারী তে অন্তত ৮৫ জন নিহত হয় এবং আহত হয় ১৬০ জন। লক্ষ্যবস্তুর স্বীকার ছিল শিয়া সম্প্রদায়।

মার্চ ২০১৩ করাচিতে বোমা হামলায় শিয়া সম্প্রদায়ের ৪৭ জন নিহত ১৩৫ জন আহত হয় ৫০টি অ্যাপারটমেন্ট এবং ১০টি দোকান ধ্বংস হয়। ২০১৩ সালে প্রায় ১২ জন লোক ব্লাসফেমি আইনের আওতায় মৃত্যুদন্ডের জন্য রায় বিদ্যমান আছে। অন্তত ১৬ জনকে এই অপরাধের অভিযুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালে পাঞ্জাব জেলায় অসিয়া হাবিবি নামে এক খৃষ্টান মহিলাকে দেশের ইতিহাসে প্রথম নারীকে ব্লাসফেমির জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৩ পেশওয়ারের একটি গির্জায় রবিবারের প্রার্থনার সময় আত্মঘাতি বোমায় প্রায় ৪১ জন নিহত হয় এবং আরো ১৩০ জন অবরুদ্ধ হয়। এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের উপর প্রাণঘাতি আক্রমণ ছিল। পাকিস্তান নারী ও মেয়ে শিশুদের ধর্ষণ সহ সম্মানহানী, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক সহিংসতা এবং জোরপূর্বক বিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রতিবেদন মোতাবেক গত তিন বছরে বেলুচিস্তান প্রদেশে অব্যাহত হত্যাকাণ্ডে প্রায় ৭,০০,০০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০১১ সালে আফগান সীমান্তের কাছে 'Salala attack' মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ২৪ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ছাত্র ও শিক্ষক জঙ্গিদের দ্বারা নিয়মিত আক্রান্ত হত। যেমন অক্টবর ৯, ২০১২ তে ১৫ বছরের ছাত্র এবং শিশু শিক্ষা অধিকারের স্পষ্টভাষী উকিলকে বন্দুকধারীরা মাথায় ও ঘাড়ে গুলিকরে গুরুতর অবস্থায় রেখে যায়। জঙ্গি গ্রুপ আরো ১০০ টিরও বেশী স্কুল আক্রমণ করেছিল।[২৪]

শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার পরিস্থিতি

শ্রীলঙ্কায় প্রায় তিন দশক ধরে গৃহযুদ্ধ চলার সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙঘনের জবাবদেহীতা ২০১৩ সালে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। পুরো বছর ধরে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের

[২৩] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/central-african-republic, Visited on 13-12-2014

[২৪] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/pakistan, Visited on 18-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বৌদ্ধ জঙ্গি গ্রুপ দ্বারা আক্রমণের একটি উদ্দীপন লক্ষ্য করা গেছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সরকার গৃহযুদ্ধ বন্ধের সময় পরাজিত এল.টি.টি এর ২৩০ জন সমর্থকসহ প্রায় ১২০০০ সদস্যকে আটক করে। যুদ্ধ বিরতির সময় আটককৃত এলটিটিই এর অন্তত ১১,০০০ সন্দেহভাজন সদস্যদের মুক্তি দেন এবং এখনও আটক আছে আনুমানিক ১৮০ জন সদস্য। সশস্ত্র সংঘাতের সময় নিরাপত্তাবাহিনীর হেফাজতে বন্দীদের প্রতি নির্যাতন ও অন্যান্য দূর্ব্যবহার একটি ব্যাপক সমস্য হয়ে দাড়িয়েছে। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' ফেব্রুয়ারীতে একটি নতুন প্রমাণ প্রকাশ করেন 'সন্দেহভাজন এলটিটিই আই এবং এর সমর্থকদের বৃহত্তর নির্যাতনের মূল উপাদান হচ্ছে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা। জঙ্গি গ্রুপ 'বৌদ্ধ বালা সেনা' (বিবিএস) দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি।[২৫]

উত্তর কোরিয়া মানবাধিকার পরিস্থিতি

উত্তর কোরিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ফৌজদারী কোড হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড -'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, মানুষের বিরোদ্ধে অপরাধ'। ডিসেম্বর ২০০৭ সালে দণ্ডবিধিতে অতিরিক্ত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বাড়ানো হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের জোরপূর্বক শ্রম শিবিরে পাঠিয়ে পাশবিক নির্যাতন করা হয়। যা পরিচালিত হচ্ছে 'North Korea's National Security Agencey'। বন্দী শিবিরে সামষ্টিগত শাস্তি অনুশিলন অব্যাহত রয়েছে। সরকার অপরাধীর সাথে অপরাধির মা-বাবা, স্ত্রী সন্তান এমনকি নাতিকেও জোর করে শ্রম শিবিরে পাঠায় । ক্যাম্পে অনাহার, সামান্য অথবা চিকিৎসা ছাড়া জীবন যাপন, সঠিক আবাসন ও জামাকাপড় ছাড়া চলা, একটানা ক্ষুধা, রক্ষিবাহিনী দ্বারা নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকরসহ ভয়ানক জীবন যাপন করে। ফলে শ্রম শিবিরগুলোতে মৃত্যুর হার অত্যন্ত উচ্চ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তার হিসাব অনুসারে 'উত্তর কোরিয়া' kaechun(camp-no 14), Yodok (cam no-15), Hwasung (camp no-16), Chungjin(camp no-25) এর মধ্যে ৮০,০০০ হতে ১,২০,০০০ মানুষ কারা রুদ্ধ অবস্থায় মানেবতর জীবন যাপন করছে। ২০১৩ তে নতুন উপগ্রহ উৎক্ষেপনের জন্য Hoerycung ক্যাম্প নং -২২ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে আনুমানিক এর ৩০,০০০ বন্দীর ভাগ্যে কি ঘটেছে তা স্পস্ট নয়। সরকার তথ্য ও ভ্রমন স্বাধীনতার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এর প্রতিরোধে জোর পূর্বক শ্রম, সরকার কর্তৃক আটক ও মৃত্যুদণ্ডের হুমকী দিয়ে থাকে।[২৬]

গুয়েতমালায় মানবপরিস্থিতি

মে ২০১৩ গুয়েতমালার সাবেক নেতা Efrain Rion Montt কে মানবতার বিরুদ্ধে গণহত্যা অপরাধের দোষী সাবস্ত হয়। ১৯৪২ সালে Rion Montt দোস এরোস শহরে শিশুসহ ২৫০ জনকে হত্যা করার মাধ্যমে গণহত্যা পরিচালনা করেন। মানবাধিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২ সালে Lynchign এ ২৩ জন নিহত হয় এবং অপর ৬ জন নিহত হয় ফেব্রুয়ারী, ২০১৪। ২০০৫ এবং ২০১৬ সালে Pavon এবং Infierito জেলখানায় ১০ বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর যা ছিল অমানবিক। আগাস্ট ২০১৩ আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা সহায়তায় গুয়েতমালার সরকারী রিপোট অনুযায়ী

---

[২৫] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/sri-lanka, Visited on 14-12-2014

[২৬] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/north-korea, Visited on 15-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অধিকার বিপজ্জনক। গুয়েতমালার আইনে সর্বনিম্ন বয়স কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ বছর। সেখানে ১৪ বসরের কম বয়সী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩,০০,০০০ যা বিপদজনক। এদের মধ্যে ১১ শতাংশ আছে ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সের এবং ২১ শতাংশ যা শিশু শ্রম সংস্থার বিবেচনায় বিপদজনক। যৌন পর্যাটন, পর্ণোগ্রাফি এবং সংঘটিত অপরাধে শিশুদের শোষণ একটি মারাত্নক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা গুয়েতমালার একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। গুয়েতমালার মানবাধিকার ন্যায়পাল কার্যালয় দ্বারা উদ্বৃত সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী 'দায়ি ব্যক্তি বিচারের সম্মুখীন না হওয়ায় নারী ও মেয়ে শিশুদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘঠছে। বে আইনীভাবে গর্ভপাত, ধর্ষণ নারী জীবনের হুমকী হয়ে দাড়িয়েছে। ২০১২ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গুয়েতমালায় প্রতিবছর ক্যানসার অথবা এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত হয়ে (১০,০০০) দশ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যায়। মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হুমকী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সহিংসতা ভীতি প্রদান, স্বাধীনভাবে সভা সমাবেশ ও সংগঠন করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।[২৭]

বাহরাইনে মানবাধিকার পরিস্থিতি

নারীদের ব্যক্তিগত আইন বাহরাইনের সুন্নি আদালত দেশের শিয়া আদালতে প্রযোজ্য নয় । গার্হস্থ্য সহিংসতা বিশেষভাবে দণ্ডবিধির মধ্যে সুরাহা হয় না এবং বৈবাহিক ধর্ষণ একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। অভিবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বাহরাইনে এশিয়া থেকে প্রায় প্রাথমিক ভাবে ৪,৬০,০০০ অভিবাসি শ্রমিক অবস্থান করছে এবং এর ৭৭ শতাংশ বাহরাইনের ব্যক্তিগত কর্মী। এই শ্রমিকরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, যেমন-অবৈতনিক, মজুরী, পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত, অনিরাপদ আবাসন, অত্যাথিক কর্মঘন্টা, শারীরিক নির্যাতন এবং জোরপূর্বক শ্রমসহ গুরুতর নির্যাতন সহ্য করে।[২৮]

দক্ষিণ সুদানে মানবাধিকার পরিস্থিতি

২০১৩ সালে Jonglei রাষ্ট্রের একটি বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর সরকার বিরোধী বিদ্রোহ অপারেশনে জাতিগত সহিংসতা বিরাজ করে। সরকার তার নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা বে আইনী হত্যাকাণ্ড, গ্রেফতার, আটকসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া এবং ন্যায় বিচার প্রশাসনের মধ্যে অনেক মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিদৃষ্ট হয়। সাম্প্রতিক ২০১৩ সালে দক্ষিণ সুদানের Jonglei সেনাবাহিনী এবং 'মুরলী' জাতিগত গ্রুপের মধ্যে সহিংসতা ও সংঘাতে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং আন্তঃজাতিগত সংঘাত অব্যহত আছে। Sudan People's Libaretion Army(SPLA) 'মুরলী' এলাকায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের গুরুত্ব লঙ্ঘন করে বিদ্রোহীদের বাড়িতে গিয়ে হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা, ঘরবাড়ী লুট, স্কুল, গির্জা, সাহায্য সংস্থার কম্পাউন্ড ধ্বংস করা হহয়েছে। ২০১২-২০১৩ সালে লুই Nuer দ্বারা মুরলী আক্রমণে অন্তত ৮৫ জনকে হত্যা করে। স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তার হিসাব অনুযায়ী জুলাই ২০১৩ তে মুরলীতে হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে ৩০০ জনকে হত্যা করে। wbivc Evevwnbxi

---

[২৭] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/guatemala, Visited on 14-12-2014

[২৮] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/bahrain, Visited on 10-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন ছিল বেশী। ২০১৩ সালে সৈন্যদের বীট, আটক এবং সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক সম্পত্তি আক্রমণ, সন্ত্রশ ডাকাতি এবং আন্তঃবংশ আক্রমণসহ মানবতা বিরোধি অপরাধ সংঘটিত হয়।[২৯]

থাইল্যান্ডে মানবাধিকার পরিস্থিতি

২০১০ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা যায় কমপক্ষে ৯০ জন এবং আরো ২০০ জন আহত হয়েছে। সৈন্যদের দ্বারা প্রাণঘাতী অহেতুক বল প্রয়োগ। এ ছাড়া সৈন্য, পুলিশ এবং বেসামরিক লোকের উপর মারাত্মক সশস্ত্র হামলার জন্য দায়ী। ৩০ নভেম্ব, ২০১৩ ব্যাংককের Ramkhaeng University 'Rajamangala' স্টেডিয়ামে প্রো মিলিশিয়া এবং সরকার বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাতে ৪ জন নিহত এবং ৬০জন আহত হয়। ১ ডিসেম্বর ২০১৩ ব্যাংকক মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে People's Democretic Reform Committee (PDRC) এবং অন্যান্য সরকার বিরোধী দল থেকে প্রতিবাদকারীরা অন্তত ২০০ জন আঘাত প্রাপ্ত হয়। থাই নিরাপত্তা বাহিনী জাতিগত মুসলিম মালয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে হত্যা ও অন্যান্য নির্যাতনের জন্য দায়ী। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা সংঘঠিত নির্যাতনে মুসলিম স্বীকার শতশত আর্থিক ক্ষতিপুরণ প্রদান করা, তবে নিরাপত্তা কর্মীদের এখনো দায়মুক্তির সাথে কাজ, একটি একক নিরাপত্তা কর্মকর্তার বিচাবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন এবং বলপূর্বক অন্তর্ধান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য নির্যাতনের জরিত থাকার জন্য দায়ি করা হয়েছে। সরকারী স্কুলের বিরুদ্ধে বোমা হামলা এবং বৌদ্ধ শিক্ষকদের আক্রান্ত করা হয়। জানুয়ারী ২০০৪ সাল থেকে ১৬৪ জন শিক্ষক দক্ষিণ থাইলান্ডে নিহত হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ২০ জনের বেশী পরিবেশবিদ ও মানবাধিকার রক্ষাকারীদের হত্যা করা এবং স্বাক্ষী সুরক্ষা প্রদানে বিচারপতি মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আইন প্রয়োগ প্রতিষ্ঠার হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়েছে। থাইল্যান্ড থাই-বার্মী সীমান্ত শিবিরে ১,৪০,০০০ বার্মিজ শরনার্থী অবস্থান করছে। শরনার্থী শিবিরে ৪০% শতাংশ অতিবঞ্চিত ফলে থাইল্যান্ডে তাদের চলাফেলার স্বাধীনতা সীমিত করেছে এবং সব উদ্বাস্তদের কাজের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে।

২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকসীন এর সময়কাল থেকে ২৮০০ এর বেশী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আর এই বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডর অপরাধ তদন্ত খুব ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে।[৩০]

ইন্দোনেশিয়া মানবাধিকার পরিস্থিতি

ইন্দোনেশিয়ায় গুরুতর মানবাধিকার পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে আহমাদিয়া ,বাহাইয়া এবং শিয়াদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, পাপুয়া ও পশ্চিম পাপুয়া প্রদেশের আদিবাসিদের নির্যাতনের জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দায়বদ্ধতার অভাবকে দায়ি করা চলে। ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই বলে চলে। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় একটি আইনের পরিকাঠামো ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। জুন ৬, ২০১৩ একটি মারাত্মক ট্রাফিক ঘটনায় জরিত ২ সৈনিকের মারধরের জন্য পাপুয়ান গ্রামের Rampaged এ সৈন্যরা বাজার এলাকায় এলোপাতারী গুলি ছোড়ে ১৩ জন গ্রামবাসীকে ক্ষত-

---

[২৯] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/south-sudan, Visited on 12-12-2014

[৩০] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/thailand, Visited on 17-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষত করে প্রায় ৮৭ বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং একটি নেটিভ পাপুয়ান সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করে।

ইন্দোনেশিয়ার 'সেতারা ইনস্টিটিউট'(যা ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিরীক্ষা করে) এর প্রতিবেদন অনুযাযী ' ধর্মীয় আক্রমন সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২০১০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যথাক্রমে ২১৬ থেকে ২৪৪ টিতে বেড়েছিল। আর ২০১২ এর প্রথম ৯ মাসে বৃদ্ধি পায় প্রায় ২১৪টি মামলা। মে ২০১৩ আগাস্ট পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর ও পাপুয়ান কর্মীদের সহিংসতায় একজন ইন্দোনেশিয়ান নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা, একজন জার্মান পর্যটক সহ ১৮ জন মানুষ নিহত হয়। ১৪ জুন ২০১৩ পুলিশ বিচার বহিরভূতভাবে KNPO এর ডেপুটি চেয়ারম্যান 'ম্যাক তাবনী' কে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং জয়পুরার প্রতিবেশী এক মহিলাকে গুলি করে হত্যা করে। মে, ২০১৩ জঙ্গি ইসলামিক ডিফেন্স ফ্রন্ট এর বিক্ষোভের পর আচেহ্ প্রদেশে Singkil রাজ প্রতিনিধিত্ব ১৯টি গির্জা 'পাম্বী' এবং জাতিগত দলের মধ্যে নেটিভ ধর্মালম্বী Pakpak Dairi এর এক আত্মার পূঁজার ঘর বন্ধ করে দেন। সরকার অবিবাহিত নারী পুরুষদের সমিতি, এবং নির্জনে চলাফেরা নিষিদ্ধ করে, ইচ্ছামত গ্রেফতার এবং ইচ্ছামত আটক করে একটি 'শরী'আহ পুলিশ বাহিনী' দ্বারা বল প্রয়োগ করে। উল্লেখ্য যে, শরী'আহ পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত একটি ১৬ বছরের কিশোরী আত্নহত্যা করে। সুইসাইট নোটে বলা হয়েছে দুটি দৈনিক সংবাদ পত্র 'সে পতিতা ছিল' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করলে সে অভিযোগ অস্বীকার করে এবং এর লজ্জায় সে আত্নহত্যা করে। ইন্দোনেশিয়ার অভিবাসী নারী শ্রমিকের মানবেতর জীবন প্রায় চার মিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান মহিলা গৃহকর্মী হিসেবে মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর মিডল ইস্ট এর মধ্যে কাজ করে। এই নারীর শ্রম শোষণ, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন জোরপূর্বক শ্রম এবং দাসত্বের মত অবস্থা পরিস্থিতি সহ অনেক নির্যাতনের সম্মুক্ষীন হন। সর্বোপরি মেয়েরা তাদের নিয়োগকর্তা এবং তাদের নিয়োগকর্তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মানসিক শারীরিক এবং যৌন সহিংসতার দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে যা মানবিকতার পরিপন্থি। ফেব্রুয়ারী ২০১২ হিসাব অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ায় আটক হাজার হাজার শরনার্থীদের মধ্যে অনেক শিয়া, পার্শবর্তী শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, মায়ানমার এবং অন্যত্র থেকে এস এস শরনার্থী হেফাযতে রয়েছে। এই শরনার্থীরা কেউ আটক, শিক্ষার সিমিত সুযোগ, নির্যাতনের সম্মুখীন অথবা সামান্য মৌলিক সহায়তা নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ফেব্রুয়ারী ২০১২ সালে একটি আফগান শরনার্থী অভিযুক্ত ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে রক্ষিবাহিনী দ্বারা Inficted আঘাত দ্বারা মারা গেছে। ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কহীন ১০০০ একাকী অভিবাসী শিশু আছে যাদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক দের সাথে আটক আছে প্রায় ২০০।

প্রেসিডেন্ট বৃহত্তর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতার জন্য আপিল করা হলেও জাতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অব্যাহত আছে। অনেক এলাকায় বেসরকারী সংস্থা, নারী অধিকার লঙ্ঘন বিস্তার, ইন্দোনেশিয়ায় একাকী শিশু অভিবাসন সংখ্যা বৃদ্ধি সহ উদ্বাস্তু ও মানবাধিকার পরিস্থিতি। ২ জুলাই ২০১৪ ইন্দোনেশিয়ার সংসদ এনজিও সমিতি, ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে এনজিও কার্যক্রমের বাধ্যবাধকতা, এনজিও বিষয়ে বৈদেশিক অর্থায়ন সীমারেখা, নাস্তিকতা, কমিউনিজম, মার্কসবাদী, লেলিনবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রদশর্নের বিপরীত বিশ্বাস নিষিদ্ধ। ২০০৯ সালের প্রথম একটি লিঙ্গ সমতার বিল আনা হলেও ২০১৩ সালে বিরোধী ইসলামী রাজনীতিবিদদের কারণে বন্ধ হয়ে আছে।[৩১]

লিবিয়ায় মানবাধিকার পরিস্থিতি

লিবিয়ার মিলিশিয়ার সহিংসতায় বিক্ষোভ কারী মিসবাতার শান্তিপূর্ণ অবরোধ সময় সংঘর্ষে প্রায় ৫১ জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৫০০ জন আহত হয়েছে। ২০১১ সালে সশস্ত্র সংঘাতে প্রায় ৪০০০ জন মানুষকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে মিলিশিয়ারা প্রায় ৩০০০ লোককে তাদের হেফাজতে ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যা করে।

২০১৩ সালের শেষ দিকে লিবিয়ার 'Tawergha' টাওয়েরগা শহর থেকে প্রায় ৩৫,০০০ মানুষকে জোর পূর্বক তাদের বাস্তুচ্যুত করা হয়। ১৩০০ মানুষকে মিসবাতার মধ্যে আটক করে, সরকারী বহিনীর হেফাজতে হয়রানী, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। সারা বছর ধরে মিলিশিয়ারা প্রধানত ত্রিপোলি, বেনগাজিতে সাংবাদিকদের ও অন্যান্য মিডিয়া কর্মীদের উপর হামলা, মারধর এবং হত্যার হুমকি অব্যাহত ছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন যার কারণে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সূফী ধর্মীয় নেতা 'দেরনাকে' ত্রিপোলির পূর্ব শহরে অজানা বন্দুকধারী দ্বারা হত্যা করা হয়। নারী অধিকার লঙ্ঘন হয় প্রতিনিয়ত। ফেব্রুয়ারী ২০১৩ লিবিয়ার সুপ্রিম কোর্ট একটি মানুষ তার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া চার স্ত্রী পর্যন্ত বিবাহ করতে সক্ষম এবং বহুবিবাহ উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। লিবিয়ার গাদ্দাফি দুর্নীতি ও যুদ্ধ কালিন নির্যাতনের জন্য ১৯৯৬ সালে 'ত্রিপোলির' আবু সালিম কারাগারে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করার মাধ্যমে গণহত্যা পরিচালনা করে যা অমানবিক।[৩২]

পর্যালোচনা

পৃথিবীর পরাশক্তিসমূহ মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার করুণ শিকারে পরিণত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে দুর্বল দেশসমূহে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর নগ্ন আগ্রাসন, গণহত্যা, স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা হরণ, সিরিয়া, ইরান ও সৌদি আরবের প্রতি মার্কিন হুমকী, বসনিয়া-হর্জোগোভিনায় সার্ব বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, ফিলিস্তীনে ইসরাইলী আগ্রাসন ও দমন-পীড়ন,আলবেনিয়ায় গণহত্যা, স্বাধীনতাকামী কাশ্মীর ও মিন্দানাওয়ে মুসলিম নিধন, মায়ানমারে মুসলিমদের ওপর জেল জুলুম ও নির্যাতন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও কোন কোন দেশে ঘন ঘন সামরিক শাসন জারী, আমেরিকায় মুসলিম ও নিগ্রোদের প্রতি বৈরী আচরণ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে নাগরিক অধিকার হরণ, দেশেদেশে বোমাতাংক এবং সামাজিক নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অস্থিতিশিল বিশ্ব পরিস্থিতি আজ জাতিসংঘের অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং বিশ্ব মানবাধিকার পরিস্থিতিকেও আজ বিপর্যয়কর অবস্থার মুখোমখি এনে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে মানবাধিকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর ২য় মহাযুদ্ধের অবসানের পর জাতিসংঘ গঠিত

[৩১] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/indonesia, Visited on 15-12-2014
[৩২] http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/libya, Visited on 16-12-2014

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পর থেকে জাতিসংঘের আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠা সত্ত্বেও শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যথতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীর সমস্যা, ফিলিস্তিন সমস্যা, কম্বুডিয়া, ভিয়েতনাম কোন সমস্যার সমাধানই জাতিসংঘ করতে পারেনি। জাতিসংঘ কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে তাবেদারীতে নিযুক্ত মুসলিম বিশ্বে সমস্যা সমাধানে পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মিশর, সুদান,ইরাক, লিবিয়া, তুরস্ক ও আলজেরিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের পর্যায়ক্রমে লীগ অব নেশন্স এর পরিনিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আলজেরিয়া ও তুরস্কে মানবাধিকার নির্মম ভাবে হরণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও পশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ফ্যাসিবাদী বর্বর ও সামরিক জান্তাদের মানবতাবিরোধী পদক্ষেপে ইন্ধন যোগাচ্ছে। কাশ্মীরে, ফিলিস্তিনে, চেচনিয়-বসনিয়ায় আফগানিস্তানে মানবাধিকার লংঘন, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ও জাতিসংঘের মধ্যে কোন সমবেদনার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে না।

জাতি সংঘের ব্যর্থতার কারণ:

ক. বৃহৎ পরাশক্তির প্রাধান্য।

খ. বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা।

গ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ঙ. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ও তা কার্যকর করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ এমন কি এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালও কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী লজ্জাজনক। প্রকৃত পক্ষে, জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তির প্রভাবমুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারলে ২১ শতাব্দীতে বিশ্ব-শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হয়তোবা ইতিহাসে বিস্ময়কর অবদান সৃষ্টি করা সম্ভব হতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের নৈতিক, আইনানুগ প্রয়োগ ও সংরক্ষণ

মানবাধিকার হলো মানুষের সহজাতভাবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ যা তার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারের পরিসর অনেক ব্যাপক। পৃথিবীর সাধারণ সংবিধানগুলোর মত তা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে পারস্পারিক সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। কুর'আনিক সংবিধানের প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের গোটা জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। কুর'আন মজীদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যেই নয় আকিদা বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগী, চরিত্র নৈতিকতা, সমাজ সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং জীবননের অপরাপর শাখায় পরিব্যপ্ত অসংখ্য বিষয় এমনভাবে সুসংগঠিত করে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নের খুব সীমিত সুযোগ আছে। আর এই সীমিত সুযোগের মধ্যেও স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ণের অনুমতি নেই বরং এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, প্রতিটি আইন কুর'আন হাদীসের বিধান ও তার প্রাণসত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হতে হবে। ইসলাম মানুষের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে তা সংবিধানের অংশ হওয়ায়, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উর্দ্ধে হওয়ায় এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জন যোগ্য হওয়ার কারণে কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সবগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য। এসব অধিকারের মধ্যে শুধু মাত্র জীবনের নিরাপত্তা,

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা, মালিকানার নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার লাভ, সমতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার মত বিষয়গুলোই অর্ন্তভূক্ত নয় বরং একটি নবজাত শিশুর দুধ পানের সময়সীমা থেকে নিয়ে একজন নারীর মোহরের অধিকার পর্যন্ত সমসস্ত অধিকার অন্তর্ভূক্ত- যা আল্লাহ ও তার রাসূল নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যার মধ্যে কোনরূপ সংশোধনী আনায়নের এখতিয়ার কারো নেই। কুর'আন মাজিদ মানুষের আইন প্রণয়ন উপর আরোপ হওয়ার মত বিধি-নিষেধের জন্য "হুদূদুল্লাহ"(আল্লাহর নির্ধারিত সীমা) পরিভাষা ব্যবহার করেছে। এসব সীমারেখার আনুগত্য করা সম্পর্কে কুর'আনের নিম্নোক্ত হেদায়াতবাণী দেখা যেতে পারে। "এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, তার ধারে কাছেও যাবে না ".[৩৩] অন্য আয়াতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন "আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী, ইবাদতকারী .. এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।[৩৪] আল্লাহ তা'আলা কেবল সাধারণ লোকদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপরেই বিধি নিষেধ আরোপ করেননি বরং যেসব ব্যপারে আল্লাহর বিধান বর্তমান আছে তার মধ্যে মহানবী (সা.) কেও নিজের মর্জিমত কোনরূপ সংশোধন আনায়নের অধিকার দান করেননি। "বল (হে মুহাম্মদ!) নিজের পক্ষ থেকে এই কিতাবে পরিবর্তন আনায়নের অধিকার আমার নেই। আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করি তবে আমার আশংকা রয়েছে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির শিকার হওয়ার।[৩৫]

কিসাস, রক্তপণ, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, ওসিয়াত, বিবাহ ও তালাক এবং তা'যীর (দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি), মুহারিবাত (যুদ্ধ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সব অধিকারকে মৌলিক অধিকার গণ্য করা হবে যা আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর (সা.) এর সুন্নাতের মাধ্যমে র্নিধারিত হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয় যে, তার মধ্যে রদবদল করার এখতিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রের নেই বরং সে মহান আল্লাহর নিদের্শের ভিত্তিতে তা কার্যকর করতে বাধ্য। এখানে ঐসব অধিকারের মর্যাদা কেবল নিরাপত্তামূলক (defensive) ও আত্নরক্ষামূলকই (protective) নয় বরং ইতিবাচক (Positive) এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই যে, সে তার যাবতীয় ক্ষমতা ও উপায় উপকরণ কাজে লাগিয়ে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।[৩৬]

শরী'আত যেসব ব্যাপারে কোন আইন বিধান নির্ধারিত করেননি কেবল সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইন প্রনয়ন করবে। যেমন, বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামের আইন প্রণয়নের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন, সংসদের কার্যপ্রণালী, অভ্যান্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, লেনদেন, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন- রেলওয়ে, বিদ্যুত, পরিবহণ, গ্যাস গৃহনির্মাণ, শিক্ষাব্যবস্থা,শিল্প ও কারিগরী সরকারী কর্মচারী শ্রমিক ও কৃষকদের কল্যান প্রচেষ্টা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান রচনা করতে পারে। এসব আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অধিকারসমূহকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এসব বিধান স্থান কাল পাত্রভেদে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির ধরন অনুযাযী রচনা করতে হবে।

সমাজে মানুষের এরূপ অধিকার বিভিন্ন আইনগত ও বিধি-ব্যবস্থায় স্বীকৃত হলেও নানাবিধ রাজনৈতিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে অর্জন, সংরক্ষণ ও বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ফলে মানবাধিকারের লংঘন বাঞ্চনার ঘটনা দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের অধিকার আদায়,সংরক্ষণ

[৩৩] আল-কুর'আন, ২: ১৮৭
[৩৪] আল-কুর'আন, ৯ : ১১২
[৩৫] আল-কুর'আন, ১০: ১৫
[৩৬] মুহাম্মদ সালাহুদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, পৃ. ১২১-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

ও সমুন্নত করতে মানুষকে সাহায্য করার সেবা সহায়তা দরকার হয়। আইনগত সেবা সহায়তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এরূপ মানবাধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণে মানুষকে সাহায্য করা। কেননা, আইনগত সেবা এমন এক সহায়তদা কার্যক্রম যা অসহায় ও নিঃস্বকে তাদের আইনগত স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থন যোগান। এরূপ সহায়তার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মর্যাদা ও সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্ষমতা অর্জন করে। ফলে আইনগত সহায়তা হয়ে দাঁড়ায় মানবাধিকার বাস্তবায়নের একটি উপায়। আদালতে আইনগত লড়াইয়ে সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আইন বিষয়ে সচেতনতা এবং আইনী লড়াইয়ে অক্ষমদের আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির মতো অর্জন মানবাধিকার আদায় ও সমুন্নতকরণে কার্যকরভাবে সহায়ক হয়। মানবাধিকার সংরক্ষনে আইনগত তৎপরতার অবদান ও ভূমিকা যেসব বিষয়াদিতে সমুজ্জ্বল পাওয়া যায় তাহলো মুখ্যত নিম্নরূপ :

১) অধিকার বিষয়ে সচেতনতা আনায়ন করে
২) অধিকার ভোগের পরিবেশ তৈরীতে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে
৩) বৈষম্য ও অসমতা প্রতিরোধ করে
৪) মীমাংসা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করে
৫) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত গঠন করে
৬) সমতার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলে
৭) মৌলিক অধিকারের লংঘন প্রতিরোধ করে
৮) নিজের অধিকার অর্জন ও ভোগে মানুসকে সক্ষম করে
৯) মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়
১০) অবহেলিত-বঞ্চিত ও অসহায় নিঃস্ব মানুষের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে

মানবাধিকার কার্যকর বাস্তবায়ন, সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ, অর্জন, সংরক্ষণ ও বিকাশে আইনগত সহায়তায় আওতায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে:

১. জনগণকে আইনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
২. আইন সম্পর্কিত বিষয়ে আইন সহায়তাকর্মীকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া।
৩. জনগণকে মানবাধিকার বিষয়ে ব্যাপকতর সচেতন করা ও এর অর্জন রক্ষা- বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা।
৪. আইনগত সেবা সহায়তার পরিধি বিস্তৃতকরণ
৫. আইনী জটিলতা ও ভীতি দূর করা
৬. মানুষকে অধিকার দায়িত্ব -কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা
৭. মানবাধিকারের স্বপক্ষে জোরালো জনমত গঠর করা
৮. নীতি-কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা
৯. দায়বদ্ধতায় আন্তরিক হওয়া
১০. সরকারী পর্যায়ে আইনগত সেবা সহায়তার ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যেক-আয়োজন গড়ে তোলা।

আইনগত অধিকার বলতে কেবল সেই অধিকার বুঝায় যা মানবরচিত আইনের অধীনে আসে, যা প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। যেমন, জানমালের নিরাপত্তা এবং সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব অধিকার প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার গণ্ডির বাইরে এবং যেগুলো বলবৎ করার দায়িত্ব মানুষের বিবেক ও সজ্জার

Dhaka University Institutional Repository

উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই নৈতিক অধিকার। যেমন রুগ্নের সেবাশুশ্রুষা, সাহায্যের মুখাপেক্ষী লোকদের সাহায্য- সহোযোগিতা দান, মেহমানদের আদর যত্ন, প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। আইনগত অধিকার বাস্তবায়নের পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু নৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন মানুষের অভ্যান্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। নৈতিক বিধান মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তি অর্থাৎ 'সজ্ঞা' বলবৎ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট যেহেতু মানুষের নিয়াত, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-সংকল্প, চিন্তাচেতনা, আকীদা-বিশ্বাস মোট কথা কোন জিনিষই লুকায়িত নয়, মানুষের ভিতর বাহির তাঁর সামনে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত, তাই তাঁর আদালতে কোন অধিকার কেবলমাত্র "নৈতিক অধিকারই নয় বরং সমস্ত অধিকার পূর্ণ আইনগত অধিকারে" পরিণত হবে এবং সেখানে এসব কিছুর ফয়সালা আইনগত প্রতিকার প্রার্থনার যাবতীয় প্রসিদ্ধ পন্থা অনুযায়ী হবে। এখন অধিকার সমুহের কিছুটা বিস্তারিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। "হে মুহাম্মদ! তাদের বল, এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তা তোমাদের পড়ে শুনাই

১. তোমরা তাঁর সাথে কোন শরিক করবে না।

২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

৩. দরিদ্রের ভয়ে তোমরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা কর না, আমারা তোমাদেরও রিযিক দান করি এবং তাদেরও।

৪. প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।

৫. আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করবে না। তোমাদের তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝে শুনে কাজ কর।

৬. ইয়াতীমের বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হবে না

৭. পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সংগতভাবে পূর্ণরূপে দেবে। আমরা কারও উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাইনা।

৮. যখন তোমরা কথা কলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে। তা আপনজনদের সম্পর্কে হলেও।

৯. এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অংগীকার পূর্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১০. অনন্তর তার নির্দের্শ এই যে, এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও"।[৩৭]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সরাসরি বান্দাদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাতে যেসব অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোনটিকে আইনগত এবং কোনটিকে নৈতিক অধিকার সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ নেই। সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলার ব্যক্ত অভিপ্রায় হওয়ার কারণে এসব অধিকার আইনগত পর্যায়ের।[৩৮] (কুরআন- হাদীস অধ্যায়ন করলে পরিষ্কার অনুধাবন করা যায় যে, প্রতিটি হব বা অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের ভিত্তিতে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং তাঁর পক্ষ থেকেই এই হক পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তার ধারা বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় উল্লেখযোগ্য কতিপয় ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণে গৃরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এসব ক্ষেত্রগুলো হল:

১. নারী অধিকার সংরক্ষণ

---

[৩৭] আল-কুরআন,: ১৫১-১৫৩

[৩৮] ইসলামে মানবাধিকার, মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২. শিশু অধিকার সংরক্ষণ
৩. শ্রমজীবি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ
৪. প্রবীণদের অধিকার সংরক্ষণ
৫. আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ
৬. ভূমিহীন মানুষের অধিকার সংরক্ষণ
৭. প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ
৮. ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা

ইসলাম ধর্মে মানবাধিকার বাস্তবায়ন (Enforcement of Human Rights in Islam) ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্য কিছু অধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং ইসলাম প্রদত্ত অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য বিধানও প্রদান করেছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে উহা প্রতিকারের বিধান ইসলামে প্রদান করা হয়েছে। এই অধিকার বলবৎকরণের ২টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদালতের মাধ্যমে মামলা করে এবং অপরটি হচ্ছে পরকালে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। যদি কোন ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অধিকার বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা করতে পারবেন।

পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে যে, "যদি কোন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং অন্যের অধিকার হরণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি প্রদান করবেন।"

ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ সার্বজনীন ও শাশ্বত ও চিরন্তন এবং উক্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা প্রদান করা হয়েছে তা প্রকৃত ও সহজাতভাবে বৈচিত্রময়। কিন্তু আধুনিক মানবাধিকার আইনবাস্তবায়নের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

একমাত্র বিশ্বের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব আল কুর'আন ও সর্বশ্রেষ্ট রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুন্নাহ ভিত্তিক পরিপূর্ণজীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠাই মানব সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের একমাত্র পথ। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব সভ্যতা মানব জাতির অস্তিত্ব ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্টায় একমাত্র আদর্শ ইসলাম। অতীতে ইসলাম মানব সমাজে মানবাধিকার এক মাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে। অনাগত ভবিষ্যতে মানুষের মুক্তির পথ ও মানবাধিকার একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শণের বাস্তবায়নের উপরই নির্ভরশীল। বিশ্ববাসি অতৃপ্ত পিপাসা মিটাবার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিক্ষা করছে। সমস্ত সৃষ্টির রব হচ্ছেন মহান আল্লাহ । তার রবুবিয়াত ভিত্তিক বিধানই মানুষের শুধু নয় সমগ্র সৃষ্টির জন্যই শান্তি, কল্যাণ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। বিশ্বের বরেণ্য ব্যাক্তিগণ যেমন, বানার্ডশ, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ড. মরিস বুকাইলী, ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আব্দুল আজিজ মিতা (জার্মান), ড. ইসলামুল হক,(ভারত), ড. মাসিয়ে আব্দুল মালিক (ফ্রানস), ড. ফাতিমা হিরেন (জার্মান), আল্লামা আসাদ (বৃটেন) সকলেই একমাত্র ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে বলে দ্বিধাহীন চিত্তে , নিঃসংকোচে ঘোষণা দয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল (স.) প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীণ বিধান তথা সৃষ্টির শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একমাত্র নিশ্চয়তা ইসলামী জীবন বিধান প্রষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।
জাতিসংঘ সারা বিশ্বের মানবাধিকার বাস্তবায়নের এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক কার্যক্রম বলতে শুধু জাতিসংঘ কার্যক্রম বোঝায় না তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংগঠন, খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ও গবেষণা ইত্যাদি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত মানবাধিকার সমূহ বাস্তবায়নে যে কোন ব্যবস্থা যদি একটি রাষ্ট্র কাঠামোর উর্ধ্বে উঠে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে সেটি আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নের আওতায় পরে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বাস্তবায়ন এক হওয়া প্রয়োজন, যা সারা বিশ্বে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

মানবাধিকার সমস্যাটির সমাধানকল্পে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভিন্ন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই সে বিধান ও রক্ষাকবচ বারবার লংঘিত হচ্ছে, ভুলণ্ঠিত হচ্ছে সব নিয়ম-কানুন। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ও জনপদে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে বেশী। অধিকারহীন মানুষ আহাজারী জনাচ্ছে বিশ্বমানবতার দরবারে। সুতরাং মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য চূড়ান্ত গ্যারান্টি বিশ্বমানবতা। বিশ্ব মানবতার সম্মিলিত ইচ্ছার বহি:প্রকাশ ঘটে আন্তর্জাতিক কর্ম-ব্যবস্থার মাধ্যমে। সে জন্যই আন্তর্জাতিক ভাবে অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব এত অধিক। যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে মানবাধিকার বেশী লংঘিত হচ্ছে তাই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার বাস্তবায়নে মুসলিম বিশ্বের জন্য মুসলিম জাতিপুঞ্জ গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মানবাধিকারের বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পাবে। এসব ব্যবস্থা বা পদ্ধতি নিম্নে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বাস্তবায়ন।

খ. আইনগত বাস্তবায়ন।

গ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাস্তবায়ন।

রাজনৈতিক বাস্তবায়ন

রাজনৈতিক বাস্তবায়ন কথাটি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে পারি। এক্ষেত্রে যে সব প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বাস্তবায়নের পর্যায়ে পরে সেগুলো হচ্ছে-

১. আন্তর্জাতিকভাবে সকল মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা নেয়া।
২. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি।
৩. সিম্পোজিয়াম,সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করা।
৪. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করা।

এ ছাড়াও বিশ্বে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে একটি প্রবল চাপ গড়ে তুলে মানবাধিকার বাস্তবায়নের একটি পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানীদের গণহত্যার প্রতিবাদ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ফলে তারা ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলের পর শহরগুলোতে গোপন হত্যা অব্যাহত রাখলেও ব্যাপক গণহত্যার হার কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

অরাজনৈতিক বাস্তবায়ন

অরাজনৈতিক বাস্তবায়ন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন–

১. জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়নের সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেত হবে।

২. স্পেশালাইজড এনজিও সমূহের ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে আরো নতুন এনজিও তৈরী করে মানবাধিকার বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আইনগত বাস্তবায়ন

কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বা আদালতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মানবাধিকার সমূহ কার্যে বাস্তবায়িত করা। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আদালতসমূহ যে রকম সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায় মানুষের অধিকারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পায়, একই নীতি অনুসরণ করে আন্তর্জাতিকভাবে ও আন্তর্জাতিক আইনগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

যেমন–হেগের আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার পরে আইনগত বাস্তবায়নের বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রধান উপাদান: বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বাস্তবায়নে তিনটি বিষয়কে আমরা প্রধান উপাদান হিসেবে উল্লেখ করতে পারি-

(ক) প্রচার।

(খ) আইনগত ব্যবস্থা ও আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি।

(গ) আন্তর্জাতিক তদারকী।

প্রচার : মানবাধিকার বাস্তবায়নের স্বপক্ষে প্রচার চালানোর অধিকারও একটি মৌলিক অধিকার। বিশ্বের জনগণ তাদের নিজ নিজ অধিকারের মর্যাদা উপলব্ধি করলে সে সব অধিকার বাস্তবায়নেও সক্রিয় হতে থাকে এবং ক্রমেই মানবাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি জোরালো হয়ে উঠলে মানুষ সচেতন হতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো প্রচার করা যেতে পারে সে গুলো হচ্ছে:

(ক) মানবাধিকার কি ও কেন ?

(খ) কেমন করে এসব অধিকার সংরক্ষণ করা যায়।

(গ) কোন কোন কাজ দ্বারা মানবাধিকার ভঙ্গ হয়।

(ঘ) এ সব অধিকারের প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদি বিষয়।

মানবাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচিত, প্রচারিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকলে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ক্রমেই অধিকার সচেতন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রচন্ড জনমত সৃষ্টি হয় ও সংগঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের যে কোন জায়গাতেই মানবাধিকার লজ্ঞিত হলে প্রচারের বদৌলতে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সোচ্চার হয়ে ওঠে বিশ্ববিবেক। প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক প্রচারের ফলাফল : ব্যাপক প্রচারের ফলে জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংগঠন, Specializde agency সমূহ মানবাধিকার ঘোষণার আলোকে দলিল প্রণয়ন করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে আমার উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি UNESCO, Convention on Diserimination in Education 1960, The U.N Decalration on Racical Discrimination 1923 and The Draft Conuention Prepared by the UN Human Rights Commission, on the Climination of relisious intolerance-[১]
এ ছাড়াও মানবাধিকার বাস্তবায়নে নীতিগত আদর্শের আলোকে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা দিবস পালন করে তা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা যেতে পারে। মানবাধিকার সম্পর্কে তথ্য সম্প্রচার ক্ষেত্রে International Commission of Jurists, the Civil Liberaties Union in the U.S the Lithue Belge des droits de L'Home এবং Amanestic International এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর ব্যাপক প্রচার, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সচেতনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আর মুসলিম বিশ্ব মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও.আই.সি এর মাধ্যমে প্রচার করতে পারে।

আইনগত ব্যবস্থা ও আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি

১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো আদালত। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা না হওয়ায় আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার ন্যায় আরো আদালত প্রতিষ্ঠা করে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
২. ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত সারা বিশ্বে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তাই ইউরোপীয় কনভেনশনের অনুসরণ করে বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিকার কার্যকর মানবাধিকার দলিল প্রণয়ন ও বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
৩. বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
৪. জাতি সংঘের বিভিন্ন অঙ্গ, স্পেশাইজড এজেন্সী, আন্তর্জাতিক সংস্থা এ সবের মধ্যে বিচার বিভাগীয় (Quasi Judicial) প্রবর্তন করে আইনগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মানবাধিকার কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক তদারকী

আন্তর্জাতিক তদারকীর ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি

ক. রিপোর্টিং ব্যবস্থা[২] এবং

খ. অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা ।

---

১. Economic and Social Council of Official Records: E/4024/April/65) । উদ্ধৃতি : মোঃ মাহবুব উল হক জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩

২ রিপোর্টিং ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য কি ধরনের পদ্ধতিতে ব্যবস্থা বিয়াজ মান, মানবাধিকার ভঙ্গের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিকর কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বা বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের জন্য রিপোর্ট, ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্থায়ী মান্ডেট কমিশন, ট্রাস্টিশীপ কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা ইউনেস্কো এসব জাতি সংঘের অঙ্গ সংগঠন সমূহ ও স্পেশালাইজডসমূহের রিপোর্টিং ব্যবস্থায় যত রিপোর্ট পেশার ব্যাবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, নিয়মিত রিপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র স্বীয় পদ্ধতিতে যেমন মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়, একই ভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐসব প্রতিবেদনের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখতে পারে। ফলে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় জনমতের চাপ, একটি রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিষ্ঠান অন্য একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। তাইএকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা সেসব অভিযোগ তদন্ত ও অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আন্তর্জাতিকর পারমানবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ

জাতি সংঘের সকল সদস্যই অন্তত নীতিগতভাবে একমত যে, আণবিক অস্ত্রের উপর কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার গঠনতন্ত্রের **১২** নং অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে–

১. আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
২. পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে। এবং
৩. পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রনের জন্য কার্যকর কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে নিম্নে লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, আণবিক চুল্লি ইত্যাদি পরিদর্শন এবং এসব দ্রব্যাদি সামরিক কাজে ব্যবহার করা চলবে না।

খ. যে সকল রাষ্ট্র কর্তৃক আণবিক শক্তির পরিদর্শন, প্রদর্শন ও সামরিক কাজে ব্যবহার হবে না বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকেই কেবল ছাড়পত্র দেয়া যেতে পারে।

গ. এ সব যন্ত্রপাতি ও আণবিক ব্যবস্থা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

ঘ. যে সব রাষ্ট্র আণবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে সে সব রাষ্ট্র থেকে আণবিক কর্মসূচী তলব করতে হবে।

ঙ. আণবিক আবর্জনা সামরিক অস্ত্র প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

চ. আণবিক আবর্জনা সংরক্ষণের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ মর্মে নিশ্চয়তাপ্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ করতে হবে।

ছ. সংস্থা আণবিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে পরিদর্শনকারী কমিটিকে পাঠাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জ. আনবিক শক্তি পরিদর্শকগণ কোন সময় যে কোন জায়গায় যেতে পারবে। আণবিক কেন্দ্রে কর্মরত যে কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবে। যে সব দ্রব্য ও কাঁচামাল ব্যবহার করা হবে তা নিরীক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে সংস্থা তদন্তকারীদের বা পরিদর্শনাকারীদের সাথে দেশীয় প্রতিনিধি দিতে পারবে।

ঝ. যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সংস্থা কর্তৃক সুপারিশ অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন মূলক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি ইত্যাদি প্রত্যাহার স্থগিত বা নিষেধ করতে পারবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার বাস্তবায়নে কতিপয় প্রস্তাবনা

মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে কতিপয় প্রস্তাবনা: বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার সংরক্ষণ বাস্তবায়নে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও.আই. সি. এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। কেননা বিশ্বের যে সমস্ত দেশে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য রয়েছে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলিম সে সব দেশের সমন্বয়ে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ৭০ দশকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি) গঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে এ সংস্থার অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলো বিশেষায়িত কমিটি ও সহযোগী সংস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষায়িত কমিটি ও সহযোগী সংস্থাগুলো হচ্ছে:

১. আল-কুদ্স কমিটি(Al-Quds Committee)
২. অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক ও সমাজ বিষয়ক ইসলামী কমিশন
৩. বিজ্ঞান কারিগরী সহযোগিতা কমিটি
৪. আন্তর্জাতিকর ইসলামী ঐতিহ্য কমিশন
৫. আন্তর্জাতিকর আইন কমিশন(International Law Commitee)
৬. ইসলামী আইন বিজ্ঞান একাডেমী(Islamic Juresprudence Academy)
৭. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি(Islamic Developmet Bank-IDB)
৮. Islamic Educational, Scientifie and Cultaral Organisation (ISESCO)
৯. Islamic States Broadcasting Organization. (ISBO)
১০. International Islamic News Agancy (IINA)
১১. Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI)
১২. Organjation of Islamic Capitals and Cities (OICC)
১৩. Islamic Committee of Inter Nation. Cresent (ICIC)
১৪. World Fedaration of Arab-Islamic International Schools (WFAIIS)
১৫. Organization of the Islamic Shipowners Association (OISA)
১৬. Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYFDC)
১৭. International Union of Muslim Scouts (IUMS)
১৮. Federation of Consultannts Islamic Countries (FCIC)
১৯. Islamic World Academy of Sciences (IAS)

Dhaka University Institutional Repository

২০. General Council for Islamic Bank and Financial Institutions (GCIBFI)

২১. Federation of Contractors from Islamic Countries (FOCIC) প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিল যেমন, ইউরোপীয় কনভেনশন, আন্তঃ আমেরিকান কনভেনশন ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে ও আই. সি এর উপরোক্ত সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক এই.এস কমিশন ও অন্যান্য অন্তর্ভূক্ত সংস্থার ইসলামী আইন বিজ্ঞান একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ইসলামী মানবাধিকার কনভেনশন প্রণয়ন করে তা সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিশেষ করে ইসলামী মানবাধিকার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়ে :

১. গণহত্যা সম্পর্কিত কনভেনশন

২. নারী অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন

৩. দেশ ত্যাগী ও শরণার্থী সম্পর্কিত কনভেনশন

৪. দাসত্ব বা ক্রীতদাস প্রথা, জবরদস্তি শ্রম এবং এ ধরনের আচার প্রথা সম্পর্কিত কনভেনশন

৫. বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন

৬. বর্ণ-বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে কনভেনশন

উল্লেখিত ৬ (ছয়)টি কনভেনশনের মাধ্যমে কতিপয় সুনির্দিষ্ট এবং মৌলিক ইসলামী মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন তদারকির জন্য নিম্নরূপ মেশিনারী ও এন.জি.ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ক. ইসলামী মানবাধিকার কমিশন

খ. ইসলামী মানবাধিকার আদালত

গ. ইসলামী মানবাধিকার মন্ত্রী কমিটি

ঘ. ইসলামী এন জি.ও

ইসলামী মানবাধিকার কমিশন গঠনে প্রস্তাবনা

ও.আই. সি সদস্যভূক্ত রাষ্ট্র থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে-

১. কমিশনের সদস্যরা খ্যাতনামা ইসলামী আইনবিদদের মধ্য হতে নিজেদের যোগ্যতা বলে নির্বাচিত হতে পারেন।
২. তবে একটি সদস্য রাষ্ট্র থেকে একাধিক ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারবে না।
৩. এ কমিশন সদস্য রাষ্ট্রসমূহে মানবাধিকার বাস্তবায়নে তদারকি করতে পারবে।
৪. ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্র বা সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পেশকৃত আবেদন বিবেচনা করতে পারবে, এবং এ সংক্রান্ত বিরোধ মিমাংসার চেষ্টা করতে পারবে।
৫. বিরোধ মিমাংসায় ব্যর্থ হলে বিষয়টি ইসলামী আদালতে প্রেরণ করতে পারবে।
৬. সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার কার্যক্রম এবং অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন ইসলামী মন্ত্রী কমিটির কাছে পেশ করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী মানবাধিকার আদালত গঠনে প্রস্তাবনা

ও.আই.সি সদস্যভূক্ত রাষ্ট্র থেকে একজন করে বিচারক নিয়ে ইসলামী মানবাধিকার আদালত গঠিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক হওয়ার মত যোগ্যতার সমতুল্য।

খ. উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।

গ. আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের স্বীকৃত দক্ষতা।

ঘ. নিজের দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ লাভে যোগ্যতাসম্পন্ন ও ইসলামী আইনে পারদর্শী ব্যক্তি।

নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি কেবল মাত্র ইসলামী মানবাধিকার আদালতের বিচারক বা সদস্য হতে পারবে।

ইসলামী মানবাধিকার আদালতের বিচারক বা সভ্যগণ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তারা ব্যক্তিগতভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বীয় পদে থেকে কার্য পরিচালনা করবেন। বিচারকগণ বা সভ্যগণ নয় (৯) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন। প্রতি তিন বৎসর পরপর এক তৃতীয়াংশ বিচারক অবসর গ্রহণ করতে পারবেন এবং সমসংখ্যক বিচারক নতুনভাবে নির্বাচিত হতে পারবেন। কোন বিচারক নতুনভাবে নির্বাচিত হতে পারবেন না। কেবল মাত্র সদস্য রাষ্ট্র বা কমিশন কর্তৃক ইসলামী মানবাধিকার আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে। আদালতের রায় কার্যকারী করার জন্য ইসলামী মন্ত্রী কমিটির কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ইসলামী মন্ত্রী কমিটির ইসলামী মন্ত্রী সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা তাদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হতে পারে। ইসলামী মন্ত্রী কমিটির কাজ হচ্ছে–

ক. ইসলামী মানবাধিকার কমিশনের বাৎসরিক প্রতিবেদন বিবেচনা করতে পারবে।

খ. ইসলামী মানবাধিকার আদালতের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে পারবে।

গ. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. কোন রাষ্ট্র ইসলামী মন্ত্রী কমিটির নির্দেশিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে এ বিষয়ে কমিটি রির্পোট প্রকাশ করতে পারবে এবং অবাধ্য রাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থগিত ঘোষণা অথবা সংস্থা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

ইসলামী মানবাধিকার আদালতের প্রথম এবং প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে নিজ রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি কেমন, মানবাধিকার বাস্তবায়নের কি কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বা হয়েছে সে ব্যাপারে মানবাধিকার কমিটি তথা ইসলামী মন্ত্রী কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদান।

মানবাধিকার বাস্তবায়নে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সময়ে সময়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাতে ও বাধ্য থাকবে। মানবাধিকার কমিটি তথা ইসলামী মন্ত্রী কমিটি এ সমস্ত রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের মতামত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

কোন রাষ্ট্র যদি এরকম সংবাদ পায় যে, অন্য একটি রাষ্ট্র ইসলামী মানবাধিকার আদালতের শর্ত ভঙ্গ করে মানবাধিকার লজ্ঞন করছে, সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দেশটি বিষয়টিকে ইসলামী মন্ত্রী কমিটির গোচরীভূত করতে পারে। এরকম পরিস্থিতি ইসলামী মন্ত্রী কমিটি মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উপর শ্রদ্ধা রেখে বিষয়টির একটি শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে একটি এডহক বা অস্থায়ী শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই কমিশন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাবে। যদি এই অস্থায়ী কমিশনের নিকট পৌছানো সম্ভব না হয়, তখন অস্থায়ী কমিশনের দায়িত্ব হল বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট সব ইস্যুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অভিমত প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্ব সংস্থা বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা। কেননা বিশ্ব মুসলিমের নিরাপত্তায় মুসলিম জাতিসত্বা বিলুপ্তি ও নির্মূল চক্রান্ত প্রতিরোধে মুসলিম বিশ্ব নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রকৃত ঐক্যবোধের চেতনায় একটি শক্তিশালী মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা ছাড়া ইসলামকে বিশ্ব ব্যবস্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামের দুষমনদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হতে আত্মরক্ষা করা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

মুসলিম বিশ্ব তথা মুসলিম উমম্মার বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পদক্ষেপ তিনটি হচ্ছে-

১. মুসলিম বিশ্বে এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
২. ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা।
৩. মুসলিম দেশসমুহের অভ্যান্তরীন ক্ষেত্রে ইসলামী দল সংগঠন ও বিভিন্ন ফিকহী সংস্থাসমূহের ঐক্য।

মানবাধিকার বাস্তবায়নে আরো কতিপয় প্রস্তাবনা :

১. ইসলামী জিন্দেগীর দাওয়াত ও তাবলীগ ।
২. শিক্ষা বিস্তার ঃ আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।
৩. দুঃস্থ, দরিদ্র, পঙ্গু, বেকার ইয়াতীম, মিসকীন, সর্বহারা অসহায় মনুষের পূর্ণবাসন প্রকল্প গ্রহণ।
৪. বেকারত্ব দূরীকরণ, প্রযুক্তি বৃত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রচলন।
৫. ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ ও ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক পূণর্বাসন।
৬. ভূমিহীনদের ভূমি বন্টনের বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ।
৭. বিনাসূদে ঋণদান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকৃত অর্থ যথার্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে ঋণদাতা সংস্থাকারীরও তদারকী গ্রহণ।
৮. পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ ও পতিতাদের পূণর্বাসন, হেলথ-চেক,আপ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, মহিলাদের পরিচালিত ও মহিলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
৯. যুবসমাজের মধ্যে মাদকাশক্তি নিরোধ করে বস্তনিষ্ঠ কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারী ও বেসরকারী ভাবে মাদকাসক্তদের উন্নত মানের পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন।
১০. গৃহহীনদের পূর্ণবাসনে সরকারী- বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাংক কর্তৃক গৃহ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও কিস্তি ভিত্তিক ঋণ পরিশোধ ও ও মালিকানা হস্তান্তরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ।
১১. শিক্ষিত- অশিক্ষিত, দক্ষ ও অদক্ষ সকল স্তরে বেকারত্ব দূরীকরণ ও বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কর্মপন্থা গ্রহণ।
১২. সরকারী বেসরকারী উদ্দ্যোগে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
১৩. আদম ব্যবসায়িদের নিষ্ঠুর নির্যাতন হতে মুক্তকরণ, আদম ব্যবসায়ীদের প্রতারণার জন্য সরকারী - বেসরকারী ও গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতারণা নিরোধ ও প্রতারকদের শাস্তির জন্য আইন প্রনয়ণ ও কার্যকর করনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ ও নৈতিক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ

১৫. রাস্ত ঘাট মেরামত নির্মাণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৬. নারী শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদান, নারীদের বেশী বেশী স্বতন্ত্র স্কুল, মাদ্রাসা কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. নদী-নালা , খাল-বিল সংস্কার , সাধন।

১৮. জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। সন্ত্রাস দমনে দলীয়করণ নীতি বর্জন।

১৯. বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিঠানে সন্ত্রাস দমনের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ, সেশন জট মুক্ত করন। প্রয়োজনবোধে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করে রাজনৈতিক তৎপরতা ও সকল রাজনৈতিক দলের অংগ দল গঠন নিষিদ্ধ করণ।

২০. আইন শৃঙখলা পরিস্থিতি ইন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। রিমান্ডের নামে মানবাধিকার হরণের ও অকথ্য নৃশংস, নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা রহিত করণ। নিরপরাধ মানুষের নির্যাতনের যাতনায় ভিত্তিহীন অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করার অমানবিক পন্থা রহিত করন।

২১. কুঠির শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও কুঠির মিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ।

২২. খাদ্য সমস্যার সমাধানের নিমিত্তে পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রযুক্তিগত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন।

২৩. সার্বিক ভাবে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও হেফাজতের কর্মসূচী গ্রহণ।

২৪. মুসলিমবিশ্বে আর্থ-সামাজিক সহযোগিতামূলক সেবা সংক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠান গঠন ও আন্তঃসগযোগিতা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করা।

২৫. জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

২৬. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে যে সকল বিষয়ে কলহ বিবাদ রয়ে গেছে সেগুলো নিস্পত্তির জন্য অতিসত্তর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৭. মুসলিম দেশসমূহকে নিয়ে একটি ভিন্ন রাষ্ট্র সংঘ গড়ে তুলতে হবে।

২৮. মুসলিম দেশসমূহকে রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী সাময়িক বাহিনী গঠন করতে হবে।

২৯. মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৩০. শিল্প ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩১. মুসলমানদের শত্রু সম্পর্কে সচেতন থাকার লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা, ও মুসলমানদের নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপন করতে হবে।

৩২. মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর খনিজসম্পদসহ যত সম্ভাব্য অর্থকরী সম্পদের পরিসংখ্যান তৈরী করে সেগুলো সংরক্ষণের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩৩. মুসলিমদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে সাহায্য I M F এর মতো তহবিল গড়ে তুলতে হবে।

৩৪. আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইসলামী বিজ্ঞানের সমন্বয় করার জন্য যৌথ শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫. মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বাধ্যতামূলক সামরিক বিজ্ঞান পাঠের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার আইন প্রচলিত মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে তুলনা করে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার আইনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে।

৩৭. মুসলিম সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে এক জাতি হিসেবে একত্রে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে হবে।

মানবাধিকার বাস্তবায়নে জোরালো পদক্ষেপসমূহ:

১. মানবধিকারের তদারকী ও প্রতিবেদন তৈরী।

২. বাস্তবায়িতকরণ।

৩. মানবাধিকার ইস্যু কার্যকরকরণ।

৪. প্রতিবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা।

৫. আন্তঃঅভিযোগসমূহ দায়ের করা।

৬. ব্যক্তিগত ভাবে অভিযোগ দায়ের।

৭. সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষণ।

৮. সহায়ক সংস্থাসমূহের সহায়তা নেয়া। যেমন- জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ (যেমন- UNHCR, UNHCR, UNESCO, CIRC, NGO)।

৯. ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা।

১০. সমস্যা সমাধানে পদ্ধতিগতভাবে বারতি নিরক্ষণ করা।(Overview of Problem with the system)

১১. ঘোষণা, অনুমদন ও সংরক্ষণ।(Ratification, declaration and reserbation)

১২. বিশ্বসম্প্রদায়ের মতামতের প্রভাব তুলে ধরা। (The influence of golobal opinion)

১৩. রাষ্ট্রের প্রতিবেদনসমূহের সংখ্যা এবং গুণগত মাণ নির্ণয়।

১৪. মানবাধিকারের বিভিন্ন ইস্যু।

১৫. মানবাধিকারের বিভিন্ন ইস্যুতে শিষ্ঠাচারপূর্ণ মনোযোগ দেয়া।

১৬. প্রতিবেদনের শর্তসমুহ পরিবর্তনে অধিক্রমণ ও আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

১৭. মানবাধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদেরকে জমে থাকা অসমপন্ন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১৮. কমিটি মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ কাজগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে একত্রিকরণ করতে হবে।

১৯. মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় অনুমোদন করার পরে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০. মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

২১. রাজনৈতিকভাবে কার্যকরণ ভূমিকা রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহার

বিশ্বে শান্তি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাথে অনেক চুক্তি সম্পাদন করেছেন। যেগুলো মূলত তদানিন্তন ও অনাগত পৃথিবীবাসীর নাগরিক,সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশিলতা উপরন্ত মানবাধিকারের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানব ঐক্য, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.) ছিলেন সকল চিন্তাচেতনার অগ্রদূত। জীবনের বিভিন্ন কর্মে এবং বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে তিনি বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার, রক্তের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানবাধিকারের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জাহেলী যুগের নিচ্ছিদ্র আঁধারে তাঁর সূচিত মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মসূচি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আলো সঞ্চারিত করেছিল। তিনি অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, জোর-যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেষ্টা করেছেন। মানুষকে মানবিক অধিকার দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

জীবনের বিভিন্ন কর্মে, ঐতিহাসিক ভাষণ ও চুক্তিসমূহে তিনি দাস-দাসী, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণে, তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার সংরক্ষণে, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন ও তা প্রতিপালনে, যুদ্ধকালে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরীহ মানুষ, এমনকি ফল, শস্য, বৃক্ষ ও সম্পদের ক্ষতি না করার, জলাধার, মহীসোপান, আর্ন্তজাতিক ভাবে আন্তঃযোগাযোগের যে উন্নত মানবিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন তাকে কোন কালের তত্ত্ব বা ধ্যান ধারণা আজও আদর্শ হিসেবে অতিক্রম করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ভাষণও চুক্তিসমূহ বিশ্বজনীন, চিরন্তন ও কালজয়ী। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তারঁ আবেদন আন্তর্জাতিক ও অসামপ্রদায়িক। দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণী ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের জন্যই তা প্রযোজ্য ও অনুসরণীয়। এ কালজয়ী ও বিশ্বজনীন আদর্শ অসত্যের ধূম্রজাল ভেদ করে স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কেননা, রাসূল (সা.) এর জীবন ছিল আল কুর'আনের নমুনা। মূলত আল-কুর'আনে যত সুন্দর, সত্য, সততা, মানবতা ও কল্যাণময় গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে; তার নিখুঁত, নিখাদ, ও পরিপূর্ণ চিত্রায়ন ঘটেছিল রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রই প্রাক পৃথিবীতে প্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে মানবাধিকার একটা জীবন-পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয়-নীতি এবং যা সব মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মহানবী (সা.) কর্তৃক ঘোষিত বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের ধারণাই পুনরায় নতুন করে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে ১৩২৪ বছর পরে। মহানবী (সা.) ছিলেন বিশ্বজগতের শান্তিদূত। ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার শুধু আক্ষরিক অর্থে নয় প্রায়োগিক দিক থেকে সমাজ জীবনে শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমান পৃথিবীর ছ'শ কোটি লোকের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী লোক মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার শিকার। চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস ও শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কোটি মানব সন্তান মানবেতর জীবন যাপন করছে, দু'টি বিশ্ব যুদ্ধ, হিরোশিমা-নাগাসাকি, মে দিবসের ঘটনা আধুনিক জীবনের উদ্বাস্তু, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শ্রমশিবির স্বাধীনতা কার্মীদের বিরুদ্ধে-

Dhaka University Institutional Repository

চালিত গণহত্যা, ও ধর্ষণ, ইরাক, আফগানিস্তান, ইত্যাদির মত যুদ্ধ, ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন, ও দমন, পীড়ন,আবর বসন্তের নামে আরব বিশ্বে মুসলিম গণহত্যা সর্বোপরি আধুনিক মানবতাবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের জীবন্ত প্রমাণ হয়ে আছে।

সমগ্র পৃথিবীতে মানবজাতির প্রবাহমান ইতিহাসের ধারায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্ব প্রথম সমগ্র মানবজাতিকে এই মহামূল্য অধিকারের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যখন মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা একেবারে অঙ্কুরে ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইসলামী রাষ্ট্রে মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার চুক্তিসহ আরো অনেক চুক্তির মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলো পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ঐতিহাসিক ভাষণ ও চুক্তিসমূহ সর্বযুগের মানবাধিকারের প্রকৃষ্ট দলীল ও সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা। তদুপরি তিনি অধিকারগুলো শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন তা নয়, বরং অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ এবং অনাগত মানবতাকে নিজের জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর অনুসারীরা তাঁদের জীবনে মহামূল্য নির্দেশ কঠোরভাবে পালনও করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে পূর্ণ মানুষ করার লক্ষ্যে এবং মানুষের সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পূর্ণ-সুস্থতাদানের উদ্দেশ্য মানবনীয় মূল্যবোধ ও মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহের যে সমন্বয় সাধন করেছেন, তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সুশীলসমাজ বিনির্মানের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম যথার্থরূপে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তম শতকে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে নতুন কথা শুনিয়ে বিশ্ববাসিকে মুগ্ধ করেছিলেন। নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও, নাগরিক জীবনের এ নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি ৬২৪ সালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে মদীনা সনদ, হুদায়বিয়ার চুক্তিসহ বেশকিছু চুক্তি সম্পাদন করে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বিশ্ব মানবের মুক্তি ও কল্যাণের পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুষ্ঠু সামাধানের এক অমোঘ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন তাঁর বানী, ঐতিহাসিক ভাষণে ও চুক্তসমূহের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাপত্রের সঠিক বাস্তবায়ন ঘটলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে এক অনাবিল শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবে। সর্বোপরি মহানবীর (সা.) বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে তা অনুসৃত হলে আজকের অশান্ত বিশ্বে সত্যিকার অর্থে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ শুধু কল্পনাতীত ছিল না, বরং তার পরবর্তী আজকের ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এ ভাষণ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও মানবাধিকারে এক অনুপম ও অনবদ্য দলীল হয়ে বেঁচে থাকবে।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত বিব্রত হচ্ছে তার প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নবী করীম (সা.) তাঁর মহামূল্যবান বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে বলে দিয়ে গিয়েছেন। আজ যদি সুন্দর পৃথিবী গড়তে চাই তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হবে নবী করীম

Dhaka University Institutional Repository

(সা.) এর অমূল্য বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহের দিকে, পালন করতে হবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে, তাহলেই সম্ভব হবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা,সম্ভব হবে মানবাধিকারের যথাযথ সংরক্ষণ।

বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে আজকের পৃথিবীতে মানবতা আজ নিস্পেষিত। সভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ আজ সর্বত্র। বর্ণবাদের ঘৃণ্য নিপীড়নে কোটি কোটি মানুষ জর্জরিত, লাঞ্ছিত। উগ্র জাতীয়তাবাদ, গোত্র-বর্ণ, স্বদেশিকতাবাদ, জাতিগত সমস্যা মানবতার অখন্ডতাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। সাম্রাজ্যবাদের ছোবলে পড়ে ছোট ও গরীব রাষ্ট্রগুলো আজ দিশেহারা। সর্বত্র চলছে ব্যক্তিগত, দলগত, গোষ্ঠীগত, জাতিগত প্রাধান্যের তীব্র প্রতিযোগিতা। ফলে সংঘাত সংঘর্ষ, অসাম্য, ঘৃণা প্রতিশোধস্পৃহা আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক শোষণ, সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী বৈষম্যমূলক অর্থনীতি পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষকে দারিদ্রে নিপতিত করে রেখেছে। অপসংস্কৃতি, পাশবিকতা প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। সভ্যতা আজ যান্ত্রিকতা পরিপূর্ণ ,মানবতা আজ ভু-লণ্ঠিত। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা আরো করুন। স্বৈরাচারী শাসন মুসলিম বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদ ইহুদীবাদের ষড়যন্ত্রের কবলে নিপতিত। সর্বত্র মুসলমানেরা নিপীড়িত, নির্যাতিত। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকান, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, লেবানন, সিরিয়া সর্বত্রই মুসলমানদের রক্তের হোলিখেলা চলছে। অনৈক্য, বিভেদ মুসলিমবিশ্বের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাই আজ গোটা বিশ্ব মুক্তি চায়, মুক্তি চায় ভুল চিন্তা ও বিভ্রান্তির মতবাদের বেড়াজাল হতে, মুক্তি চায় দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে, জাতিগত নিপীড়ন থেকে, বর্ণবাদের খড়গ থেকে, সাম্রাজ্যবাদের ছোবল থেকে। নারী জাতি মুক্তি চায়, নির্যাতনের অবসান চায়। শ্রমজীবী মানুষ বাঁচতে চায়, তাদের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে চায়, জান-মাল সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় আজকের পৃথিবীর মানুষ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কালজয়ী বাণী, অভিভাষণ ও চুক্তিসমূহ পড়লে, আত্মস্থ করলে মুক্তির সন্ধান মিলবে। আজকে বড় প্রয়োজন মহানবী (সা.) এর অভিভাষণ ও চুক্তিসমূহের যথার্থ অনুশীলন ও বাস্তবায়ন। তাহলেই মানবজাতি মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। আজকের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) এর মানবাধিকার সংক্রান্ত বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণভাবে প্রয়োজন। এগুলোর চর্চা, এর অনুশীলন, আমাদের ব্যক্তি সামাজিক জীবনকে করবে সমস্যামুক্ত, আমাদের সমাজে আনবে শান্তি, অর্থনীতিকে করবে শোষণমুক্ত সমৃদ্ধিশালী, রাষ্ট্রকে করবে শক্তিশালী, পরিবারকে করবে প্রেমময় ও ভালোবাসা পূর্ণ। ব্যক্তি জীবনকে করবে পুত-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, ভারসাম্যপূর্ণ সৎ ও সুন্দর। গোটা মানবতাকে দেখাবে, মহা ঐক্যের মহা ভ্রাতৃত্বের সন্ধান। বিশেষ করে মুসলিম জাতি পতনের পথ থেকে মুক্তি পাবে। অতীতের সোনালী যুগ আবার ফিরে আসবে। ভ্রাতৃত্ব ঐক্য, সংহতি নিশ্চিত হবে। বিচ্ছিন্নতা বিভেদ অনৈক্যের হবে অবসান। বিশ্ব মুসলিম জাগরণের পথ হবে প্রশস্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত ভাষণ ও চুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বমানবের মৌলিক অধিকার ও সমস্যাগ্রস্ত মানবতার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের এক জোতির্ময় আলোকবর্তিকা-দিক নির্দেশনা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত বাণী, ঐতিহাসিক ভাষণ ও চুক্তিসমূহ আজও মানবাতাকে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, উন্নত জীবন ও সমাজ গঠনের পথে অকুণ্ঠ আহ্বান জানাচ্ছে।

পৃথিবীর মানুষ সে আহ্বানে যত তাড়াতাড়ি আন্তরিক সাড়া দেবে, তত তাড়াতাড়িই উন্মোচিত হবে প্রত্যাশিত শক্তি ও কল্যাণের প্রকৃত পথ ও পাথেয়। আজ মুসলিম বিশ্ব ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ করতে হবে। মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ভয়াবহ পরিনতির যুগে মুসলিম মিল্লাতকে পদক্ষেপ নিহে হবে। বিশেষ করে -মুসলমানদের একটি শক্তিশালি উম্মাহ গঠন করতে হবে। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানবগোষ্ঠীর সুস্বভাবের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশ এবং মানবাধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক। পবিত্র কুর'আনে মানব মন্ডলীকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান ও সেগুলোর প্রায়োগিক দিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত জনসমষ্টিকে "মাধ্যমপন্থী জাতি" হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন-"এ ভাবেই আমি তোদেরকে 'এক মধ্যপন্থী' জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে।"[১] কখন "উত্তম জাতি" হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। "তোমরাই উত্তম জাতি, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা তৎকার্যের আদেশ দান কর এবং অসৎকার্যে নিষেধ কর।"[২]

আবার কখনো "সকল মানুষের সাক্ষী" হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে- "এটা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। তিনি তোমাদের নাম করণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও ; যাতে রাসূল তোমাদের সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য।"[৩]

আলোচ্য আয়াত সমূহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলে ঈমানদাগণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিম মিল্লাতের জন্য পৃথক প্রচার মাধ্যম গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত জীবনবিধান ইসলামকে আধুনিক বিশ্বে চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাতে হলে বিশ্বের প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। তাই মুসলিম রাষ্ট্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেগুলো প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে এবং বিশ্বের জনমত গ্রহণ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালি ইসলামী মিডিয়া বা কমিশন গঠন করে কর্তৃপক্ষ তাদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে সহজে মুসলিম বিশ্বের এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারবে। মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষায় যাঁরা কাজ করছেন বিশেষ করে গণমাধ্যমকর্মীদের নিজেদের এবং মিডিয়া ইন্ডাষ্ট্রিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ প্রচার এবং গণমানুষ বিশেষ করে সরকার ও সুমীল সমাজ সংগঠনকে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরী করতে হবে।

পরিশেষে আমরা এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে আল্লাহর খলীফা অভিধায় অভিহিত করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন অতঃপর তিনি আল-কুর'আনের নির্দেশনা এবং স্বীয় বাণী, কর্ম, ভাষণ ও চুক্তিসমহের অনুমোদনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল।

পৃথিবীর ইতিহাসে রসূলুল্লাহ (সা.)-ই সর্বপ্রথম যথার্থরূপে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানব ইতিহাসের শুরু থেকে তাঁর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত এ সময়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস আমরা জানি না। তদানিন্তন সময়ে শাসকের খেয়াল খুশিজনিত মুখোচ্ছারিত বাণীই ছিল রাষ্ট্রের আইন। ফলে তখন জনস্বার্থের পরিপন্থী শাসকের যথেচ্ছাচারের অবকাশ ছিল। সপ্তম শতকে রাসূলুল্লাহ (সা.) -ই সর্বপ্রথম মানবাধিকার সম্পর্কে নতুন কথা শুনিয়ে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেন।

১ আল-কুরআন, ২ : ১৮৩
২ আল-কুরআন, ৩ : ১১০
৩ আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে মদিনার সনদ, হুদায়বিয়ার চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি প্রণয়ন করেন এবং পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক আধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন। তদুপরি তিনি মানবাধিকার তথা মানুষের এ অধিকারগুলো তাঁর জীবদ্দশায় এমনরূপে কার্যকর করেছিলেন, যার নজীর পৃথিবীতে বিরল। এ কারণেই সমগ্র ইউরোপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, Of all the religious personalities of the world Mohammad (sm) was the most successful "বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এসেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ(সা.)- ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সফল ব্যক্তি।"

প্রতিয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহ বিশ্বমানবের মানবাধিকার আন্দোলনের এক জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা-দিক নির্দেশনা। বিশ্বমানবের মুক্তিদূত মহানবী (সা.) বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিতকরণে যে কালজয়ী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাঁর কর্মময় জীবনাদর্শের মাধ্যমে, তার কোন তুলনা নেই, যা চিরকাল বিশ্বমানবের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। আজকের পৃথিবী নানা অস্থিরতা, অশান্তি ও অবক্ষয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট। আজকের এই পথভ্রান্ত ও অশান্ত বিশ্বে মহানবী (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমুহ মানবাধিকার অনুমোদন, সংরক্ষণ,বাস্তবায়ন ও কার্যকরীকরণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন, আজকের অশান্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে তা অনুসরণ করা হলে সমাজে সত্যিকারের শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। মহানবী (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে তদানুযায়ী আমাদের সমাজ গড়ে উঠুক এই আমাদের কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

লেখকের নাম		বইয়ের নাম
• সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা	ঃ	*আল-কুরআনুল করীম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৫ তম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.)।
• আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইব্ন হুসামুদ্দীন আল হিন্দী আল-বুরহানপুরী	ঃ	*কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফওয়াল*(আলেপ্পো : দারুল ইতিসাম, ১ম সংস্ক.,১৩৭৯ হি./১৯৬৯ খ্রি.)।
• মোঃ মহবুব-উল হক জোয়ার্দ্দার	ঃ	*আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.)।
• মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন	ঃ	অনু. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম ও মু হাম্মাদ আবু নুসরত হেলালী, *ইসলামে মানবাধিকার*(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪২২ হি.)।
• আবু আব্দুল্লাহ্ বিন সায়াদ আলবাছরী		*তবাকাতে ইবনে সা'য়াদ(*করাচীঃ নাফিজ এ্যাকাডেমি, তা.বি.)।
• ইবন সা'দ, মুহাম্মদ,		*আত্ব-ত্বাবাকাতুল-কুবরা*(বৈরূত : দারয়ি ইয়াহিয়া আত তাওরাত আল-আরাবীয়া, তা.বি.),
• আবু উবাইয়েদ কাসেম বিন সালাম	ঃ	*কিতাবুল আমওয়াল*(ইসলামাবাদ : আল জামে'য়াতুল ইসলামী আলা আলামিয়াত তা.বি.)।
• ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযী,		*যাদুল মা'আদ*(মিসরঃ দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৩২৪ হি.)।
• ইমাম আবিল আব্বাস আহমদ জাবেল আল বেলাদশুরী	ঃ	সম্পা. মাওঃ আব্দুল মান্নান ও মাও. আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ফাতহুল বুলদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রি.)
• আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)	ঃ	*আস-সাহীহ*(রিয়াদ : দারুস সালাম, তা.বি.)।
• আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী	ঃ	*সুনান ইবনে মাজা*(বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল কুতুব আল- আরাবিয়্যা, তা.বি.)
• আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী	ঃ	অনু.ও সম্পাদনা পরিষদ, *সুনান ইব্ন মাযাহ*(ঢাকা : ইসলামিতক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.)।
• অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন	ঃ	*সাংবিধানিক আইন* (ঢাকা : জলিল 'ল' বুক সেন্টার, নীলক্ষেত, ৪র্থ সংস্করণ ২০০২ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

- আবুল ফজল হক ঃ *আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.)।
- আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) ঃ *জামে আত-তিরমিযী*(মিশর : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৫ খ্রি.)।
- আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) ঃ অনু.ও সম্পা. মুহাম্মদ মূসা, *জামে আত-তিরমিযী*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।
- আলী ইবন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী ঃ *আস-সীরাহ আল-হালবিয়্যা*(বৈরুত : দারু ইয়াহয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ১৯৯৩ খ্রি.)।
- আব্দুর রউফ দানাপুরী ঃ অনু. মাও. আ.ছ.ম. মাহমুদুল হাসান ও মাও. আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *আসাহহুস সিয়ার*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.)।
- আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-সুহরাওয়ার্দী অনুদিত ঃ *Sayings of Mohammad (Sm.),* বরাতে শাহাবুদ্দীন আহমদ রচিত 'রাসূল (সা.) এর অনুসরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ, *সীরাত স্বরণিকা*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি.)।
- ড. আবদুল করিম জায়দান ঃ অনু.মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা* (মালয়েশিয়া : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, পলিও-গ্রাফিক প্রেস, এস.ডি.এন, বি.এইচ.ডি, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)।
- ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল ঃ উর্দু অনুবাদ, *উমার ফারুক*(লাহোর:ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি.১৯৭২ খ্রি.)।
- ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল ঃ অনু. তাজুল ইসলাম, *মহানবী (স.) এর জীবন চরিত*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.)।
- ড. মুস্‌তাফা আস্‌-সিবায়ী ঃ অনু.আকরাম ফারুক, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.)।
- ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী ঃ *ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে মিলকিয়াত*(লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স,১৯৭১ খ্রি.)।
- আমীন আহসান ইসলাহী ঃ *ইসলামী রিয়াসাত*(সংখ্যা ৪, ১৯৫০ খ্রি.)।
- আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহ.) ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ.) ঃ অনু. ও সম্পা. মাও. মুহিউদ্দীন খান, *সীরাতুন নবী* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৭ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

- ইব্‌ন কাছীর আদ-দিমাশকী ঃ *আল-ফুসুল ফী সীরাতির রাসূল*(বৈরুত : দারুল খায়ের , ১ম সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৬ খ্রি.)।
- ইব্‌ন কাছীর আদ-দামিশকী ঃ *আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া*(বৈরুত : মুয়াসসাতু তারিখ আল-আরবী, ১৯৯২ খ্রি.)।
- ইব্‌ন হিশাম ঃ অনু. আকরাম ফারুক, *সীরাত ইবনে হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রি.)।
- ইব্‌ন হিশাম ঃ *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*(বৈরূতঃ দারুল খায়র, ২য় সংস্ক,১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)।
- ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ঃ *মুসনাদ*(বৈরুত : দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।
- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ(রহ.) আল কুশায়রী আন নিশাপুরী ঃ অনু.ও সম্পাদনা পরিষদ, আস *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশনব বাংলাদেশ,২য়, সংস্ক. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)।
- ইমাম মুসলিম ঃ *সহীহ মুসলিম*(বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ , লেবানন, তা.বি.)।
- ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রা.) ঃ অনু. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*(ঢাকা : ই. ফা.বা. ১৯৯৫ হি./ ১৪১৬ খ্রি.)।
- ইমাম আবূ দাউদ ঃ *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, লেবানন,১৩৮৯ হি./ ১৯৬৯ খ্রি.)।
- ড.এ.বি.এম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং মোঃ আখতারুজ্জামান ঃ *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি* (ঢাকা : হিউম্যানিস্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।
- এম.এরশাদুল বারী ঃ *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা*(ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, জুন ১৯৯২)।
- ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতিব তিবরিজী ঃ *মিশকাতুল মাসাবীহ(বৈরুত :* আল মাকতাবুল ইসলামী,২য় সংস্ক.১৩৯৯হি./ ১৯৭৯ খ্রি.)।
- কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) ঃ অনু. মাও. মোহাম্মদ মহসীন, *তাফসীরে মাযহারী*(নারায়ণগঞ্জ : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১৯৯৭ খ্রি.)।
- গাজী শামছুর রহমান ঃ *মানবাধিকার ভাষ্য*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

- গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩১ সেপ্টেম্বর– ২০০০)।
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪২৩ হি./ ২০০২ খ্রি.)।
- মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা.) ঃ *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.)।
- মাও. সাইয়িদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী ঃ অনু. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *ইসলামী সমাজে নারী*,(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রি.)।
- মুহাম্মদ মতিউর রহমান ঃ *মানবাধিকার ও ইসলাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ১৪২৩ হি./ ২০০২ খ্রি.)।
- মোঃ মহবুব-উল হক জোয়ার্দ্দার ঃ *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.)।
- মো: সিরাজুল ইসলাম, জেলা জজ ঃ *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্ক. ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.)।
- মাহমুদ মাহদী ইস্তাম্বুলী ঃ *তুহফাতুল উরুস*(জর্দান : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, আম্মান, ১৪১০ হি.)।
- মুহাম্মদ বিন সা'দ ঃ *আত তাবাকাতুল কুবরা(লেবানন :* দারুল ইহইয়িয়িত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৬ খ্রি.)।
- নাঈম সিদ্দিকী ঃ *মাহাসিন ইনসানিয়াত*(লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৭২ খ্রি.)।
- রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল ঃ *মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও* (চট্টগ্রাম : প্রকাশক, মোঃ শাহজাহান রশীদ, ইসলামিয়া হাট, হাটহাজারী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.)।
- শায়খুল হাদীছ মাও. মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন ঃ *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা :ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)।
- শায়খ মুহাম্মদ আলী-সাবুনী ঃ *সাফওয়াতুত তাফসীর*(কায়রো : দারুস সালাম লিত তিবাআতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওজী, ১ম সংস্ক., ১৯৯৬ খ্রি.)।
- সাইয়েদ সাবিক ঃ *ফিকহুস সুন্নাহ্*(কায়রো : দারুল ফাতহি লিল ইলামিল আরবী,১৯৯০ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

- সায়্যিদ আবুল হাসন আলী নদভী ঃ অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *নবীয়ে রহমত*,(করাচী: মজলিস নাশারিয়াত-ই ইসলাম, ১৯৯৭ খ্রি.)।
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) ঃ অনু.মাও. আবদুল মান্নান তালিব, *তাফহীমূল কুরআন*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সংস্ক.,১৪২৫হি./ ২০০৪ খ্রি.)।
- সাইয়েদ আবু আ'লা মওদূদী (রহ.) ঃ অনু. মাও. মুজ্জামিল হক, মাও. আবদুল মান্নান তালিব, *তাফহীমূল কুরআন*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্ক. ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।
- সফিউর রহমান মুবারকপুরী ঃ অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*(লন্ডন : আল-কুরআন একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.)।
- সম্পাদনা পরিষদ ঃ *আল-কুরআনুল করীম*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,পঁয়ত্রিশতম সংস্ক.,১৪২৮হি./ ২০০৭ খ্রি.)।
- সম্পাদনা পরিষদ ঃ *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,গবেষণা বিভাগ, ১ম সংস্ক.,১৪২১ হি./২০০১ খৃ.)।
- সম্পাদনা পরিষদ ঃ *সীরাত বিশ্বকোষ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.)।
- সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.) খ.২৫
- সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ইসলাম ও মানবাধিকার*(ঢাকা : ই.ফা.বা. গবেষণা বিভাগ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি.)।
- হযরত মাও.মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.) ঃ সম্পা.মাও. মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পবিত্র কোরআনুল করীম,* বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর অনু. (মদীনা মোনাওয়ারা : খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফহাদ কোরাান মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)।
- হামেদ আল- আনসারী ঃ *ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত*(দিল্লী :১৯৫৬ খ্রি.)।
- মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা.) ঃ *বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.)।
- আবদুল কাইয়ুম নদভী অনু. আব্দুল মতীন জালারাবাদী, *মহানবীর ভাষণ*(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য়

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.)

- A. H. Robertson, ঃ *In Human Rights in the world*(1st Edition, 1972).
- A.K. Brohoi ঃ *Quotation in United Nations and Human Rights*(Karachi : University Press, 1968).
- Bronlie, ঃ *Basic Documents in International Law* (1972).
- Brownlie ঃ *Basic Documents on Human Rights* (1st Edition, 1981).
- C. D kering. ঃ *Marxism, Communism and western Society,* (New York: Herder & Herder, 1972) Vol. 4.
- Claude. M. P. ঃ *Lighfood rights U.S. style from Colonial Times through The new Deal,* (New york : International Publishers, 1977).
- Dr. B.G. Ramcharan (ed) ঃ *Human Rights : Thirty Years After the Universal Declaration,* op. cit.
- Egon Schwelb ঃ *The Trieste Settlement and Human rights,* 49 AJIL (1955).
- Gaiues Ezejiofor ঃ *Protection of Human Right's Under the Law*(London : Butter Worth, 1964.
- Gaiues Ezejiofor ঃ *Protection of Human Right's Under the Law*(London: Butter Worth, 1964).
- Grigorian L. & Dolgopolory ঃ *Fundamentals of Soviet State Lew,* (Moscow : Progressive publishers', 1971).
- Goius Ezjifor ঃ *Protection of Human Rights Under the Law*(London: Butter Worth, 1964).
- Hance Kelson ঃ *The Law of United Nation*(London : 1950).

Dhaka University Institutional Repository

- Ilyas Ahmad ঃ *Sovereignty-Islam and Modern*(Karachi : The Allies Book Corporation, 1944).
- J. W. Goush ঃ *The Social Contract*(London : Clarendon Press, Oxford,1967).
- Jan Martenson ঃ *Introduction, Bulletin of Human Rights,* Special Issue(New York : 1988).
- Karl Mannheim ঃ *Diagnosis of our Time*(London: 1947).
- Karel Vasak ঃ *The international Dimension of Human Rights*, Vol.-1.
- Kerning C.D. ঃ Marxism, Communism and Western Society(New York : Herder & Herder, 1972), Vol . 4.
- Lauterpacht ঃ Human Rights and the Charter of United Nations Report, Human Rights Committee, (Passim : International Law Association, 1948).
- Dr.M. Ershadul Bari ঃ *International Concern for the Promotion of Human Rights*(Dhaka: The Dhaka University Studies, 1991).
- Megill Kennith A ঃ *The New Democratic Society*(New York: The Free press, 1970).
- Morris Stockhamer ঃ *Plato Dictionary*(New York: Philosophical library, 1903).
- Myres S. Mc Dougal and Gerhard Bebr ঃ *Human Right in the United Nations,* 58 AJIL (1964).
- M.M. Ahsan Khan ঃ *Human Rights in Islamic Perspective -A comparative Approach*(Dhaka: The Dhaka University studies, Jun-1992).
- M.Zamir ঃ *Human Rights Issues and International Law*, UPL, Dhaka, P.67.

Dhaka University Institutional Repository

- Mortgomery, watt .w ঃ . *The Majesty that was Islam,* (London: Sidwick & Jackson, 1974), P.47.
- Norman Kagins ঃ *We Trust in God,* (New york: 1958).
- P. J. Fitzgerald ঃ *Salmon on Jurisprudence*, (London: Twelfth Edition, 1996).
- Paul Sieghsrt ঃ *The International Law of Human Rights,* 1983.
- Pro.Humphary Richard B.Lillch ঃ *Civil Rights in Theodore Meron Led Human Rights in International Law*, Vol.1, p.134 ।
- Robertson. A.H. ঃ Human Rights in the World, (1972).
- Reuben levy ঃ *The Social Stricture of Islam,* (London: 1979).
- Sohn L.B. ঃ *The Universal Declaration of Human Rights : A Common Standard of Achievement,* Journal of the International commission of Jurists, 8 (1967) .
- Soronik Pitirim A, ঃ *The Crisis of our Age,* (New York : E.P. Duttan & Co.,1951).
- Stern S.M ঃ *Fatimid Digress* (London: Faber and Faber, 1964).

Dhaka University Institutional Repository